KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আতাউর রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number 22/১ 22/2 22/৩	Year of Publication : বৈশাখ- আষাঢ় ১৩৫৭ শ্রাবণ - আশ্বিন ১৩৫৭ কার্তিক - পৌষ ১৩৫৭
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor হুমায়ুন কবির	Remarks :

C.D. Roll No. KLML

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

চতুরঙ্গ

হুমায়ুন কবির সম্পাদিত

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

১৮৬৭
খৃষ্টাব্দ
হইতে
ভারতের সেবায়
নিয়োজিত

বামার লরী

কলিকাতা • বোম্বাই • নিউ দিল্লী • আসানসোল

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৭

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

॥ সূচীপত্র ॥

হুমায়ুন কবির ॥ সোভিয়েট দেশে তিন সপ্তাহ ১০৩
অরুণ মিত্র ॥ মনে আসবে ১১১
সুভাষ মুখোপাধ্যায় ॥ এই পথ ১১২
হরপ্রসাদ মিত্র ॥ আশ্বিনের ফেরিওলা ১১৪
বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ মাইফেলের পর ১১৫
রাম বসু ॥ দ্বৈত ১১৬
অমলেন্দু বসু ॥ সমালোচক ১১৭
মনীশ ঘটক ॥ কনখল ১৩১
অতীন্দ্রনাথ বসু ॥ নৈরাজ্যবাদ : বিপ্লব যুগে ১৫২
আর্ণল্ড টয়েনবি ॥ বিশ্বজনীন ঐক্য ১৭৩
হিরণকুমার সান্যাল ॥ আধুনিক সাহিত্য ১৯১
সমালোচনা—হরপ্রসাদ মিত্র, মণীন্দ্র রায়,
কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, সন্তোষকুমার দে ১৯৫

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

উড়িষ্যার পোড়ামাটির
পুতুলের অনুসরণে

বর্ণ বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল
উৎসব সমারোহ
দূরান্তের আত্মীয়
পরিজনের সান্নিধ্যে
উজ্জ্বলতর হোক....

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

MEDIUM|SE-P 60

দ্বাবিংশতিতম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা — চতুরঙ্গ — শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৭

সোভিয়েট দেশে তিন সপ্তাহ

হুমায়ুন কবির

পূর্বেই বলেছি যে সোভিয়েট রাষ্ট্র জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই সংগঠন ও শিক্ষণে বিশ্বাসী। সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতাদের ধারণা যে ঠিকভাবে শিক্ষা দিলে মানুষের স্বভাব ইচ্ছামত বদলান যায়, সংগঠনের ফলে আজ যা অসম্ভব মনে হয়, কাল তাকে আয়ত্তের মধ্যে আনা চলে। কয়েক বৎসর আগে লিসোঙ্কোকে কেন্দ্র করে জীববিদ্যার ক্ষেত্রে সোভিয়েট দেশে এবং বাইরে যে তুমুল তর্ক উঠেছিল, তারও প্রধান প্রতিপাদ্য ছিল এই যে প্রতিবেশ বদলে ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারও বদলানো যায়। শিক্ষার ফলে স্বভাব বদল হয় এ কথা প্রায় সকলেই মানে, কিন্তু সে পরিবর্তন উত্তরপুরুষে সঞ্চারিত হয় কিনা, হলেও কতখানি হয়, তা নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই।

সোভিয়েট রাষ্ট্র বিজ্ঞান এবং প্রাচ্যের মানববিদ্যার অধ্যয়ন এবং গবেষণার জন্য যে-সব প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছে, তাদের বর্ণনা পূর্বে দিয়েছি। সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলার ক্ষেত্রেও সোভিয়েট রাষ্ট্রে সংগঠনের যে প্রাচুর্য দেখেছি, বর্তমান প্রবন্ধে তারই খানিকটা আলোচনা করব। সমগ্র সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সোভিয়েট অন্তর্গত প্রতিটি রাষ্ট্রে লেখক, চিত্রকর, সঙ্গীতজ্ঞ এবং নাট্যশিল্পীদের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান রয়েছে। মস্কো, লেনিনগ্রাড, কিয়েভ এবং তাসকন্দে এ সমস্ত প্রতিষ্ঠান দেখে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে হল : ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে, মোদের বাঁধন ততই টুটবে। মানুষকে অনুশাসনে বাঁধবার চেষ্টা যতই প্রবল হোক না কেন, তার মধ্যেই মানুষ নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ব্যবস্থা খুঁজে নেয়।

রাজনীতি সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রাণ। মার্কসবাদকে ভিত্তি করে জীবনের প্রতিটি প্রকাশকে সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা সে দেশে স্পষ্ট। তাই সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমস্ত সংগঠনেই যে রাজনীতির ছাপ মিলবে, একথা সহজেই বোঝা যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখলাম যে সঙ্গীত সমাজগুলি রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব অনেকখানি এড়াতে পেরেছে। তার কারণও আছে। প্রত্যয় বা ধারণা সঙ্গীতে তেমন স্পষ্টভাবে দেখা যায় না, চিন্তার চেয়ে আবেগই সঙ্গীতে বেশী প্রকাশ পায়, তার আবেদনও প্রধানত বুদ্ধিকে নয়, হৃদয়কে।

মার্কসবাদী নিজেকে যতই বাস্তববাদী বলুন না কেন, মার্কসবাদ একান্তভাবে বুদ্ধি নির্ভর হতে চায়, যুক্তি দিয়ে সব কিছু বিচারের প্রয়াস করে, তাই জীবনের পরিপূর্ণ প্রকাশকে ব্যক্ত করতে পারে না। আবেগপ্রধান সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাই মার্কসবাদের প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রভাব দেখা যায় না। মস্কোতে সঙ্গীত সমাজে এ সম্বন্ধে আলোচনায় একজন সঙ্গীতজ্ঞ বললেন যে সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার একটি গল্প অবলম্বন করে তাঁরা বর্ণবৈষম্যের সংঘাত ও দুঃখ প্রকাশের জন্য নতুন সঙ্গীত রচনা করেছেন। শুনে দেখলাম যে ইয়োরোপীয় সঙ্গীতে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সর্বত্র যেভাবে প্রকাশিত হয়, সংঘর্ষের শেষে শান্তি ও সমন্বয় শ্রোতাকে যেভাবে মুগ্ধ করে, এ নতুন সঙ্গীতেও তারই পুনরাবৃত্তি। জিজ্ঞাসা করলাম যে বর্ণবৈষম্যের সঙ্গীত না বলে যদি তাকে প্রণয়দ্বন্দ্বের সঙ্গীত বলি, অথবা বিদ্বেষ ও প্রেমের সংঘর্ষের প্রকাশ বলি, তাহলে তাঁরা কি বলবেন? উত্তরে তাঁরা বললেন যে সঙ্গীতের প্রকাশ সর্বজনীন। বিশেষ আবেগও সঙ্গীতের মাধ্যমে সার্বিক হয়ে ওঠে, কাজেই বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব যদি সঙ্গীতে সমান রূপ গ্রহণ করে, তবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

সোভিয়েট সঙ্গীত সমাজের অধ্যক্ষ বললেন যে ভারতীয় গুণী গায়ক ও বাদক সোভিয়েট রাষ্ট্রে এসে সোভিয়েট পদ্ধতিতে সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করলে ভারতীয় সঙ্গীতের উৎকর্ষ সহজ হবে। আমি তাঁকে বললাম যে ভারতীয় এবং ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্য ও প্রকাশ ভিন্নধর্মী। ভারতীয় সঙ্গীত সুর নির্ভর, মেলডিক; ইয়োরোপীয় সঙ্গীতে সঙ্গতির উপর জোর বেশী, সে সঙ্গীত হারমনিক। শুধু তাই নয়, ভারতীয় সঙ্গীতে রাগরাগিণীর বিভাগ ও বন্ধন থাকলেও সঙ্গীতকারের স্বাধীনতা অনেক বেশী। ইয়োরোপীয় সঙ্গীতে রচয়িতা ও সঙ্গীতকারের পার্থক্য স্পষ্ট, ভারতীয় সঙ্গীতে প্রতিবারই প্রত্যেক সঙ্গীতকারকে রচয়িতার ভূমিকা নিতে হয়। তাই ভারতীয় ছাত্র সোভিয়েট রাষ্ট্রে বা সোভিয়েট ছাত্র ভারতবর্ষে এসে সঙ্গীত শিখলে বেশী লাভ নেই। তবে প্রতিষ্ঠাবান ভারতীয় সঙ্গীতকার এসে যদি সোভিয়েট সঙ্গীতকারদের সঙ্গে অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান করেন, ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ প্রকাশের সঙ্গে পরিচিত, এবং ঠিক সেইভাবে প্রতিষ্ঠাবান সোভিয়েট সঙ্গীতকার এসে ভারতবর্ষে গুণীদের সঙ্গে বাস করেন, তবে তার ফলে উভয়দেশের সঙ্গীতেরই অনেক বেশী লাভের সম্ভাবনা। সঙ্গীত সমাজের সদস্যেরা একথা মানলেন এবং বললেন যে "লায়লা মজনু"র সঙ্গীতরূপ দেওয়া হয়ে গেছে এবং বর্তমানে তাঁরা কালিদাসের "শকুন্তলা" নাটককে সঙ্গীতরূপ দিতে চেষ্টা করছেন। "লায়লা মজনু"র কিছু কিছু অংশ আমাকে শোনালেন। তার ভঙ্গী ইয়োরোপীয় কিন্তু প্রায় সর্বত্রই প্রাচ্য সঙ্গীতের আমেজ মেলে, দুয়েক জায়গায় ভারতীয় সুরের কথা মনে করিয়ে দেয়।

ভারতবর্ষের সঙ্গীত নিয়ে শুধু মস্কো নয়, সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রায় সর্বত্রই আগ্রহ দেখেছি। তবে সাধারণত ভারতীয় সঙ্গীত বলতে তারা সিনেমার ফিল্মী গীতই বোঝে। ভারতবর্ষের ধ্রুপদ বা খেয়ালের সঙ্গে সাধারণ লোকের পরিচয় নেই, কিন্তু মস্কোর সঙ্গীত সমাজ অথবা লেনিনগ্রাডের নাট্য পরিষদে নানারকমের ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র ও ভারতীয় সঙ্গীতের সংগ্রহ দেখলাম। উজবেকীস্তানের গানবাজনা শুনে বার বার ভারতীয় সঙ্গীতের কথা মনে আসে। তারা ইয়োরোপীয় বাদ্যযন্ত্র গ্রহণ করেও নিজেদের সঙ্গীতের স্বকীয়তা রক্ষার চেষ্টা করছে।

সঙ্গীত সমাজের সভ্যদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং স্বাধীন মনোবৃত্তির উল্লেখ করেছি। সঙ্গীতের প্রকৃতির ফলে তা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু নাট্য পরিষদগুলিও যে দলীয় প্রচার মনোভাব অতিক্রম করে অনেকখানি স্বাধীনতা অর্জন করেছে, তা দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। বস্তুতপক্ষে লেখকগোষ্ঠী বা চিত্রকর সম্প্রদায়ের তুলনায় নাট্যপরিষদগুলি অনেক পরিমাণে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত। মস্কোতেও নাট্যকারদের যে স্বাধীনতা, মনে হল লেখকদের সে স্বাধীনতা নেই। লেনিনগ্রাড এবং কিয়েভে নাট্যকারদের স্বাধীনতা আরো বেশী মনে হল। কিয়েভে একটি আধুনিক যুগের নাটক দেখেছিলাম, তাতে সরকারী কর্মচারীদের যেভাবে বিদ্রূপ করা হয়েছে, এক নায়ক-নির্ভর ও সমগ্রবাদী সোভিয়েট রাষ্ট্রে যে তা সম্ভব, না দেখলে তা বিশ্বাস করা কঠিন।

মস্কোতে আজো বসত বাড়ির একান্ত অভাব—সেই অভাবকে কেন্দ্র করেই নাটকটি রচিত হয়েছে। শহরের নতুন উপকণ্ঠে এক বিরাট অট্টালিকা তৈরী হয়েছে, তাতে প্রায় একশো ফ্ল্যাট। উমেদারের সংখ্যা কিন্তু কয়েক হাজার, এবং তারা বলাবলি করছে যে মুরুব্বি না হলে ফ্ল্যাট পাওয়া কঠিন হবে। সরকারী কর্মচারীরা যে তদবিরের পক্ষপাতি এবং সুবিধা পেলেই উৎকোচ নিতে চায়, তার প্রতিও স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। ডিরেক্টরের স্ত্রী অন্যায় আবদার করছে, ডিরেক্টরকে শাসাচ্ছে যে অন্যের চেয়ে বড় বাড়ি না দিলে তাকে ছেড়ে চলে যাবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পার্টির কল্যাণে সত্যরই জয় হল, কিন্তু নাটকটি দেখলে সন্দেহ থাকে না যে বর্তমানের সোভিয়েট নাগরিক অনেক সরকারী ব্যবস্থাকেই উৎপাত মনে করে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সে সম্বন্ধে নিজের মতামত প্রকাশ করতে দ্বিধা করে না।

শুধু নাটক বলে নয়। সার্কাসেও দেখেছি যে ক্লাউন বা ভাঁড় যখন কোনো সরকারী কর্মচারীকে বিদ্রূপ করে, তখনই সমবেত দর্শকমণ্ডলীর উৎসাহ ও করতালি সবচেয়ে বেশী। সোভিয়েট রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠতম অভিনেতাদের মধ্যে একজনের অভিনয় দেখলাম। প্রথম দৃশ্যে পেটের ওপর মস্ত বেলুন বেঁধে তার বিরাট মূর্তি। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল যে এত মুটিয়েছ কি করে? তৎক্ষণাৎ জবাব মিলল—আমি যে এখন ডিরেক্টার হয়েছি। পরের দৃশ্যে ডিরেক্টরী পদ ঘুচে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারা চুপসে কাঠির মতন। তখন সে দুঃখ করে বলছে যে কেন এত তাড়াতাড়ি মোটা হয়ে গেলাম, তা নইলে তো এত শীঘ্র ডিরেক্টরের পদ যেতো না। বেকার কাউকেই কাজ দিতে চাইলেই তার প্রথম উত্তর যে হয় ডিরেক্টর নয় এসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টরের পদ চাই।

সোভিয়েট নাট্যশিল্পের বিষয়ে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রত্যেক শহরেই নাটামঞ্চ রয়েছে এবং তারা দেশী বিদেশী নানা ধরনের নাটকের আয়োজন করে। সাইবেরিয়ার একটি শহর থেকে এক নাট্যদল মস্কোতে সেক্সপীয়র অভিনয় করতে এসেছিল। ভাষা অবশ্য রুশ, কিন্তু সেক্সপীয়রের পরিচিত কাহিনী অভিনয়ের গুণে আমাদের মতন যারা রুষ ভাষার এক বর্ণও জানে না, তাদের কাছেও মূর্ত হয়ে উঠল। কিন্তু নাটকের চেয়ে ব্যালে এবং অপেরা সোভিয়েট জনসাধারণের অধিকতর প্রিয় মনে হল। বিশেষ করে পুরনো যুগের ব্যালের দর্শকের অভাব নেই। সুবিখ্যাত বলশয় থিয়েটারে মরাল হ্রদ বা সোয়ান লেকের অভিনয় ১৯৫৬ সালে যখন মস্কো এসেছিলাম, তখন দেখেছিলাম। এবার লেনিনগ্রাডে পুনর্বার সেই ব্যালেরই অভিনয় দেখলাম। মস্কোর বলশয় থিয়েটারের খ্যাতি সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, সে তুলনায় আজকাল লেনিনগ্রাডের দ্যুতি খানিকটা

মলিন, কিন্তু তবু মনে হল যে মোটের ওপর লেনিনগ্রাডের অভিনয় মস্কোর চেয়েও উৎকৃষ্ট। সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরা বললেন যে লেনিনগ্রাড থিয়েটার বহু গবেষণার ফলে ময়াল হ্রদের প্রথম পরিবেশের আবহাওয়া পুনরাবিষ্কার করেছে। বিপ্লবের যুগে মস্কোতে যতখানি পরিবর্তন হয়েছে, লেনিনগ্রাডে তা হয়নি বলে আদি ব্যালের রস লেনিনগ্রাডেই বেশী মেলে।

রুশ সমালোচকের এ মন্তব্যে অনেকে হয়তো আশ্চর্য হবেন। পৃথিবীর বহুদেশে, এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষে অনেকেরই ধারণা যে বিপ্লবের ফলে রুশ সমাজের চেহারা একেবারে বদলে গেছে; মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতিও আর আগেকার মতন নেই। পরিবর্তন অবশ্য অনেক হয়েছে,—বর্তমানকালে পৃথিবীতে সব দেশেই পরিবর্তনের বেগ বেড়ে গেছে, আমেরিকার সমাজব্যবস্থায় যে সব পরিবর্তন এসেছে, কোন কোন বিষয়ে সে পরিবর্তন সোভিয়েট রাষ্ট্রের পরিবর্তনের চেয়ে কম নয়,—কিন্তু তবু রুশ জাতির ঐতিহ্য এবং রুশ-দেশের মানুষের স্বভাব মূলত বদলায়নি। পুরনো নাটক ও ব্যালের প্রতি অনুরাগ তো আছেই, এবং সে সমস্ত রচনার মধ্যে যেগুলিতে রাজরাজড়ার আড়ম্বর ঐশ্বর্য জাঁকজমক যত বেশী, সেগুলি বোধ হয় তত বেশী জনপ্রিয়। শ্রমিক জীবনের দুঃখ দৈন্য নিয়েও নতুন ব্যালে রচিত হয়েছিল, কিন্তু সেগুলি জমে নি। দর্শকের দল ভিড় করে পুরনো কালের ব্যালে দেখতে এসেছে এবং আসে। হয়তো তার একটি কারণ যে বাস্তব জীবনের অভাব অভিযোগ তো দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ব্যাপার, নাটকে ব্যালেতে আবার তা নতুন করে দেখবার ইচ্ছা হয় না। বরং তারা চায় যে প্রতিদিনের জীবনের সমস্ত অপূর্ণতা ও বঞ্চনা কল্পনার রাজ্যে মিশে যাক, সেখানে সব কিছু রঙীন স্বপ্নের মধ্যে দেখে ক্লান্ত চিত্ত আনন্দ এবং উৎসাহ পাক। বহু বিষয়ে রুশ দেশের সঙ্গে আমেরিকার মিল খুবই স্পষ্ট। রাজরাজড়ার প্রতি উভয় দেশের নাগরিকের আগ্রহ ও অনুরাগ দেখেও সে কথা বারবার মনে হয়।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে সঙ্গীত ও নাটক দেখে যতখানি আনন্দ পেয়েছি, সেখানকার সাম্প্রতিক সাহিত্য বা চিত্রকলায় তা পাইনি। চিত্রকলার উৎকর্ষের জন্যে সোভিয়েট একাডেমী তো রয়েছেই। তা ছাড়া ইউক্রেন, উজবেকস্থান, জর্জিয়া প্রভৃতি প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বতন্ত্র একাডেমীও রয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত দেশেই দেখা যায় যে একাডেমীর আধিপত্য যত বাড়ে, চিত্রকলার বৈচিত্র্য ও মৌলিকতা তত কমে যায়। সোভিয়েট রাষ্ট্রে তার লক্ষণ আরো স্পষ্ট। সোভিয়েট একাডেমী রাষ্ট্রের সমস্ত উচ্চ শিল্প শিক্ষাশালাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে চিত্রশিল্প বা সঙ্গীত শেখানো হয়, তাদের বেলায়ও শেষ পরীক্ষার মান নির্ণয় এবং ডিপ্লোমা দেওয়া একাডেমীর অন্যতম কর্তব্য। মাধ্যমিক স্কুলে লেখাপড়া শেষ করে ছাত্রছাত্রী এ সমস্ত শিল্প শিক্ষাশালায় আসে এবং পাঁচ ছয় বছর সেখানে অধ্যয়ন করে। সাধারণত চব্বিশ বছরের আগে কেউ ডিপ্লোমা পায় না, এবং সে ডিপ্লোমা না পেলে কোন স্কুলে শিক্ষকের কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। একাডেমীর এ আধিপত্যের ফলে সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্রের চিত্রকলায় এক বৈচিত্র্যহীন এক ঘেয়েমীর পরিচয় মেলে।

মস্কো, লেনিনগ্রাড, কিয়েভ এবং তাসকন্দে এ প্রসঙ্গ নিয়ে চিত্রশিল্পী সাহিত্যিক-দের সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছি। মস্কোতে একাডেমীর সভাপতি মণ্ডলের সদস্যদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে পুরাতন ও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ও পদ্ধতির

যে দ্বন্দ্ব ইয়োরোপের সমস্ত দেশেই দেখা দিয়েছে, সোভিয়েট রাষ্ট্রে তার প্রতিধ্বনি ওঠেনি কেন? ভারতবর্ষেও শিল্পীদের মধ্যে কেউ প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুগামী, কেউ ইয়োরোপের প্রচলিত পদ্ধতিকে স্মরণ করেন, আবার অনেকে নতুন নতুন বিপ্লবী অঙ্কন পদ্ধতিকে বরণ করতে চান। তাঁরা বললেন যে ১৯২০ সালের পর কয়েক বৎসর এ নিয়ে তুমুল বিতণ্ডা চলেছে, সে সময় সোভিয়েট শিল্পীরা নানানভাবে প্রাচীন শৈলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, কিন্তু বর্তমানে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করেই চিত্রশিল্পী সার্থকতা খুঁজে পান। তাঁরা একথাও বললেন যে জনতার সমাদরই শিল্পীর সিদ্ধির পরিচায়ক, তা নইলে ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিল্পে ব্যক্তিস্বাদ বহুক্ষেত্রে অনাচারে পরিণত হয়। তাই বর্তমানে সমস্ত শিল্পীই একই পথের পন্থী, তার নাম দিয়েছেন সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদ। তাসকন্দের একাডেমীর সভ্যরা একথা আরো স্পষ্ট করে বললেন। সমস্ত শিল্পী একই পদ্ধতিতে একই শৈলীতে শিক্ষালাভ করেন, তাই তাঁদের সকলের দৃষ্টি-ভঙ্গী ও অঙ্কন পদ্ধতি এবং নতুন ধরণ-ধারণ নিয়ে কোন সংঘর্ষ বাধবার সম্ভাবনা নেই।

উত্তরে আমি বললাম যে সব দেশে সব কালেই শিল্পী জনমানসের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে চান। কিন্তু জনসাধারণ যে কি চায় তা নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। শিল্পীর স্বভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের অভাব হলে শিল্পী সমাজকে কিছুই দিতে পারে না, তাই সমস্ত চিত্রকর ভাস্কর একই পদ্ধতি অবলম্বন করলে তাতে শিল্পের অবনতি হবার সম্ভাবনা। স্বাধীনভাবে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সুযোগ না থাকলে শিল্পের বিকাশ হয় না, একথা তাঁরা মানলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে যতটুকু স্বাধীনতা তাঁদের প্রয়োজন, সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থায় তা তাঁদের মেলে।

মস্কো বা তাসকন্দে যে উত্তর পেয়েছিলাম তাতে তুষ্ট হতে পারি নি। মনে হয়েছে এবং তাঁদের বলেছিও যে আসল প্রশ্ন তাঁরা এড়িয়ে গেছেন। স্বাধীনতা মেপে ঠিক করা যায় না, অবশ্য একথাও ঠিক যে স্বৈরাচারেও শিল্পের স্বকীয়তা নষ্ট হয়ে যায়। স্বতন্ত্র হয়েও সমাজের সঙ্গে যোগ স্থাপনেই শিল্পের সার্থকতা—তাই সার্থক শিল্প একই কালে একান্তভাবে বিশিষ্ট ও সার্বিক।

লেনিনগ্রাডে এবং বিশেষ করে কিয়েভে কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর খানিকটা অন্যভাবে মিলল। লেনিনগ্রাডে শিল্পীরা স্পষ্টভাবে স্বীকার করলেন যে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে শিল্পের মূল্যায়ন বদলে যায়। কিয়েভে শিল্পীগোষ্ঠী বললেন যে রাষ্ট্রীয় চিত্রশালা একাডেমীর বন্ধন থেকে মুক্ত নয়, কাজেই তারা যে সমস্ত ছবি সংগ্রহ করে তার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদের ছাপ স্পষ্ট, কিন্তু সোভিয়েট নাগরিক ব্যক্তিগত খুশীমত নানা ধরনের ছবি পছন্দ করে, কেনে। সেখানকার সাংস্কৃতিক দফতরের মন্ত্রী বরং দাবী করলেন যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং বৈচিত্র্যের যতখানি অবকাশ অন্য কোন সমাজে তার তুলনা মিলবে না। নিজের বক্তব্যকে পরিষ্কার করবার জন্যে বললেন যে অন্য সমস্ত সমাজ ও রাষ্ট্র শ্রেণী নির্ভর, তাই ব্যক্তি সেখানে স্বাধীন নয়, তার রুচি এবং শিক্ষা দীক্ষা শ্রেণীবিভক্ত সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। তাঁর মতে সোভিয়েট রাষ্ট্রে শ্রেণীভেদ নেই, তার শ্রেণী নির্ভর বিশ্বাস বা সংস্কারের প্রভাবও নেই, ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি অবারিতভাবে নিজের স্বভাব ও প্রতিভাকে বিকশিত করতে পারে।

উত্তরে আমি বললাম যে সোভিয়েট সমাজবাদীর ধনতান্ত্রিক সমাজ সম্বন্ধে ধারণা অনেক ক্ষেত্রে ভুল। তাঁরা ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রেণীবিভাগের যে কাঠামো দাঁড় করিয়েছেন,

তা অনেকক্ষেত্রে বাস্তব নয়। ধনতান্ত্রিক সমাজেও বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যোগাযোগ বহুমুখী, কেবলমাত্র শ্রেণী সংঘর্ষের কথা বলে তার সম্যক পরিচয় দেওয়া যায় না। ব্যক্তিগত রুচিও সর্বত্র শ্রেণীবিভাগ মেনে চলে না এবং ধনী ও দরিদ্র সকলের মধ্যেই রুচির বৈচিত্র্য দেখা যায়। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রের শাসন অপেক্ষাকৃত শিথিল বলে অন্যান্য দেশে রুচির ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীনতা অনেক বেশী, তাই সে সমস্ত দেশে শিল্পকলার বিকাশের সম্ভাবনাও অনেক বেশী।

ইউক্রেনের সাংস্কৃতিক মন্ত্রী একথা মানতে চাইলেন না। বললেন যে বর্তমানে হয়তো আমার কথার খানিকটা যৌক্তিকতা থাকতে পারে, কারণ এখনো সোভিয়েট রাষ্ট্র দারিদ্র্যের সমস্যা পুরোপুরি সমাধান করতে পারে নি। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি অবলম্বন করে সোভিয়েট রাষ্ট্র বর্তমানে যে ভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে অল্পদিনের মধ্যেই সোভিয়েট রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিক ইয়োরোপ বা আমেরিকার যে কোন দেশের নাগরিকের চেয়ে অনেক বেশী বিত্তবান হবে এবং তখন সমস্ত শ্রেণীবিবন্ধন মুক্ত সোভিয়েট নাগরিক শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে মুক্তবুদ্ধি ও বৈচিত্র্যের পরিচয় দেবে, বর্তমানের ধনতান্ত্রিক দেশের নাগরিক তা কল্পনাও করতে পারে না। উত্তরে আমি বললাম যে তাঁর এ স্বপ্ন সফল হোক,-এ আশা আমিও করি, কিন্তু যেদিন এ স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে, সেদিন বর্তমানের সোভিয়েট রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতি, সমাজ ব্যবস্থা বা দৃষ্টিভঙ্গীরও আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

এ আশা যে একেবারে অমূলক নয়, তার খানিকটা নিদর্শন এখনো মেলে। আমি যখন মস্কো ছিলাম, তখন সেখানে নিকোলস রোয়েরিকের চিত্রের এক প্রদর্শনী হচ্ছিল। চিত্রশালার অন্য সমস্ত কক্ষ বর্জন করে যেভাবে জনতা রোয়েরিকের আদর্শবাদী ধর্মনির্ভর ছবি দেখবার জন্যে ভিড় করে আসত, তা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ঠিক তেমনি লেনিনগ্রাডে দেখলাম যে সোভিয়েট শিল্পীদের চিত্র দেখবার জন্যে যত আগ্রহ, আধুনিক ফরাসী চিত্রকরদের বাস্তবদৃষ্টিমুক্ত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাস্তববিরোধী ছবি দেখবার জন্য আগ্রহ তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী। অথচ কয়েক বছর আগে পর্যন্ত সোভিয়েট নাগরিক এ সমস্ত ফরাসী চিত্রকরের ছবি দেখবার সুযোগ পায়নি, লেনিনগ্রাডের বিরাট চিত্রশালার কক্ষে সে সমস্ত ছবি লোকচক্ষুর অগোচরে বন্ধ ছিল। কয়েক বছর আগে ভারতীয় চিত্রের একটি প্রদর্শনী আমরা সোভিয়েট রাষ্ট্রে পাঠিয়েছিলাম, বহু চিত্রশিল্পীর কাছে শুনলাম যে সে প্রদর্শনী যে রকম সমাদর পেয়েছিল, বোধ হয় তেমন সমাদর বহুদিন অন্য কোন প্রদর্শনী পায়নি। সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর বললেন যে মরুভূমিতে তৃষ্ণায় উদ্বেল পথিক জল পেলে যে আনন্দ পায়, সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদী চিত্র দেখে দেখে ক্লান্ত শিল্পরসিক সোভিয়েট নাগরিক ভারতীয় চিত্র দেখে তেমনি আনন্দই পেয়েছিলেন।

যেমন চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে, তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মার্কস্‌বাদের বন্ধনের ফলে সোভিয়েট সাহিত্যিক মুক্ত বুদ্ধি মুক্ত হৃদয় নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন নি। মস্কোতে যখন এ সম্বন্ধে আলোচনা করি, তখন সাহিত্যিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা বললেন যে জনসাধারণকে বাদ দিয়ে সাহিত্য হয় না, জনসাধারণের দাবী মেটানো সাহিত্যিকের ধর্ম। উত্তরে আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে জনসাধারণ কি চায় সেটা স্থির করবে কে? সমস্ত দেশের সাহিত্যের ইতিহাসেই দেখি যে যুগে যুগে মানুষের রুচি বদলিয়েছে, এবং

সাধারণত প্রতিভাবান সাহিত্যিকের সাধনার ফলেই রুচির এ পরিবর্তন ঘটেছে। যা সবাই গ্রহণ করেছে, সাহিত্য যদি তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে এবং বারবার শুধু তারই পুনরাবৃত্তি করে, তবে মানুষের অনুভূতি ও প্রকাশ ক্ষমতা দুয়েরই ক্ষতি। আরো জিজ্ঞাসা করলাম যে তাঁরা যে সাহিত্য-সংঘের উপর এত জোর দিচ্ছেন, তাতে সত্যিকার সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাঘাত হবার সম্ভাবনাই বেশী। সাহিত্য-সংঘে সবাই মিলে আলাপ আলোচনা করতে পারে, পরস্পরের অভিজ্ঞতার আদান প্রদানও সেখানে সম্ভব, কিন্তু সত্যিকার সাহিত্য সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন শিল্পীর একক সাধনা। অনেক আলাপ আলোচনার পরে লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ স্বীকার করলেন যে সাহিত্য-সংঘের প্রধান কর্তব্য লেখকদের সামাজিক অধিকার রক্ষা, সাহিত্য সৃষ্টির কাজে সংঘের হস্তক্ষেপে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী।

কিয়েভেও সাহিত্য-সংঘের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনায় এ প্রশ্ন তুলেছিলাম। সেখানে দেখলাম সাহিত্য-সংঘের সভায় চিত্রকর ও সঙ্গীতকাররাও এসেছেন। বস্তুতপক্ষে, অনেক ব্যাপারেই ইউক্রেনে স্বাধীনতার প্রসার খানিকটা বেশী মনে হল। আলাপ আলোচনা শুরু হবার গোড়াতেই ইউক্রেনের বিখ্যাত লেখক প্লাটোন ভারেঙ্কো বললেন যে ভারতবর্ষে আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন বলে তিনি ধন্য—প্রকৃতির ঐশ্বর্য এবং মানুষের সৃষ্ট শিল্পে সৌন্দর্যের এত প্রাচুর্য তিনি আর কোথাও দেখেন নি। তাঁকে দেখে সত্যিকার শিল্পী মনে হল। তর্ক বিতর্কে তিনি বিশেষ যোগ দেন নি, নিজের কল্পনা অনুযায়ী সাহিত্য সৃষ্টিতেই তাঁর আনন্দ এবং সে সাহিত্য তার দেশ ও সমাজ অকুণ্ঠভাবে গ্রহণ করেছে।

কিয়েভে উপস্থিত লেখকদের মধ্যে অনেকে যে স্বাধীনতার সঙ্গে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করলেন, তা সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্য কোথাও দেখি নি। সবচেয়ে বেশী কড়াকড়ি দেখেছি মস্কোতে, লেনিনগ্রাড রাজধানী নয় বলে এবং বহুদিনের পুরনো ঐতিহ্যের জোরে লেখকদের মধ্যে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করবার রেওয়াজ রয়েছে। কিয়েভে সে স্বাধীনতা আরো বেশী পরিস্ফুটে। ইউক্রেনিয়ান একজন লেখক বললেন যে তাঁদের শ্রেষ্ঠ শিল্পী সাহিত্যিক এবং কবি শিভোশেঙ্কোর প্রভাবেই তা সম্ভব হয়েছে। তিনি ইউক্রেনের সাহিত্যে নবীন জীবনের সঞ্চার করেন এবং জাতির জীবন যে ভাবে প্রভাবান্বিত করেন তাতে বাঙলাদেশের জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথা মনে পড়ে। একজন সাহিত্যিক বললেন যে শিভোশেঙ্কোকে ইউক্রেন দেশের রবীন্দ্রনাথ বলা উচিত।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সমাদর প্রায় সর্বত্রই দেখলাম। তাঁর রচনার অনুবাদ শুধু ইউক্রেন বলে নয়, সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্য অনেক রাষ্ট্রেও স্বভাষায় হয়েছে। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রুশ ভাষায় তাঁর রচনা প্রকাশের যে বিরাট আয়োজন হচ্ছে, বারান্তরে তার আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে। ভারতীয় মহৎ সাহিত্যের অনুবাদের নমুনা আরো মেলে কিন্তু তবু একথা মানতে হবে যে অনুবাদের জন্য ভারতীয় সাহিত্যের নির্বাচন বহুক্ষেত্রেই ভুল পদ্ধতিতে চলেছে। এমন অনেক ভারতীয় লেখকের অনুবাদ সোভিয়েট রাষ্ট্রে হয়েছে যাদের নাম কোনদিন দেশে শুনি নি। সোভিয়েট রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রীকে বললাম যে এ ধরনের নিকৃষ্ট সাহিত্যের অনুবাদে ভারতবর্ষ এবং সোভিয়েট রাষ্ট্র উভয়েরই ক্ষতি। ভারতীয় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের বদলে বাদবিতণ্ডামূলক প্রচার সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সোভিয়েট নাগরিক ভারতবর্ষের সত্যিকার পরিচয় পাবে না। অন্যপক্ষে এ ধরনের সাহিত্য বিতরণের ফলে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সোভিয়েট নাগরিকের ভ্রান্ত

ধারণা ভারতবর্ষেরও ক্ষতি। এ কথা মোটামুটিভাবে তাঁরা মানলেন এবং আমাদের সাহিত্য আকাদমীর সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগের প্রস্তাব কার্যকরী করবেন বলে জানালেন।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে ভারতীয় সাহিত্যের যেমন অনেক অপ্রয়োজনীয় ও নিকৃষ্ট বই অনূদিত হয়েছে, সোভিয়েট সাহিত্যের ভারতীয় ভাষায় অনুবাদেও সেই একই গলদ দেখা যায়। রুশ সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম বই বাদ দিয়ে রাজনৈতিক কারণে মাঝে মাঝে যে সব বই অনূদিত হয়েছে, তাতে ভারতীয় পাঠকের রুশ সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়বে না। তাছাড়া বহুক্ষেত্রে অনুবাদ অত্যন্ত খেলো। বাঙলা, হিন্দি এবং উর্দু কয়েকটি অনুবাদে দেখলাম যে ভাষা অনেক জায়গায় কাঁচা, এমন সব কথা এমনভাবে ব্যবহার হয়েছে যে কানে লাগে। বাঙলা অনুবাদকদের মধ্যে আমাদের কয়েকজন নামকরা সাহিত্যিক রয়েছেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনারা যে কাজের ভার নিয়েছেন, তার বাঙলা এত দুর্বল কেন? উত্তর শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তাঁরা বললেন যে তাঁরা অনুবাদ করবার পরে রুশ বিশেষজ্ঞ তার সংশোধন করেন এবং সে সংশোধন সময় সময় এমন মারাত্মক হয়ে পড়ে যে তাকে আর বাঙলা বলে চেনা যায় না।

এ বিষয়ে পরে আরো আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে।

[ক্রমশঃ]

কবিতা

মনে আসবে

অরুণ মিত্র

প্রজাপতি ওড়ার ছোট্ট জায়গা। হালকা আর গাঢ় কিছু রঙে হাওয়া বুঁদ হয়। গুটি কয় মাত্র কুঁড়ি, কিন্তু তারা বুঝি সারা আকাশ জুড়ে ফুটবে। নরম জমিতে কয়েকটা উল্লসিত পায়ের দাগ। কারা ছুটে গিয়ে সূর্যের আলোর মধ্যে উধাও হয়েছে।

অস্থির উত্তাল ক্ষেতটা আরও দূরে। তবু এখান থেকেই দেখা যায় কাস্তেগুলো হঠাৎ অবাক হ'য়ে থেমে গিয়েছে। এক প্রতিশ্রুত অপরূপ আকাশ যেন তাদের উপর। মাঠভাঙা দুরন্ত নিষ্ঠুর স্রোত থিতিয়ে যেন সোনার দীঘির মতো হয়েছে।

কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থাকার সময় নেই। রোদের ভিতর নতুন নগর উঠেছে। বাড়ীঘর রাস্তা যদি জ্যোৎস্নায় বা অন্ধকারে ডুবে যায় তাহলে প্রদীপ্ত উৎসব কি ক'রে হবে? ঝাড়বাতি সাজাবার আছে, তোরণ তুলবার আছে। তারপর আবার নতুন নগর।

বড় বড় স্তম্ভের পেছনে হয়তো বন্ধুদের মুখ; অভ্যর্থনা অভিনন্দন উচ্ছ্বাসের দমকে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে। আমরা কেউ কারো খোঁজ পাব না। কিন্তু এ জায়গাটুকুর কথা আলাদা ক'রে আমাদের সবারই মনে আসবে। অশ্রুর পথ পেরোতে গিয়ে এখানে সবাই এক মুহূর্ত দাঁড়িয়েছি। একা একা।

এই পথ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

চোখে চোখ পড়তে

পুরনো বন্ধুত্ব
একটু হেসে
হাত নেড়ে চলে গেল।

কাঁচের গায়ে চোখ রেখে
পেছন ফিরে একবার চাইলেই
দূর থেকে দেখতে পেত

ময়রার দোকানের
কান-বেঁধানো এক উটকো শালপাতা
একটা মধুর স্মৃতি ঠোঁটে ক'রে নিয়ে
ডানাভাঙা পাখির মত
একটু উড়তে চেষ্টা করেছিল।

তাকে জুতোর তলায় চেপে,
চারিদিকে তাকিয়ে,
ভাল ক'রে গাড়িঘোড়া দেখে,
তারপর খুব সাবধানে
আমি রাস্তা পার হলাম।

২

বুড়োধাড়ি গাছ
যেন কোমরে ঘুনসি বেঁধে
দিগম্বর সেজে দাঁড়িয়ে আছে

ভাঙা জং-ধরা লোহার বেড়াটার গায়ে
দড়ির আগুনে
নিভে-যাওয়া সিগারেটটা ধরাতে গিয়ে
হাসি পেল।

একদল লোক হরিবোল দিতে দিতে
খই ছড়িয়ে গেছে রাস্তায়
একদল কাক তাই
খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

কলের জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে।
ছলৎ ছল ছলৎ ছল
ঝাঁঝরিতে জল পড়ার শব্দ।

মাথার ওপর একটানা দীর্ঘ তারে
ছড় টেনে
ঝড়ের সুর বাজাতে বাজাতে গেল
একটা মন্থর ট্রাম।

তারপর আবার ছলৎ ছল ছলৎ ছল
জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে
ঝাঁঝরিতে।

আমি আজও ভুলিনি

সামনে পেছনে সশস্ত্র পাহারা
আকাশ পত্রজালে ঢাকা
আমরা বন্দীর দল
পাথরে পা টিপে টিপে উঠছি

হঠাৎ আমরা কথা বন্ধ করলাম
তারপর কান পেতে শুনতে লাগলাম
স্তব্ধ পাহাড়ে
ছলৎ ছল ছলৎ ছল
এক অদৃশ্য ঝর্নার শব্দ।

একটা ঘুড়ি কেটে এসে পড়তেই
রাস্তায় খুব হল্লা হল।
পুলিশের কালো গাড়ি এসে থামতে
কে একজন পেছন থেকে বলল—

মিছিল এই পথ দিয়েই যাবে।

আশ্বিনের ফেরিওলা

হরপ্রসাদ মিত্র

কলুটোলা, চীনেবাজার, মুর্গিহাটা জুড়ে এই জগৎ।
তাতেই আসা-যাওয়ার, হাঁটা-চলার খেলা।
ফেরিওলা হাঁকছে তো হাঁকছেই—
চাই চুড়ি, চাই পুতুল, চাই ভুলে থাকবার কিছু!

মাঝে মাঝে আকাশে ঘাড় উঁচিয়ে দেখে যাও
উচ্চাশার ইঁটে গাঁথা হতাশার প্রাসাদ।
বাতাসে লোহালক্কড়ের ঝম্‌ঝম্‌, ঝম্‌ঝম্‌!
এমন কোনো মৌন নেই
—যেখানে প্রাণ আত্মস্থ হয়।
এমন কোনো ঝর্না নেই
—যাতে গা ডুবিয়ে নিলে
শরীর সুখী হতে পারে!

জগতের সেরা আঙুর থেকে তৈরী মহামূল্য মদ
নিয়ে বসেছেন আমার মনিব।
জগতের বিশুদ্ধতম বিষ্টিতে পিপাসা মেটাতে চাইছেন অতৃপ্ত আমার কবি।
এদিকে, প্রকাণ্ড বাড়িটার ভিতে
রোদে চিক্‌মিক করছে অশথচারাটি,
আকাশে পায়রা উড়ছে,
সামনের রাস্তায় লোক-চলাচলের বিরাম নেই।

মানব-সংসারের কলগুঞ্জন চলেছে কলকাতার এই
উঠোন ভেদ করে।
এই অলিগলি-ঘিঞ্জির মধ্যেই আশ্বিনের রোদ এলো।
বেজে উঠলো সে কোন্‌ ঝিঞ্জীর!
ব্যক্ত আর অব্যক্ত, দৃশ্য আর স্মৃতি এক হোয়ে দেখা দিল
সজল সকালের রন্দ্ররে।
ফেরিওলা হেঁকে উঠলো—
চাই চুড়ি, চাই পুতুল, চাই ভুলে থাকবার কিছু!

মাইফেলের পর

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

সুরা-সুরভিত রাত; বাতিগুলো জাগে শুধু বেলোয়ারি ঝাড় আর লণ্ঠনের নিচে।
মথিত ফরাসে ছিন্ন মল্লিকার ম্লান মালা, গেলাস, বোতল আর তাকিয়া গড়ায়—
নাচের নূপুর স্তব্ধ; তারের যন্ত্রেরা মূক, রাত ঢের, কান্না-ঝরা ক্লান্ত নটী একা
খোলা জানলার কোলে আকাশে চাঁদের নৌকো মেঘের ঢেউয়ের আড়ে দেখা
শেষ ক'রে ফিরে আসে শ্লথ পদে; কেঁদে যুঁই মালা ছেঁড়ে, দু'পায়ে মাড়ায়।
নেশাড়ী পুরুষ ক'টি যাদের মসৃণ মুখে সুরা ও সুরতক্লান্তি ক্লিষ্ট বর্ণে লেখা—
প'ড়ে আছে ইতস্তত; দেখে বিবমিষা লাগে—কেন আর কবে থেকে জেনেছে কি নিজে
অন্তরে লুণ্ঠিতা নারী জীবনের যৌবনের কান্না আর ঘেন্না মেখে গিয়েছে যে ভিজে?

দ্বৈত

রাম বসু

আমার জন্যেও নয় এ নয় তোমার জন্যে জ্বলা
আমাদের মর্মে মূলে সঞ্চারিত পিঙ্গল অভাব
বনে অন্ধকারে শুনে ধারা-পতনের গাঢ় গলা
চেতনা কশায় জাগি, খুঁজি হৃত সত্তার স্বভাব।

উড়িয়ে কণ্ঠের পাখী ভালবাসি আমি ভালবাসি
—এই শুধু উচ্চারণে দিগন্ত ধরিয়ে দিলে থাকে
কস্তুরী নৈঃশব্দ্য, তার নগ্ন আভা দিব্য অবিনাশী
ওষ্ঠতটে নগ্ন ঢেউ তুলে শূন্যে ভাসায় আমাকে।

শিথার সর্বাঙ্গ রক্তে অরাজক সুরের প্রবাহ
বর্বর দেবতা আমি সুরভিত ক্ষুধার কণকে
প্রেমিকা আমার তুলে নাও প্রবল সুন্দর দাহ
চুম্বনে চরম চিহ্ন এঁকে দেবো আনন্দিত ত্বকে।

নীথর বিদ্যুৎ-গাছ বিপর্যয়-ভাষা বলে' কানে
দৃষ্টিদানে উদ্ভাসিত;—আমরা সে মায়ার দর্পণে
প্রিয়-কণ্ঠ ছায়ানদী, শান্ত স্থির রূপের নির্মাণে
স্বেচ্ছা-নির্বাসিত শিল্পী অস্তিত্বের দুর্গম নির্জনে।

এই তো জন্মের দেশ মেরু-স্তব্ধ প্রাগৈতিহাসিক
বন্য ব্যস্ততায় লুপ্ত; দায় নেই দিক-নির্ণয়ের
নির্মম প্রতিভা রক্তে ভ্রান্তিহীন বাঁজমন্ত্র দিক
এখন আমরা আদি মৃত্তিকার ও পরস্পরের।

সমালোচক

অমলেন্দু বসু

সমালোচনায় অধিকার কার? যিনি স্বয়ং সাহিত্যস্রষ্টা, যিনি কবি, সমালোচনায় তাঁরই অধিকার না সাহিত্য উপভোগ করার রুচি সত্ত্বেও সাহিত্যসৃষ্টি যাঁর ক্ষমতার বাহিরে?

প্রশ্নটি হাল্কা নয় কেননা এ-প্রশ্নের সঙ্গে আরো কয়েকটি প্রশ্ন অনুলিপ্ত।

সমালোচনা কাকে বলি? ইওরোপীয় সাহিত্যে ক্রিটিক্ বলতে যা' বোঝায়, বিশেষত রেনেসাঁস-উত্তর যুগ থেকে যা' বুঝিয়েছে, ইংরেজি সভ্যতার অভিসংঘাতের পরে থেকে বাঙলা সাহিত্যেও আমরা যা' বুঝেছি, ক্রিটিসিজ্‌ম্ বা সমালোচনার তেমন কোনো অভিধা সংস্কৃত চিন্তার ঐতিহ্যে ছিল কিনা সন্দেহ, ইওরোপীয় ঐতিহ্যেও বোআলো-ড্রাইডেন্-জন্‌সন্-এর পূর্বে তেমন স্পষ্ট ছিল না। ক্রিটিসিজ্‌ম্ আর সমালোচনা, এই শব্দ দুটির উৎপত্তি বিবেচনা করুন। ইংরেজি শব্দটির মূলে লাটিন ক্রিটিকাস্, গ্রীক ক্রিটিকোস্। মূল গ্রীক ও লাটিনে (মধ্যযুগীয় ফরাসী ভাষায়ও) এ-কথাটির চিকিৎসা-শাস্ত্রীয় মানে ছিল। 'ক্রাইসিস্' থেকে 'ক্রিটিক্যাল', সে-অর্থ ইংরেজি ভাষায় এখনো চলছে। ব্যাধির সঙ্কটমুহূর্তে চিকিৎসকের সতর্ক বিচার শক্তিতে যে-ভরসা রাখি, সে-শক্তিই ক্রিটিকের শক্তি। কালক্রমে (অন্যান্য বহু শব্দের মতো) এ-শব্দটি এর গোড়াকার সঙ্কীর্ণ অভিধা ছাড়া ব্যাপকতর অর্থ গ্রহণ করল, সে-অর্থে প্রবল হ'ল বিচার শক্তি, দ্রুটিনির্ণয় শক্তি। ইংরেজি ভাষায় critic, critical, criticism, criticize শব্দগুলি আবির্ভূত হয়েছিল মধ্য-ষোড়শ থেকে মধ্য-সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তর্বর্তী কালে আর সে কাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যহের সাহিত্য চিন্তার পরিণামে ক্রিটিসিজ্‌ম্ কথাটির আধুনিক অভিধা জন্মেছে। সংস্কৃতে সমীক্ষা বলতে বোঝাতো গ্রন্থ আলোচনা কিন্তু তা'তে আধুনিক সমালোচনার তাৎপর্য ছিল না। (লক্ষ্য করা দরকার যে সমীক্ষা ও আলোচনা—যে দুটি শব্দে সংস্কৃত যুগে সাহিত্য-আলোচনা বোঝাতো—এ-শব্দ দুটির তাৎপর্য ঈক্ষণ, দৃষ্টিপাত, অবলোকন, কিন্তু এ-অর্থে বিচার ক্রিয়ার সে-ইশারা নেই যা' গ্রীক ও লাটিনের মূল শব্দে পাওয়া যায়।) সংস্কৃতের ভাষ্যকার ছিলেন অর্থবেত্তা, রসবেত্তা, সমঝদার লোক। আধুনিক অর্থে সমালোচক মূল্যবেত্তা, জহুরী, বিচারবিৎ। এই দুই শ্রেণীর সাহিত্যালোচনায় পার্থক্য প্রচুর এবং মৌল কিন্তু দুটি বিষয়ে তারা সমগোত্র : (১) দু' রকম আলোচনাতেই তারিফ করার শক্তি থাকা দরকার। রসের প্রশংসা করবেন রসিক, শিল্পের কদর বুঝবেন জহুরী, তবেই না জমবে তাঁদের আলোচনা! (২) দু' রকম আলোচনারই গোড়াতে সাহিত্যরূপ কী সে-সম্বন্ধে খানিকটা থিওরি বা ভাবীয়ত্রী ধারণা বিদ্যমান, সে ধারণা হয়তো সবসময় খুব স্পষ্ট, সুসম্বদ্ধ ও প্রকট নয়, তবুও বিদ্যমান। যিনি ভাষ্যকার ও রসবেত্তা তিনি অবশ্যই রস-শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁর রসশাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর সাহিত্য পাঠ সুসম্মত ব'লেই তিনি ভাষ্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তবুও সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে (এবং গ্রীকো-রোমান রেটরিক শাস্ত্রেও) ইস্থেটিক্‌স্ বা নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে কাব্যপাঠের ও কাব্যমূল্যায়নের সে-সংগতি নেই যা' আধুনিক সমালোচনা-শাস্ত্রের সর্বপ্রধান লক্ষণ। ভারতীয় ঐতিহ্যে ছিল ভাষ্যকার, টীকাকার, ছিল না আধুনিক অর্থে সমালোচক, আর এই আধুনিক অর্থ ইওরোপীয় চিন্তার ক্রম-

বিকাশেরই পরিণতি কেননা যদিচ লাটিন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে ভারতের মতোই টীকা ও ভাষ্য রচিত হয়েছিল অগুণতি, যদিচ সে দেশেও সাহিত্যিক পঠন পাঠন দীর্ঘকাল সীমাবদ্ধ ছিল ব্যাকরণে ও অলঙ্কারশাস্ত্রে, তবুও সোক্রাটেস্-প্লেটো-আরিস্টট্‌ল-হোরেস্-লনজাইনাস্ থেকে যে-চিন্তা ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করেছিল তারই উত্তরাধিকার একালের সর্বদেশীয় সাহিত্য চিন্তায়।

সমালোচনার আধুনিক অর্থ কী?

সমালোচনার সংজ্ঞা টি. এস্. এলিয়ট দিয়েছেন এইভাবে : the commentation of works of art by means of written words- (লিখিত শব্দের মাধ্যমে শিল্পকর্মের ভাষ্য ও ব্যাখ্যারচনা)। এমন হওয়া সম্ভব যে সংস্কৃত-পড়া এলিয়ট সংস্কৃত ভাষ্যের অনুরাগী ব'লেই সমালোচনার এহেন সেকেলে অভিধা দিয়েছিলেন। কিন্তু এ-ও সত্য যে তিনি এ অভিধাতেই আবদ্ধ থাকেননি। এলিয়ট নানা কারণে (অসঙ্গত কারণ নয় সেগুলি) সমালোচনার নামে যে সব হঠকারী রচনা সংবাদপত্রে সচরাচর দেখা যায় তা'র বিরুদ্ধে কশাঘাত করেছিলেন এবং যে-sense of fact, যে-তথ্যনিষ্ঠা সৎসমালোচকের মস্ত লক্ষণ তা'র প্রতি আমাদের চিন্তা আকর্ষণ করার জন্য বলেছেন :

Any book, any essay, any note in *Notes and Queries* which produces a fact even of the lowest order about a work of art is a better piece of work than nine-tenths of the most pretentious critical journalism in journals or in books.

(সংবাদপত্রে অথবা বইয়ে যে "খবুরেকাগুজে" হামবড়া সমালোচনা বেরয় তা'র শতকরা নব্বই ভাগের চেয়েও অনেক উন্নত কাজ তেমন বই, তেমন প্রবন্ধ, "নোটস এ্যান্ড কোয়েরিস্" পত্রিকায় প্রকাশিত যে-কোনো সংক্ষিপ্ত রচনা যাতে শিল্পকর্ম সম্বন্ধে যত তুচ্ছই হোক না কেন কিছু তথ্য পাওয়া যায়।) এলিয়টের তথ্যপ্রিয়তা ঠিক প্রাচীন ভাষ্যপন্থী নয়, বরং অতীব অধ্যবসায়ী আধুনিক textual scholarship -এর অর্থাৎ গ্রন্থজ্ঞানী তীক্ষ্ণ পাণ্ডিত্যের পক্ষপাতী। Impressionistic criticism নামে এককালে যে আত্মকেন্দ্রিক স্বমতবিলাসী শিথিলদায়িত্ব রচনা সাহিত্যিক মহলে লোকপ্রিয় হয়েছিল তাকে বর্জন করাই এলিয়টের উদ্দেশ্য। বস্তুত স্বয়ং আধুনিক সমালোচনার অন্যতম ধারক ও বাহক হ'য়ে এলিয়ট যে সমালোচনার আধুনিক অভিধা সম্বন্ধে সচেতন, তীক্ষ্ণভাবেই সচেতন, তা'র আভাস পাওয়া যায় যখন তিনি বলেন :

Criticism must always profess an end in view which, roughly speaking, appears to be the elucidation of works of art and the correction of taste.

(সমালোচনার দৃষ্টিপথে সতত একটি উদ্দেশ্য থাকা চাই, যে-উদ্দেশ্য—মোটামুটিভাবে বলতে গেলে—শিল্পকর্মের উজ্জ্বল ব্যাখ্যা এবং রুচিমার্জনা।) অর্থাৎ এলিয়টের বিশ্বাসে সমালোচনায় সচেতন উদ্দেশ্য একান্ত আবশ্যক, সমালোচকের এমন জ্ঞান থাকা প্রয়োজন যাতে তিনি বুঝতে পারেন কোন্‌টি শিল্পকর্ম কোন্‌টি সংরুচি, এবং এই জ্ঞানের সাহায্যে তিনি প্রথমে শিল্পের ব্যাখ্যা (প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা অবশ্য) করবেন আর সেই সঙ্গে অপরের রুচিমার্জনা করবেন। সচেতন উদ্দেশ্য, মূল্যজ্ঞান, সংরুচিবিস্তারস্পৃহা এই তিনের অধিকারিত্বে সমালোচকচরিত্র বৈশিষ্ট্যবান। নানা কারণে এলিয়ট 'সমালোচনার' সুস্পষ্ট সংজ্ঞাদানে

বিরত থেকেছেন কিন্তু সংজ্ঞার যে-আভাসমাত্র তিনি দিয়েছেন তা'র নির্দ্বিধ প্রকাশ ম্যাথিউ আর্নল্ডে ও আইভর্ রিচার্ডস্-এ। এঁদের সারকথা যে সমালোচনা আসলে মূল্যায়ন, আর এ-কথায় এ যুগের অধিকাংশ সাহিত্যশাস্ত্রীর সমর্থন মিলবে অল্পবিস্তর। আর্নল্ডের সংজ্ঞা :

(Criticism is) a disinterested endeavour to learn and propagate the best that is known and thought in the world.

(জগতে শ্রেষ্ঠ ব'লে যা' কিছু জ্ঞাত হয়েছে বা ভাবা হয়েছে তা' জানবার এবং প্রচার করবার জন্য নিষ্কাম প্রয়াসই সমালোচনা)। আর্নল্ড অন্যত্র ক্রিটিসিজমের কথায় বলছেন :

Its business is, simply to know the best that is known and thought in the world, and by in its turn making this known, to create a current of true and fresh ideas.

(জগতে শ্রেষ্ঠ যা'কিছু জানা হয়েছে বা অনুভাবিত হয়েছে তা'ই জানা এর কাজ, আর কাজ এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রচার ক'রে সত্য ও সজীব চিন্তাধারার সৃষ্টি করা)। যেমন এলিয়টের উক্তিতে তেমনই আর্নল্ডের উক্তিতে প্রধান বক্তব্য যে জ্ঞান অর্জন করতে হবে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ চিন্তা সে-বিষয়ে, সে-জ্ঞান অপরের সম্মুখে উপস্থাপিত করতে হবে, এবং এতদ্বারা নবীন চিন্তাধারার প্রবাহন করাতে হবে। রিচার্ডস বলেছেন :

Criticism, as I understand it, is the endeavour to discriminate between experiences and to evaluate them.

(সমালোচনা ব'লতে আমি বুঝি অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞতায় তারতম্য বিচার ও তাদের মূল্যায়ন।) রিচার্ডস্-এর ধারণায়ও সমালোচন কর্মে জ্ঞান আহরণের প্রয়োজন, সদসৎ ও শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্টের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, নতুবা যে কোন অভিজ্ঞতার সঙ্গে অপর অভিজ্ঞতার প্রভেদ বিচার করা যাবে কেমন ক'রে? তাদের মূল্যনিরূপণ করব কী ক'রে?

তীক্ষ্ণধী আধুনিক সমালোচক আরো জনকয়েকের উক্তির উল্লেখ করা বাহুল্য হবে না।

প্রতিপত্তিশালী আমেরিকান সমালোচক হেন্‌রি লুই মেন্‌কেন্ বলছেন :

The function of a genuine critic of the arts is to provoke the reaction between the work of art and the spectator ; the spectator, untutored, stands unmoved ; he sees the work of art, but it fails to make any intelligible impression on him ; if he were spontaneously sensitive to it, there would be no need for criticism.

(খাঁটি শিল্পসমালোচকের কাজ এই : শিল্পবস্তু সম্বন্ধে দর্শকের চিত্তে প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করা। বিনা শিক্ষায় দর্শক দাঁড়িয়ে থাকেন অনুভূতিশূন্য অবস্থায়। শিল্পবস্তু তিনি দেখেন বটে কিন্তু তাঁর চিত্তে কোনো বোধগম্য ছাপ পড়ে না। সমালোচনার কোনো প্রয়োজনই হ'ত না যদি তিনি স্বতঃই শিল্পের প্রতি সংবেদনশীল হতেন।) এখানেও সংরুচি বিস্তারের কথা আছে কিন্তু রুচিবিস্তার তিনি কী ভাবে করবেন যদি সংরুচি কোন্‌টি সে-বিষয়ে তাঁর নিজেরই জ্ঞান না থাকে?

বহু সাহিত্যিকের চিন্তাগুরু এজরা পাউণ্ড বলছেন :

Excernment. The general ordering and weeding out of what

has actually been performed . . . . the ordering of knowledge so that the next man (or generation) can most readily find the live part of it, and waste the least possible time among obsolete issues.

(বাছাইয়ের কাজ। যে-কাজ বাস্তবিক করা হয়েছে তা'র বিন্যাস ও নিড়নো। জ্ঞানের বিন্যাস যা'তে এর পরের জ্ঞানার্থী (অথবা পরবর্তী পুরুষপর্যায়ের জ্ঞানার্থী) চট ক'রেই প্রাণবান অংশটি খুঁজে পায়, অপ্রচলিত সমস্যা নিয়ে সময় নষ্ট হয় না।)

ইদানীংকার প্রভাবশালী ইংরেজ অধ্যাপক-সমালোচক ডক্টর লীভিস্ বলছেন :

The critic's aim is, first, to realize as sensitively and completely as possible this or that which claims his attention, and a certain valuing is implicit in the realizing . . . . A philosophic training might possibly—ideally would—make a critic surer and more penetrating in the perception of significance and relation and in judgment of value . . . . the business of the literary critic is to attain a peculiar completeness of response and to observe a peculiarly strict relevance in developing his response into commentary ; he must be on guard against abstracting improperly from what is in front of him and against any premature or irrelevant generalizing.

(সমালোচকের লক্ষ্য, প্রথমত, যে-বিষয়ে তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে, যতদূর সম্ভব সংবেদিত ও সম্পূর্ণভাবে সে-বস্তু প্রণিধান করা, আর এই প্রণিধানে কিছুটা মূল্যায়নকর্ম অবশ্যই নিহিত থাকে। সমালোচকের যদি দার্শনিক অনুশীলন থেকে থাকে—তেমন হওয়াই আদর্শ মনে করি—তাহ'লে তাৎপর্যজ্ঞান, সম্পর্কজ্ঞান এবং মূল্যনিরূপণ বিষয়ে তাঁর উপলব্ধি নিশ্চয়তর ও গভীরতর হবে......সাহিত্য-সমালোচকের কাজ সংবেদনায় পূর্ণতা অর্জন করা আর এ-সংবেদনাকে প্রসঙ্গনিষ্ঠ দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাখ্যায় ও ভাষ্যে পরিণত করা। তাঁকে সতর্ক হ'তে হবে যেন বক্ষ্যমান সাহিত্যবস্তু থেকে অবৈধ অর্থ আকর্ষণের চেষ্টা না করেন অথবা অপ্রস্তুত ও অপ্রাসঙ্গিক সাধারণ মন্তব্যে লিপ্ত না হ'ন।)

দেখা যাচ্ছে, আধুনিক অর্থে সমালোচনা ও মূল্যায়ন সমার্থ। মূল্যায়ন কী ভাবে হবে, কেন মূল্যায়ন, সে-মূল্যায়নেরই বা কী মূল্য, কোন্ তৌলদণ্ডে মূল্যায়ন, এহেন অনেক সূক্ষ্ম প্রশ্নে সমালোচকদের মধ্যে অনেক বিতণ্ডার উদ্ভব হ'য়ে থাকে কিন্তু আধুনিক সমালোচনা-তত্ত্বের ইমারত গড়ে' উঠেছে কয়েকটি সর্বস্বীকৃত চিন্তার বুনিয়াদের উপরে। যদি মানি যে সমালোচনা মানে মূল্যায়ন, তাহ'লে এ-ও মানব যে মূল্যায়ন মাত্রেই তুলনাশীল। কোনো বস্তুরই পরম মূল্য নেই (বাক্যাতীত চিন্তাতীত তুরীয় জ্ঞান ছাড়া), মূল্য মানেই আপেক্ষিক গুণারোপ। যে-বস্তু অদ্বিতীয়,—ধরা যাক, মীনাক্ষী মন্দির, সেলিমশাহ্ চিশ্তীর সমাধি, এল গ্রীকো'র 'জনৈকা মহিলা'—তা'রও মূল্যায়ন চলে একটা শিল্পাদর্শের তুলনায়। অর্থাৎ এমন মন্দির তৈরি হ'তে পারে যা' মীনাক্ষী মন্দিরের চেয়ে মহৎ, অথবা তা'র তুলনায় অখুঁত। সুতরাং সুন্দর অনন্য বস্তুরও সৌন্দর্যের মাপকাঠি আছে। আর মাপকাঠি জানতে হ'লে সুন্দর বস্তু সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। মীনাক্ষী মন্দির দেখতে হবে, আরো অনেক মন্দির দেখতে হবে, তবেই না শিল্পাদর্শ গড়ে' উঠবে। মূল্যায়নের গোড়ার কথা, প্রচুর জ্ঞান।

আধুনিক সমালোচনার প্রথম সর্বস্বীকৃত চিন্তা যে মূল্যায়নই সমালোচনার বিশিষ্টতম গুণ। দ্বিতীয় চিন্তায় পৌঁছই এই ধারণায় যে সমালোচনা মাত্রেই কোনো না কোনো থিওরির অর্থাৎ ভাবয়িত্রী জ্ঞানের, কোনো না কোনো দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সমালোচক স্বয়ং খুব দর্শনবিৎ না হ'তে পারেন (অনেক সমালোচকই তেমন নয়) কিন্তু তাঁর মূল্যায়নে যে-সদসৎ জ্ঞান, সুন্দর-অসুন্দরের যে-তারতম্য নিহিত রয়েছে সে-জ্ঞান সে-তারতম্য মূলতঃ দার্শনিক চিন্তা থেকেই উদ্ভূত। বিচক্ষণ দর্শনবিৎ সাহিত্যের এলাকায় এসেছেন—কতটা সাহিত্যের তাগিদে তা' বলা মুস্কিল তবে সাহিত্যের আলোচনা উপলক্ষে তাঁদের দার্শনিক শক্তি হয়তো সহজস্ফূর্ত হ'তে পারে—এমন ঘটনা বিরল নয়। সমালোচনার ইতিহাসে আরিস্টট্ল্, টমাস্ অ্যাকোয়ায়নাস্, হেগেল, নীশে, ক্রোচে প্রভৃতির স্থান দার্শনিক সমালোচক হিসেবে। অপর পক্ষে কোল্রিজ্ ও ওয়ল্টর পেটার-এর মতো সমালোচকের দৃষ্টান্ত বিবেচনা করুন, এ'রা দুজনেই দর্শন-অনুরাগী ছিলেন, যেখানেই এ'রা সাহিত্যের কথা বলেছেন সেখানেই তাঁদের উক্তির দার্শনিক পশ্চাৎপট সুস্পষ্ট, কিন্তু তাঁরা সমালোচনায় লিপ্ত হয়েছিলেন সাহিত্যের কারয়িত্রী সৌন্দর্য অনুভব করার জন্য, কোন্ কবিতাটি ভালো, কোন্ কবি মহৎ, কোথায় কাব্যবিশেষের আবেদন এ সব শিল্পকৃতি আলোচনার জন্য। অন্য এক শ্রেণীরও সমালোচক আছেন, তাঁরা কোনো দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন নন—যদিও একেবারে দর্শনবর্জিত মানুষ সম্ভব নয়—কিন্তু সাহিত্য কর্মের তুলনায় ও মূল্যায়নে সুপটু। দৃষ্টান্তস্বরূপ হ্যাজ্লিট্ ও স্যাঁৎ বোভ্-এর উল্লেখ করতে পারি। এ'রা স্বয়ং দর্শন-সচেতন যদি না-ও হ'য়ে থাকেন, এ'দের মূল্যায়নের দার্শনিক পশ্চাৎপট রচনা করা আদৌ কঠিন নয়। কিন্তু থিওরি সম্বন্ধে চেতনা থাক বা না থাক, সাহিত্য সম্বন্ধে রুচি না থাকলে সমালোচক হওয়া অসম্ভব। দার্শনিক পশ্চাৎপটে রুচি প্রশিক্ষিত হয়, রুচিই বড়ো কথা, দর্শন গৌণ, রুচির জন্য শিক্ষার জন্যই দর্শন।

তৃতীয় সর্বস্বীকৃত চিন্তায় মানতে হয় যে সমালোচকের কাজে প্রচারপ্রবৃত্তি বর্তমান। সমালোচক নিজে ভালোমন্দ জেনে ক্ষান্ত নন, সে-জ্ঞান আরো পাঁচজনে না বিলানো অবধি তাঁর তুষ্টি নেই। অন্য সব প্রচারকের মতো সমালোচকও মস্ত একটা সামাজিক দায়িত্ববোধে উদ্দীপ্ত। আর্নল্ড বলছেন যে সমালোচক স্বয়ং শ্রেষ্ঠজ্ঞান লাভ করবেন এমন নয়, সে-জ্ঞানের প্রচার করবেন। কেন প্রচার করবেন? না, সে-প্রচারের শক্তিতেই নূতন চিন্তাধারার পথ সুগম হবে, তা'র ফলে সমাজের অতএব সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হবে। এজ্রা পাউণ্ড ভাবছেন সৎসমালোচকের কাজের ফলে আগামী জ্ঞানার্থীর উপকার হবে—এখানেও সামাজিক দায়িত্ব চরিতার্থ হচ্ছে। সমালোচনা যে প্রচার, সমালোচকের যে কর্তব্য সমাজের প্রতি, সে কথা বলেছেন সব সমালোচনাশাস্ত্রী, হয় স্পষ্টভাবে নয় তো প্রকারান্তরে।

বস্তুতঃ সমালোচকের কাজ আমার এই অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় যতটুকু নির্দেশিত হয়েছে তা'র চেয়ে অনেক বেশি জটিল। সে-কাজের বৈশিষ্ট্য কত রকমের, আর যখন যেমন বৈশিষ্ট্যের উপরে গুরুত্ব আরোপ করি তখন তেমন একপেশে সমালোচনার উদ্ভব হয়—সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনা, মনস্তাত্ত্বিক, দার্শনিক, আঙ্গিকী আলোচনা, কলাকৈবল্যবাদ, ইত্যাদি ইত্যাদি—কিন্তু শিল্পের বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতা, সুরুচি (আলঙ্কারিকদের ভাষায় সহৃদয়তা, বৈদগ্ধ্য, তন্ময়ীভবনযোগ্যতা, অথবা রিচার্ড্স্-এলিয়ট-এম্প্সনের ভাষায় 'সেন্সিবিলিটি') এবং প্রচার কামনা যাবতীয় সমালোচকেরই গ্রাহ্য।

২

সমালোচক যদি হ'ন জহুরী, স্যাঁকরার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী? যিনি স্যাঁকরা, তিনিই জহুরী, না অন্য কেউ জহুরী? যিনি রেঁধেছেন তিনিই চাখবেন, না অন্য কেউ চাখবেন? যে চা-কুলী চা পাতা ফালিয়েছে, চা-রসের মর্ম সে বুঝবে ভালো না চা-চাখিয়ের আমদানী করতে হবে? সমালোচনাকর্মে যোগ্যতা কার? স্বয়ং কবির, না সমালোচক নামধেয় অন্য জীবের? এমন বলব কি যে কবি ও সমালোচক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন; তাঁদের চরিত্র, কাজ, উদ্দেশ্য ও সার্থকতা সবই আলাদা? এ-প্রশ্ন তুলেই বর্তমান প্রবন্ধের সূত্র হয়েছে।

এ-বিষয়ে প্রধানত দু'রকমের মত প্রচলিত। শেক্‌স্‌পীয়রের বন্ধু, যশস্বী লেখক বেন্ জন্‌সন্ বলেছিলেন : To Judge of the poets is only the function of poets.— (কবিদের বিচার একমাত্র কবিদেরই কাজ।) অনুরূপ মত পোষণ করতেন কোল্‌রিজ :

The question should be fairly stated, how far a man can be an adequate, or even a good though inadequate critic of poetry, who is not a poet, at least *in posse*. Can he be an adequate, can he be a good critic, though not commensurate? But there is yet another distinction. Supposing he is not only not a poet, but is a bad poet! What then?

—(প্রশ্নটি পরিষ্কার ভেবে পেশ করা উচিত : যিনি কবি নন, নিদেন পক্ষে কবিত্বসম্ভব নন, তিনি কি সম্যক সমালোচক হ'তে পারেন, অথবা যদিও অসম্যক তবুও সৎ সমালোচক হ'তে পারেন? এছাড়া আরো তারতম্য আছে। ধরা যাক তিনি কবি তো ননই বরং মন্দ কবি। তখন কী হবে?) বোদলেয়র বিশ্বাস করতেন যে কবিরাই শ্রেষ্ঠ সমালোচক হ'তে পারেন, আর ড্রাইডেন (এককালে তাঁর নামে ও কাব্যে সঙ্গতি পাওয়া যেত কিন্তু ইদানীং যে তাঁকে কবিসত্তম ব'লে মানা হয় তাতে সমালোচনার ও রুচির নির্ভর-অযোগ্যতা খানিকটা প্রমাণ হয় বৈ কি!) সমালোচক সম্বন্ধে উক্তি করেছেন অপ্রচ্ছন্ন শ্লেষের সুরে : The critic is the artist *manque*! —(যিনি শিল্পী হ'য়ে উঠতে পারেন নি তিনিই সমালোচক!) এলিয়ট বলেছেন :

At one time I was inclined to take the extreme position that the *only* critics worth reading were the critics who practised, and practised well, the art of which they wrote.

—(এককালে আমি এমনধারা বাড়াবাড়ি মত পোষণ করতাম যে কেবল সেসব সমালোচকই পাঠযোগ্য যাঁরা স্বয়ং তাঁদের আলোচ্য শিল্পের চর্চা করতেন আর ভালোভাবেই করতেন।)

এ-বিষয়ে অনেক উক্তি সংগ্রহ ক'রে লাভ নেই। কোন্‌পক্ষে বাচনিক সমর্থন কতগুলি তা'র সংখ্যা গুণে মতানৈক্যের ফয়সালা করতে যাওয়া হাস্যকর ব্যাপার। কথাটা হচ্ছে, কে সমালোচক সে-বিষয়ে জনকয়েক নিষ্ঠাবান প্রতিষ্ঠাবান শিল্পী একই ধরণের মত পোষণ করছেন, এঁদের বিশ্বাস সৎ-কবি হ'লেই সৎ-সমালোচক হওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ (ইংরেজি সাহিত্যে) বেন্ জন্‌সন্, ড্রাইডেন্, কোল্‌রিজ্, ম্যাথিউ আর্নল্ড, এলিয়ট, এঁদের

কথা ভাবতে পারি, এঁরা প্রত্যেকেই স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠ কবি আবার প্রতিভাবান সমালোচক। বাঙলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অধিক স্থিতপ্রজ্ঞ সমালোচক এতাবৎ জন্মাননি।

অনেকে যেমন বলেছেন যে কবি যিনি তিনিই সমালোচক, অপরপক্ষে তেমনি সংশয় প্রকাশ করা হ'য়েছে কবির সমালোচনা-পটুতায়। এ-সংশয়ের অবিস্মরণীয় প্রকাশ সোক্রেটেসের উক্তিতে। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মহাতার্কিক সোক্রেটেস্ অন্যান্য বহু কথার মধ্যে কবি ও কাব্য সম্বন্ধে কিছু উক্তি করেছিলেন যার ভিত্তিতে তদীয় শিষ্য প্লেটো তাঁর কাব্যতত্ত্বের ইমারত গড়েন আর অনতিকালপরে প্লেটোর শিষ্য আরিস্‌টট্‌ল্ অন্য ইমারত গড়েন বিপরীত চিন্তার ভিত্তিতে, আর সে-কাল থেকে আজ অবধি সরাসরি অথবা পরোক্ষে সোক্রেটেসের ধারণা ইওরোপীয় যাবতীয় কাব্যতত্ত্বের পশ্চাতে দণ্ডায়মান। সোক্রেটেস্ এমন কথা মানেননি যে কাব্যরচনায় যাঁর প্রতিভা, সে-রচনার সযৌক্তিক বিশ্লেষণও তাঁর সাধ্যায়ত্ত। বরং উল্টো কথারই প্রমাণ পেয়েছিলেন নিজ অভিজ্ঞতায় আর আদালতের জবানবন্দীতে সে-অভিজ্ঞতার বর্ণনা-ই তিনি দিয়েছেন। সোক্রেটেস্ বলেছেন তিনি নানা কবিদের কাছে যেতেন, জিজ্ঞাসা করতেন তাঁদের রচিত কবিতার মানে কী? (আমি কল্পনা করতে পারি সেই যে "আবোল তাবোল"-এর বুড়ো বেচারী শ্যামাদাসকে বুঝিয়ে বলার জন্য রাস্তার মাঝে গলার চাদর ধরে টেনেছিল, সোক্রেটেসের হাতে অ্যাথেন্সের কবিকুল লাঞ্ছিত হয়েছিল তেমনি সকরুণ ভাবে!) কিন্তু হায়, কবিগণ সে-প্রশ্নের জবাব নাকি দিতে পারেননি, অতএব সোক্রেটেস্ প্রথমতঃ এ-সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে কবিরা কবিতা ব্যাখ্যায় (এমনকি স্বরচিত কবিতা-ব্যাখ্যায়ও) অপারগ, হয়তো পথচারী যে-কোনো লোক কবির চেয়ে ভালো ব্যাখ্যা তৈরি করতে পারেন। সোক্রেটেসের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত হ'ল যে কবিরা কাব্যরচনা করেন অলৌকিক প্রেরণাবলে, এক ধরণের ঐশী উন্মাদনার তাড়নায়। সেই কাব্যরচনা সম্পূর্ণ হয়, সে-প্রেরণাও অদৃশ্য হয়, কবি আর তখন অসাধারণ ব্যক্তি নন, খুবই সাধারণ মানুষ। (সোক্রেটেস্ সম্ভবতঃ বিগতপ্রেরণা কবিদের অবসাধারণ মানুষ ব'লেই গণ্য করতেন!) শিল্পী যে স্বকীয় শিল্পের ব্যাখ্যায় অপারগ, একথা প্লেটোর গ্রন্থাবলীতে কয়েক জায়গাতেই পাওয়া যায়। তাঁর "আইওন" নামক গ্রন্থে দেখা যায় আইওন নামে জনৈক র‍্যাপ্‌সোড্ অর্থাৎ এক ধরণের অভিনয়-আবৃত্তি শিল্পী, হোমর্-এর কাব্যের পরম অনুরাগী কিন্তু সে-অনুরাগের যৌক্তিক বিশ্লেষণে অপারগ। শিল্পীর এই অক্ষমতা লক্ষ্য ক'রেই তর্কবাগীশ মহোপাধ্যায় সোক্রেটেস্ প্লেটোর "রিপব্‌লিক্" গ্রন্থে গ্লৌকন্‌কে বলছেন সদয়কণ্ঠে :

We might also allow her champions who are not poets, but lovers of poetry, to publish a prose defense on her behalf.

—(আমরা হয়তো অনুমতি দেব যাতে যাঁরা স্বয়ং কবি নয় কিন্তু কাব্যপ্রেমী, কাব্যের সমর্থক, তাঁরা যেন কাব্যের সপক্ষে জবাবদিহি প্রকাশ করেন।) এখানে সোক্রেটেস্ যে-জবাব-দিহির উল্লেখ করছেন সেটা আমাদের বর্তমান আলোচনার বাহিরে যদিও মূল্যবান কথা, কিন্তু আপাতত লক্ষ্যণীয় বিষয় যে তাঁর বিশ্বাসে কবি ও কাব্যপ্রেমী, শিল্পী ও সমালোচক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন।

সোক্রেটেস্ এবং প্লেটো মনে করেন কবি সমালোচনায় অক্ষম। এমন কথা আরো অনেকেই ভেবেছেন, এখনো ভাবছেন। কোনো কোনো শক্তিশালী সমালোচকের কথা জানি— হ্যাজলিট্, স্যাঁ বোভ্, রিচার্ড্‌স্, লীভিস্—যাঁরা পুরোপুরি সমালোচক, স্বয়ং শিল্পী

নন। আবার এ-ও জানি অনেক লেখক নিজ রচনার ব্যাখ্যায় তালগোল পাকিয়ে ফেলেন অথবা নিদেনপক্ষে নিজ রচনার ব্যাখ্যাসম্ভাবনায় বিস্মিত হন। দৃষ্টান্তস্বরূপে আমেরিকান লেখক হারমান মেল্‌ভিল্‌কে নেওয়া যাক। মেল্‌ভিলের "মোবি ডিক্" নামক মহাকাহিনীতে যে প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায়ই প্রতীকী সঙ্কেত লুকিয়ে আছে একথা আজ ইস্কুলের ছেলেরাও জানে, কিন্তু মেল্‌ভিলের একটি পত্রাংশ উদ্ধৃত করছি :

Your allusion to the 'spirit spout' first showed to me that there was a subtle significance in that thing—but I did not, in that case, *mean* it. I had some vague idea while writing it, that the whole book was susceptible of an allegoric construction, and also that *parts* of it were—but the speciality of many of the particular subordinate allegories was first revealed to me after reading Mr. Hawthorne's letter which intimated the part and parcel allegoricalness of the whole.

—(আপনি যখন 'অশরীরী ফোয়ারার' উল্লেখ করলেন তখনই আমি প্রথম বুঝতে পারলাম যে ওর একটা গূঢ় অর্থ আছে, কিন্তু এমন অর্থ আমি বোঝাইনি। যখন বইখানা লিখছিলাম তখন একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে গোটা বইটিতেই রূপকার্থ আরোপ করা সম্ভব আর কোনো কোনো অংশে এমন অর্থ বাস্তবিকই নিহিত, কিন্তু মিঃ হথর্ন-এর চিঠি পড়ার পরেই আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হ'ল অনেক গৌণ রূপকের বৈশিষ্ট্য। তাঁর সে-চিঠি থেকেই আমি সম্পূর্ণ গ্রন্থের সর্বাঙ্গীণ রূপকত্ব বুঝতে পেরেছি।)

এ-চিঠিতে প্রশ্নবিৎ সোক্রাটেসের সিদ্ধান্ত খানিকটা সমর্থিত হয় বৈ কি! গ্রন্থের যা মূল বৈশিষ্ট্য সে-বিষয়ে লেখক নিজেই সচেতন নন, অন্যের কাছ থেকে সে-বৈশিষ্ট্য তাঁকে জানতে হয়! "পঞ্চভূত" গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ নানা চরিত্রের জবানিতে 'বিদায়-অভিশাপের' নানা ব্যাখ্যা দেবার পরে বলছেন : 'এই পর্যন্ত বলিতে পারি যখন কবিতাটা লিখিতে বসিয়াছিলাম তখন কোনো অর্থই মাথায় ছিল না, তোমাদের কল্যাণে এখন দেখিতেছি লেখাটা বড়ো নিরর্থক হয় নাই—অর্থ অভিধানে কুলাইয়া উঠিতেছে না। কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়।'

সোক্রাটেস্ ও প্লেটো, চিন্তার ইতিহাসে মহামানী নাম কিন্তু আমার সংশয় অনপনেয়, তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন কি কেন কবিরা নীরব ছিলেন, কেন কবিরা বলতে পারেন নি স্বরচিত কবিতাটি কী? সোক্রাটেস্ কবিদেরকে যতো নির্বোধ অথবা যতো অপটু ভেবেছিলেন সত্যই কি তাঁরা তেমন ছিলেন, অথবা, ইংরেজি ভাষায় যেমন বলা হয় The boot is on the other leg, অর্থাৎ গলতি বোধ হয় ছিদ্রান্বেষীর নিজেরই? কোনো কবিকে যদি প্রশ্ন করা হয় (ধরে' নিচ্ছি তিনি সৎ কবি), আপনি যে কবিতাটি লিখেছেন এতে আছে কী? এটি কী বস্তু? তাহ'লে সৎ কবির পক্ষে একটি মাত্র জবাবই সম্ভব : বাপু হে, কবিতাটি কোন্ বস্তু আর হবে, এটি কবিতাই, কাব্যবস্তু, এতে থাকবে আর কী, আছে কাব্য। এমন জবাব দিলে কবি নিতান্তই যথার্থ কথা বলবেন। এ কথার মানে, কবিতায় (অথবা যে কোনো শিল্প কর্মে) অনন্য সত্তা, তা'র প্রতিভূ নেই, স্থিত্ব নেই, নেই তা'র সম্যক সমান্তরাল। যদি প্রশ্ন কর, হে কবি, কোন্ কথাটি তুমি বলেছ কবিতায়? কবির জবাব হবে, আমি যে-কথাটি বলতে চেয়েছি তা' আছে কবিতাতেই, সে কথার আর

কোনো রূপ আমার চিত্তে ছিল না, ছিল যে-অনন্য রূপ তাকেই আমি প্রকাশ করেছি আমার কবিতায়। যদি সে-কথা অন্যরকমে বলা যেতে পারত, যদি কেউ 'কোটী-জীব-কল্লোলিত—দাঁড়াইয়া, এ জীবন-বারিধি-বেলায়,/মোর চক্ষে অশ্রু উথলায়!'—এ-ছত্রটির হুবহু, সমান্তরাল, হুবহু সমার্থ আরেকটি ছত্র রচনা করতে পারতেন, তাহ'লে বলা সম্ভব হ'ত না যে কবিতা অনন্য বস্তু, তাহ'লে কাব্যের শিল্পপ্রাণ হ'ত দ্বিধা অথবা বহুধাগ্রস্ত, প্রাণ তা'র থাকত না, শিল্পের সুডৌল রূপে বঞ্চিত হ'য়ে সে পরিণত হ'ত এক খণ্ডিতঅবয়ব বাক্য-সমাবেশে। একথা সত্য যে আমরা (মানে সাহিত্যের পঠনপাঠনে নিযুক্ত ব্যক্তিরা) কাব্য-বস্তুর ব্যাখ্যায় নিরত থাকি। আমরা জানতে চাই কবি কোন্ কথাটি বলতে চেয়েছেন? তাঁর জীবন-দর্শন কী, তাঁর সমাজবীক্ষণ তীক্ষ্ণ কিনা, তাঁর প্রিয় শব্দগুলির ব্যুৎপত্তি ও ভাবানুষঙ্গ কোন্ ধরণের, ইত্যাকার কূট প্রশ্নে ছাত্র অধ্যাপক ভাষ্যকার সমালোচক মশ্‌গুল থাকেন বটে কিন্তু প্রশ্নোত্তরের সেই ক্ষণে কাব্য পরিণত হয়ে যায় ব্যবচ্ছিন্ন শবদেহে।

সোক্রাটেসের প্রশ্নশঙ্কিত কবি যদি নিরুত্তর অথবা স্বল্পোত্তর থেকে থাকেন তাহ'লে তিনি সৎ কবির উচিত কাজই করেছিলেন, অন্তত এবিষয়ে প্রশ্নকর্তার চেয়ে বেশি বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন।

তবুও সোক্রাটেসের উক্তিতে মস্ত একটা স্বীকৃতি আছে, যে কাব্য ও কাব্যের আলোচনা পৃথক বস্তু, আর এই পার্থক্যের দরুণ সোক্রাটেস ভেবেছিলেন কবি ও সমালোচক বিভিন্ন ব্যক্তি, যিনি কবি তিনি নন সমালোচক, যিনি সমালোচক তিনি কবি নন।

দেখা যাচ্ছে সোক্রাটেস্ ও বেন্ জনসন্—যদি এই দুইজনকে দুই ভিন্নপন্থী চিন্তার প্রতিভূ মনে করি—উভয়েই মেনেছেন যে কবিকর্ম ও সমালোচন কর্ম আলাদা ক্ষেত্রে বিচরণ করে। তবে গ্রীক দার্শনিক যেখানে বলছেন যে কবি-নয়-এমন-সমালোচকের সমালোচনাই গ্রাহ্য, ইংরেজ কবি-সমালোচক সে-প্রশ্নের উত্তরে নির্দ্বিধ ভাষায় বলছেন যে কবি-সমালোচকই একমাত্র সমালোচক।

তা হ'লে মানব কাকে? দুই পন্থার ভিন্নতা কি আপাত-ভিন্নতা, না দূরপনেয়?

৩

সমালোচকের কাজ পরগাছার কাজ। তার নিজ মূল নেই, অপরে যে-কাব্য রচনা করেছে, যে-শিল্পের রূপ দিয়েছে, তা' থেকেই সমালোচক স্বীয় কর্মের প্রাণরস আহরণ করেন। যদি সংসারে শিল্প না থাকত, তাহ'লে শিল্প-সমালোচক থাকতেন না। শিল্পের জগতে শিল্পী প্রথম, সমালোচক দ্বিতীয়—এ-ব্যবধান অলঙ্ঘ্য, তা' সে-শিল্পী যদি দুর্বল কারুকর্মা হ'য়েও থাকেন। এ-ব্যবধান ব্যক্তির নয়, গুণকর্মের ব্যবধান। সোক্রাটেস্ অথবা মোদলেয়র যে যে-পক্ষের কথাই বলুন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখতে পাই যে সৎ কবি সৎ সমালোচক হ'তে পারেন আবার না-ও হ'তে পারেন। স্পেন্‌সার, ডান, মিল্‌টন্ সমালোচনায় লিপ্ত হননি, আর্নল্ড, সাইনবর্ন, এলিয়ট হয়েছেন। তার মানে কবি সত্তায় ও সমালোচক সত্তায় কোনো আবশ্যিক বিরোধ নেই অথবা আবশ্যিক সাযুজ্যও নেই, কোনো ক্ষেত্রে একই ব্যক্তিতে কবির গুণকর্ম ও সমালোচকের গুণকর্ম সমাবেশিত হয়েছে, অন্যান্য ক্ষেত্রে তেমনটি হয়নি। যে ক্ষেত্রে সমাবেশিত হয়েছে—যেমন এলিয়টে—সেখানে বলব যে সাহিত্যিক এলিয়ট কখনো কখনো সৃষ্টিশীল, তখন তিনি কবি, কখনো বা মূল্যায়নশীল,

তখন তিনি সমালোচক, কিন্তু যে-মুহূর্তে তিনি কবি সে-মুহূর্তে তিনি আর সমালোচক নন, আবার মূল্যায়নকালে তিনি কবি নন।

যত সুস্পষ্ট ভাষায় আমি এ-ব্যবধান বর্ণনা করলাম, বস্তুতঃ কবি-সমালোচকের চরিত্রে ততটা সুস্পষ্টতা নেই। একদা জগতে সমালোচকের সংখ্যা ছিল কম, অন্তত বাক্যপরায়ণ সমালোচকের। (নীরব সমালোচক হয়তো, এক হিসেবে, প্রত্যেকেই ছিলেন, যেমন কার্লাইলের মতে প্রায় সব কর্মীই নীরব কবি!) তখনকার দিনে তারিফ যত হ'ত, ছিদ্রান্বেষণ কম হ'ত সে-তুলনায়। সমালোচনার সঙ্গে তখন সৃষ্টিকর্মের সম্পর্ক খুবই মৃদু ছিল, কবিগণ রাজারাজড়ার সভায় অথবা মুরুব্বির বৈঠকখানায় রচনা আবৃত্তি করতেন, স্তুতি প্রশস্তির রেওয়াজ ছিল সর্বত্র, খুঁতখুঁতে মন্তব্যের ভয় ছিল না, সুতরাং কবি লিখেই যেতেন কল্পনার আবেগে, সমালোচনার প্রতিফলনে নিজ কবিকর্ম যাচাই করার প্রয়োজন ছিল না। আধুনিক আত্মজিজ্ঞাসায় সে কালের কবিকর্ম কণ্টকিত হয়নি। কিন্তু একালে, অর্থাৎ রেনেসাঁস-পরবর্তী কালে মানুষের আত্মচেতনা বেড়ে ওঠার ফলে শিল্পীমাত্রেই শিল্পকর্ম বিষয়ে অতীব সচেতন হয়েছেন। আর আধুনিক আত্মচেতনা আসলে ব্যবচ্ছেদ-পরায়ণ, বিশ্লেষণাত্মক। অতএব একালের কবিগণ, এমনকি যাঁরা প্রধানতঃ অরোধ্য ভাবাবেগে লেখেন তাঁরাও, নিজ শিল্পসম্বন্ধে নিয়ত বিচারশীল, নিজ অন্তরের দিকে তাঁরা নিয়ত বিশ্লেষণের আলোকসম্পাত করেন।

এই তীব্র আত্মচেতনার এক চমৎকার দৃষ্টান্ত মেলে রবীন্দ্রনাথে। "রবীন্দ্ররচনাবলী"র চতুর্থ খণ্ডে কবির লেখা খানিকটা আত্মপরিচয় দেওয়া আছে। কবি বলছেন : 'আমার সুদীর্ঘকালের কবিতা লেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি, তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই,—এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না।' এই পশ্চাৎ দৃষ্টির ফলে কবি বুঝেছেন যে তাঁর খণ্ড কবিতাগুলি একটা সোপানপরম্পরার অঙ্গ, তা'রা নিজের মধ্যে নিজে সম্পূর্ণ বটে, মুহূর্তের মাধুরীতে ভরাট, আবার তা'রা এক বৃহৎ মহৎ ভূমার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। নিজ সাহিত্যিক অভিব্যক্তির যে-মূল ছন্দটি রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন তা'র অধিকতর সুষ্ঠু ব্যাখ্যা কোনো ভবিষ্যৎ সমালোচক করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। যাঁর কাব্যরচনা স্বচ্ছন্দগতি, উপলব্যথিত কোনো শৈল্পিক আত্মসংশয়ের আভাস যাঁর অনায়াস কাব্যে অনুপস্থিত, তিনি আবার গভীরতম মূল্যায়নের শ্রেষ্ঠ অধিকারী। এমন বলতে পারিনা যে প্রাচীন কালের সাহিত্যিকদের আত্মোপলব্ধি ছিল না কিন্তু কালিদাস-দান্তে-শেক্‌স্‌পীয়রে আধুনিক লেখকের সূচাগ্র নিয়তশাণিত আত্ম-বিশ্লেষণের প্রমাণ পাই না। পক্ষান্তরে, আধুনিক লেখক নিজেই নিজের চূড়ান্ত সমালোচক হ'য়ে পড়েন, যেমন বার্ণার্ড শ', আঁদ্রে জিদ্‌।

কিন্তু আমি আরো গভীরতর অর্থে কবি ও সমালোচকের সম্পর্ক দেখতে পাই, যে-অর্থে লাটিন কবি হোরেস্‌ বলেছিলেন, 'যে-কবি শিল্পসম্বন্ধে বিবেকবান, তিনি সততার সঙ্গে আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হবেন।' ইদানীং সর্বত্র যে সাহিত্যিকের integrity-র কথা, সততার কথা উল্লিখিত, সে-সততা আত্মবিচারের, শিল্পসাধনার সততা। সেকালে শিল্প সাধনায় বহির্জগৎ বা অন্তর্জগৎ থেকে তেমন কোনো বাধা পেতেন না কবি, সুতরাং তাঁর কাব্যজীবনে ও ব্যবহারিক জীবনে অন্ততঃ মোটামুটি সঙ্গতি থাকত, তাঁর শিল্পবিচার সৎ হ'তে পারত, কিন্তু এ-যুগের সভ্যতার সংকটে শিল্পীর আত্মবিচার অসংখ্য প্রশ্ন-বিদীর্ণ। নিরন্তর আত্মবিচার ছাড়া আজ কোনো কবিকর্মই সমাপ্ত হয় না। এমন বিশ্বাস

করা সম্ভব নয় যে স্বর্গ থেকে যেমন সাতনরী মালাগাছি নেমে আসত ব'লে রূপকথায় শোনা গেছে তেমন ধারা কোনো মহৎ কবিতা একেবারে সর্বাঙ্গীণ অনবদ্যতা নিয়ে অকস্মাৎ শিল্পীচিত্তে মানসরূপ গ্রহণ করে ও তার পরে কথায় বা রংয়ে বা সুরে শিল্পরূপ ধারণ করে। A sonnet is a moment's monument—(মুহূর্তের মনুমেণ্ট একটি সনেট।) মনুমেণ্ট হ'তে পারে (অনেক সনেটই সার্থকতার তুঙ্গ শিখরাসীন) কিন্তু মুহূর্তের নয় কেননা হোক না সনেটের অবয়ব সংকীর্ণ, তবুও তার শিল্পকৃতি আকস্মিক নয়, এক মুহূর্তে তা' গড়ে' ওঠেনি, পরন্তু হয়তো অগণিত মুহূর্তের এমন কি অগণিত বৎসরের তিল তিল বেদনার ও ভাবনার আশ্চর্য নির্যাস সে-সনেটটি, দীর্ঘকালের কামনা ও প্রয়াস হয়তো উদ্‌ভাসিত হয়েছে একটি সংহতক্ষণ ভাবনায়। পাঠক দেখছেন স্বল্পাবয়ব স্বল্পবাক্‌ একটি কবিতা। পাঠক অনুমান করলেন এহেন ক্ষুদ্র কবিতা হয়তো সহসা উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু যেমন মানবশিশু অকস্মাৎ জন্মগ্রহণ করে না, জননীর জঠরে মাসের পর মাস অঙ্গসৌষ্ঠব ও প্রাণ অর্জন করে, যেমন বৃক্ষপ্রাণ দীর্ঘকাল নিহিত থাকে ভূমিতলে বীজগর্ভে, তেমনি শিল্প-ভাবনা তা'র চরম রূপ গ্রহণের পূর্বে কিছুকাল (কতকাল, তা'র কোনো নিশ্চিত সীমানা নেই) শিল্পীচিত্তে ভেসে বেড়ায় নীহারিকাপুঞ্জের মতো। কিন্তু বেড়ে-উঠতে-থাকা মানব-প্রাণ বা বৃক্ষপ্রাণ বেড়ে চলতেই থাকে, তিলেকের জন্যও তার ক্ষান্তি নেই, তিলেকক্ষান্তিতেও তা'র মৃত্যু, পক্ষান্তরে বেড়ে-উঠতে-থাকা শিল্প শিল্পীর ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুসারে ক্ষান্ত হ'তে পারে। কবি যখন কবিতা-রচনায় নিযুক্ত, তাঁর যে-অবস্থায় 'ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ', যখন চিন্তা ও অনুভূতির নীহারিকাকে অন্তর থেকে নিষ্কাশিত ক'রে ভাষায় রূপায়িত করার চেষ্টায় তিনি একাগ্রচিত্ত, সেই উন্মথিত কালে বারংবার সৃজনচক্র থেমে যেতে পারে, কবি তাঁর সৃষ্টিকার্য থামিয়ে দর্শক-সমালোচকে পরিণত হ'তে পারেন, আপনার বিচারবুদ্ধিতে ও মূল্যায়নশক্তিতে শিল্পকর্মটিকে (সেই মুহূর্ত অবধি যতটুকু সৃষ্টি হ'য়েছে) যাচাই ও পরিমার্জনা ক'রে নিয়ে আবার অগ্রসর হ'তে পারেন সৃষ্টিকার্যে। বস্তুতঃ সমগ্র সৃজনকর্মটি যেন দুই প্রক্রিয়ার টানাপোড়েন। গতি ও ক্ষান্তি, রচনা ও সম্মার্জনা, আবেগ ও বিচার, সৃষ্টি ও মূল্যায়ন—এই দুই বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাযুজ্যে এক আশ্চর্য ছন্দে সমগ্র সৃষ্টিকাল লীলায়িত হ'য়ে থাকে। যিনি গাইয়ে তিনি সুর ভাঁজেন অনেকক্ষণ, একই কলিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কত ভাবে না গুণগুণ করেন যতক্ষণ অবধি না তাঁর শিল্পাদর্শের সঙ্গত রূপ ধরা পড়েছে তাঁর কণ্ঠে। তিনি সৃজনরত একমুহূর্তে, পরমুহূর্তেই সৃষ্টি থামিয়ে মূল্যায়নে, বিচারে প্রবৃত্ত; বিচার থেকেই সরাসরি আবার পরক্ষণেই তিনি চ'লে যান সৃষ্টিতে। ছবি-আঁকিয়ে কতবার আঁকা থামিয়ে চিত্রপট থেকে দূরে দাঁড়িয়ে দেখেন—সে-দৃষ্টির সময় তিনি সৃজনরত নন, তিনি মূল্যায়নকারী, সমালোচক। কবি কতবার না রচনায় ক্ষান্ত হ'য়ে অসম্পূর্ণ রচনাটির বিচার করেন! এহেন আত্মবিচারে যে সব শিল্পীই একই পরিমাণ সময়ক্ষেপণ করেন এমন নয়, কেউবা অধীর আবেগে কেউবা প্রশিক্ষিত শিল্প-শক্তিতে রচনা সমাপ্ত করেন ক্ষান্তিহীন গতিতে, কিন্তু সব শিল্পীর পক্ষেই আত্মবিচারী সমালোচনাশক্তি শিল্পসৃষ্টির অপরিহার্য অঙ্গ।

অতএব সমালোচনাশক্তি তুচ্ছ নয়, এ-শক্তি (এতক্ষণ যে-যুক্তি পেশ করেছি তার হিসেবে) সৃজনশক্তির সঙ্গে নিকট-সম্পৃক্ত। এই অর্থেই এলিয়ট বলেছেন, Every creator is also a critic—সব সৃজকই সমালোচক) আর জনৈক অধ্যাপক (ম্যাকেইল্‌) বলেছেন, The critical faculty is akin to the creative faculty

of the artist—(সমালোচন শক্তি সৃজনশক্তির সমগোত্র)।

সৃজন-সম্পৃক্ত এই যে-মূল্যায়নশক্তির বর্ণনা করলাম এ-ছাড়া অন্য অর্থেই সমালোচনার সচরাচরিক অভিধা। সে-অর্থে সমালোচনা সৃষ্টির অচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়, সৃষ্টি-কর্মের বাহিরে। এহেন অনাত্মবিচারী সমালোচনায় দু' ধরণের সাহিত্যিক প্রবৃত্ত হ'তে পারেন : (১) যিনি স্বয়ং কবিতা লেখেন আবার অন্যের লেখারও মূল্যায়ন করেন, (২) যিনি স্বয়ং সৃষ্টিধর্মী লেখক নন, শুধু অন্যের লেখার মূল্যায়নে নিবিষ্ট। সাধারণতঃ এ'দেরকেই আমরা বলি সমালোচক। সমালোচকেরা কোনো কোনো সৃজকের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন, ইয়েট্‌স্‌-এর কবিতা ও তদনুযায়ী জীবনানন্দর কবিতা স্মর্তব্য। কিন্তু আমি চিন্তার যে-স্তরে সমালোচনশক্তির আলোচনা করছি সেখানে ক্ষমতার বিকৃতি নয়, সুকৃতিই আলোচ্য। কবি বলতে যদি সৎ কবি বুঝি, কবি-নামধেয় পদ্য-লিখিয়েকে না বুঝি, তা'হলে সমালোচক বলতে সৎ সমালোচকই বুঝব, ছিদ্রান্বেষী অসূয়াপর অসংবেদী লেখককে বুঝব না। এককালে অবশ্য গ্রীক ও লাটিন শব্দের মানে দাঁড়িয়েছিল ত্রুটি নির্ণয়কারী, সে মানের রেশ এখনো বর্তমান। কিন্তু যেমন কামপ্রবৃত্তিকে আমরা রূপায়িত করেছি প্রেমে, তেমনি ছিদ্রান্বেষণ থেকে আমরা উন্নীত হয়েছি মূল্যায়নী সমালোচনায়।

এখন প্রশ্ন, উপরোক্ত দুই শ্রেণীর সমালোচকের মধ্যে কি একে অন্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট? এ-বিষয়ে কতকগুলি মতামত এ-প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন যে কবিতা লেখায় নিজস্ব অভিজ্ঞতা থাকলে সমালোচক সে-অভিজ্ঞতার উপরে আপন সমালোচনা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, অতএব তাঁর সমালোচনা অতীব গ্রাহ্য। যিনি সৃষ্টিকার্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করেননি, তিনি কী ক'রে সে-কার্য সম্বন্ধে মতামতের অধিকারী?—কিন্তু এ-যুক্তিতে মস্ত ফাঁক র'য়ে গেছে। যাবতীয় জ্ঞান, সকল অনুভূতি ও চিন্তা কি কেবল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতানির্ভর? যে-বস্তু আমার ইন্দ্রিয়ের আওতায় আসেনি, যে-জিনিষ আমি দেখিনি শুনিনি ছুইনি, যে-কাজ আমি নিজে করিনি, সে-বিষয়ে কি আমার অজ্ঞতা স্বতঃসিদ্ধ? যদি নিজস্ব অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস ব'লে মানি তাহ'লে মানতে হবে যে উপন্যাসের (তথা কাব্যের, নাটকের) একমাত্র অধিকারী সমালোচক সে-ব্যক্তি যিনি নিজে উপন্যাস লিখেছেন, অন্যেরা সবাই ফালতু। কিন্তু এ-মেনে রেহাই নেই। তর্কে'র অপ্রতিরোধ্য যুক্তিতে আরো মানতে হবে যে যিনি নয়খানা উপন্যাস লিখেছেন তাঁর চেয়ে যোগ্যতর উপন্যাস-আলোচক যিনি দশখানা লিখেছেন! উপরন্তু, এ-যুক্তি কেবল উপন্যাস-আলোচনারই অধিকারী, কাব্যের নন, নাটকের নন!

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে সোপান-পরম্পরায় অগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছি, পৌঁছচ্ছি কেননা সোপানের প্রথম ধাপটি-ই অগ্রাহ্য। এই তর্ক-প্রসঙ্গে আরেকটি প্রশ্নও ওঠে, সে-প্রশ্ন কোল্‌রিজ তুলেছিলেন। যদি ধরা যায় যে কবি-সমালোচকের দাবী অগ্রগণ্য, তা'হলে কি মানতে হবে যে প্রথম শ্রেণীর কবি হবেন প্রথম শ্রেণীর সমালোচক, দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি দ্বিতীয় শ্রেণীর সমালোচক ইত্যাদি? কোল্‌রিজ্‌ জানতে চেয়েছিলেন মন্দ কবি যদি সমালোচনার ক্ষেত্রে নামেন তা'হলে সমালোচনার কী অবস্থা হবে? ডক্টর জন্‌সন্‌ পোপ-এর চেয়ে অবশ্যই নিকৃষ্ট কবি ছিলেন, কিন্তু সে জন্যেই কি সিদ্ধান্ত করব যে সমালোচক হিসেবেও নিকৃষ্ট ছিলেন? রস্‌কিন্‌ ও এডমণ্ড গস্‌ অল্পবিস্তর কবিতা লিখতেন, অলডাস্‌ হক্‌স্‌লিও লিখেছেন, ম্লানপ্রভ এ'দের কবিতা—রস্‌কিন্‌কে তো অনায়াসেই বলা যায় মন্দ কবি—কিন্তু এ'দের কবিতার দরুন কি এ'দের সমালোচনাও নস্যাৎ করব?

জ্ঞান একান্তই প্রত্যক্ষ নির্ভর এমন ধারণা না যুক্তিসহ না প্রত্যক্ষেই টেঁকসই। অতএব সমালোচনার ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষের আত্যন্তিক মূল্য গ্রাহ্য নয়। আসলকথা, কাব্যের শিল্পের এলাকায় প্রামাণ্য মানদণ্ড কল্পনাশক্তি—যে-শক্তিকে জিনিয়স্‌, ইন্‌ভেনশন্‌, ইম্যাজিনেশন্‌, ক্রিয়েটিভ্‌ ফ্যাকাল্টি ইত্যাদি বলা হয়েছে ইংরেজি ভাষায়, বাংলায় আমরা বলছি কবিত্বশক্তি, প্রতিভা, সৃজনীশক্তি, অঘটন ঘটন পটীয়সী মায়া ইত্যাদি। সেই শিল্পপ্রাণ অসম্পৃক্ত নয় প্রত্যক্ষের সঙ্গে, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে, কিন্তু অচিরেই প্রত্যক্ষের সীমানা ছাড়িয়ে সে-শক্তি নিজের উজ্জ্বল এথিতয়ার স্থাপনা করে। একটা বিশেষ কল্পনা শক্তির অধিকারী ব'লেই কবি কবি, আরেক বিশেষ কল্পনাশক্তির অধিকারী বলেই সমালোচক সমালোচক। এমন হওয়া সম্ভব (কিন্তু আবশ্যিক নয়) যে একই আধারে দু'রকম কল্পনাশক্তিরই সমাবেশ হয়েছে (কোল্‌রিজে, এলিয়টে, রবীন্দ্রনাথে) কিন্তু একথা বলা চলেনা যে সে-সমাবেশের দরুন কবিত্বশক্তি হয়েছে মহত্তর অথবা সমালোচনাশক্তি হয়েছে বিচক্ষণতর। (বলা দরকার যে সৃজনশীল কবির পক্ষে আত্মবিচারী যে-মূল্যায়ন অমূল্য সম্পদ, যে-কথা এই অনুচ্ছেদের গোড়ায় বলেছি, তার কথা আপাতত আমাদের আলোচ্য নয়, এখন অন্য ধরণের মূল্যায়ন সম্বন্ধে চিন্তা করছি।)

যদি বলা হয় কবির বিশেষ কল্পনাশক্তি ও সমালোচকের বিশেষ কল্পনাশক্তি, এ-দু'য়ে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য, এক রকম কল্পনাশক্তিতে শিল্পসত্তা প্রাণ পায়, আরেক শক্তিতে পায় না। কবির বোধি ও সমালোচকের বোধিতে প্রভেদ নেই, প্রভেদ প্রাণসঞ্চারক্ষমতায়। সে-ক্ষমতার বর্ণনা দেবে কে? অবাঙ্‌মনসোগোচর সে-আশ্চর্য ক্ষমতায় মানুষ পরমশিল্পীর নিকটতম হয়, সমালোচক দূর থেকে কবির লোকোত্তর প্রতিভায় মুগ্ধ। মুগ্ধ হওয়ার ক্ষমতায় তাঁর কল্পনাশক্তির প্রমাণ, কিন্তু তাঁর কল্পনাশক্তি নিচু স্তরের কেননা তার জীবনীশক্তি নেই, তিনি বুঝতে পারেন গড়তে পারেন না। প্রত্যেক সৎ সাহিত্যপ্রেমীর পক্ষে সৃজক ও সমালোচকের মধ্যে তারতম্য করা দরকার। শুধু যে দুজনের রচনারূপ ভিন্ন তা' নয়, একে অপরের পরগাছা তা-ই নয়, একের ধর্মে বিচার বিশ্লেষণ যুক্তি তর্ক প্রবল অথচ অপরের ধর্মে সংশ্লেষণ আবেগ ও প্রকাশের আনন্দ, তা-ই নয়, আসলে দুজনের কল্পনাশক্তি চরম সীমানায় পৌঁছে পৃথকপন্থী। সমালোচকের কাজ মূলতঃ অবশ্যই বিশ্লেষণী কাজ। শিল্পীর চিৎপ্রবাহে উন্মথিত হ'য়ে কোনো বিমূর্ত অনুভূতি, কোনো রূপাতীত বোধি ক্রমশঃ মূর্তি পরিগ্রহ করে, যা' ছিল বহু, যা' ছিল বিক্ষিপ্ত, শিল্পসত্তায় তারই সংশ্লেষিত নিটোল রূপ, আর সেই সংহত ঐক্যের বিশ্লেষণই সমালোচকের কাজ। শিল্পসত্তাকে তিনি ভাঙেন, অখণ্ডকে বিচ্ছিন্ন ক'রে তার খণ্ডিত রূপের ভাষ্যরচনা করেন। কিন্তু কোনো সৎ সমালোচকের পক্ষেই এই খণ্ডন বিশ্লেষণ বিকিরণ পদ্ধতি শেষ কথা নয়। সে-পদ্ধতি ভাষ্যকারের, বৈয়াকরণের, কিন্তু সমালোচকের নয় কেননা সমালোচক এর পরেই পুনরায় ঐক্যের পথে এগিয়ে যান। From integration to disintegration, from disintegration to re-integration—ভেঙেছিলেন যে-অখণ্ড সত্তাকে, আবার তার অখণ্ড রূপেরই ধ্যান করেন আর তখনই সমাক বুঝতে পারেন কত মূল্যবান কবির সংশ্লেষণী শক্তি!

সৎ সমালোচকের প্রধান গুণ একটি বিশেষ ধরণের হৃদয়বত্তা, যাকে আলঙ্কারিকেরা বলেছেন সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদনা। ইওরোপের আঠারো শতকে Sensibility কথাটি চালু ছিল, এ-শতকেও খুব চলেছে, সংবেদনা কথাটি খানিকটা এ-কথারই প্রতিশব্দ কিন্তু

অধিকতর ঐশ্বর্যবান এর সম্পূর্ণ অভিধা। ভারতীয় ঐতিহ্যে 'সহৃদয়' শব্দটি যে-অর্থে সাহিত্যালোচনায় ব্যবহৃত হয়েছে, সে-অর্থেই আমিও এখানে প্রয়োগ করছি। সুরসিক, সহৃদয় অর্থাৎ সৎ-সমালোচক হওয়া মানে কেবল সহজাত শক্তির অধিকারী হওয়া নয়, যদিও সে-কথাও সত্য, কেননা হোরেস্-এর মত যদি গ্রাহ্য হয় যে কবিরা জন্মান, গড়ে' পিটে' কবি হয় না, তাহ'লে সমালোচকও জন্মান, তবে তাঁকে গড়ে' পিটে' সমালোচক হ'তেই হয়। সহজাত শক্তির সঙ্গে বৈদগ্ধ্য আবশ্যক। সহৃদয় কে? যিনি কবির সৃজনশীল চিত্তাবস্থা প্রণিধান করতে পারেন, অর্থাৎ কবিকর্মে যে-চিৎস্বভাবসম্বিৎ প্রভাববান, যে-ধ্যানী অবস্থায় কবি-ব্যাপার সম্পন্ন, সে-সম্বিৎ, সে ধ্যান সমালোচকেও বর্তে'ছে। অভিনব গুপ্ত বলেছেন যে কাব্যরসিককে অবশ্য কবিকর্মের আঁটঘাট জানতে হবে, আঙ্গিকজ্ঞান তাঁর পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজন, কিন্তু তাঁর আরো বড় গুণ থাকা দরকার—তন্ময়ীভবনযোগ্যতা। যে-গুণে কীটস্ লক্ষ্য করেছিলেন কবিচরিত্রে : The poetical character...is a thing *per se* and stands alone, it is not itself—it has no self—It is everything and nothing. (কবিচরিত্র অনন্য, তা'র তুলনা সে নিজে, তা'র নিজস্বতা নেই, স্বতন্ত্র-সত্তা নেই, সে সব কিছু আবার কিছু নয়ও), সে-গুণে সমালোচকেরও বৈশিষ্ট্য। সহৃদয় সমালোচক প্রতি কাব্যের চিৎস্বভাবসম্বিতের সঙ্গে আপনাকে পুরোপুরি মিলিয়ে মিশিয়ে দিতে পারেন, সে-মুহূর্তে তাঁর ব্যবহারিক সত্তার লয়। এই আশ্চর্য সংবেদনা না থাকলে সমালোচক হওয়া যায় না, আর এই অর্থে প্রত্যেক কাব্যানুভূতির কালে সমালোচকের আপন সম্বিতে সৃজকের সম্বিৎ পুনর্ভব হ'য়ে যায়, তখন সমালোচক ও কবি একাত্ম, সে-মুহূর্তে সমালোচকও কবি। সৎ সমালোচকের চরিত্রে (আমি ব্যবহারিক চরিত্রের কথা বলছি না) ঔদার্য চমৎকার, তাঁর সংস্কৃতিবান তন্ময়ীভবনযোগ্য চিত্তে কত শত কাব্যের বেদনা অনুরণিত হয়, কত পরম্পরবিচ্ছিন্ন কত পরস্পরবিরোধী অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি তাঁর সর্বগ্রাহী প্রশস্ত রুচিতে অনুমোদিত হয়! বিভিন্ন কবির বিভিন্ন কাব্যকে পুনর্ভব করার অসাধারণ শক্তির মালিক সমালোচক।

পূর্বে বলেছি সমালোচকের কাজ পরগাছার কাজ। সে-কথা সত্য কেননা কবিকর্মেই সমালোচনকর্মের উপলক্ষ, তাছাড়া কবির জগতেই তিনি তন্ময়ীভূত হন। কিন্তু সমালোচকেরও নিজস্ব সৃজনক্ষেত্র আছে। সৎ সমালোচকের প্রশস্ত ও প্রশিক্ষিত সংবেদনায় কাব্যবস্তু নিত্যনব রূপে পরিগ্রহণ করে। তিনি যখন কবিতা পাঠ করেন, সে-পাঠ কেবল খণাত্মক থাকে না, যতটুকু তিনি পেয়েছেন কবিতা থেকে সেটুকুকে আপনার মনে মাধুরী মিশায়ে বাড়িয়ে তোলেন। বহিরঙ্গে কবির কবিতা এক স্থগিতগতি রূপ, কিন্তু সহৃদয় সমালোচকের মনোমুকুরে সে-কবিতা দিনের পরে দিন নূতন রূপে উদ্ভাসিত হয়। যেখানে কবি দিয়েছিলেন একটিমাত্র কবিতা, সমালোচক সেখানে আবিষ্কার করেন নিত্য নবোন্মেষ-শালিনী infinite variety, ক্লিওপাট্রার অমলিন অসংখ্য রূপ। নিজের পরাশ্রিত সীমিতসাধ্য ক্ষেত্রে সমালোচকও কবি।

কনখল

মনীশ ঘটক

কিছুতেই পেছপাও হবার মতো ধাত নয় কনখলের। সাহেবঘেঁষা চটি-পরা মা যে হঠাৎ কি করে ঘোমটাবতী কুলবতী হয়ে গেলেন, দেখে তাক লাগলেও হতভম্ব হয় না কনখল। দুর্ধর্ষ সাহেব বাবা হঠাৎ খালি গায়ে খালি পায়ে ধুতির কোঁচড় কোমরে বেঁধে ছাতা মাথায় এ বাড়ী ও বাড়ী করে বেড়াচ্ছেন, এবং দিনের মধ্যে গাঁয়ের সব কটা বাড়ীতে মুড়কী, নাড়ু, নারকোলের ফোঁপরা, অন্তত পঁচিশবার খাবার পরও বেলা চারটেয় তাঁর শিবুদাদার বাড়ীতে আড় মাছের ভাজা সুক্ত, বিরাট বোয়ালের পেটি সমাকীর্ণ দগদগে লাল মরীচ পোড়া ঝোল, কইমাছের সর্ষেবাটা পাতুরী এবং কচি বেগুনের নৈবেদ্যার্পিত টার্টাকিন খরশোলার পান্‌সে ব্যঞ্জন সমানে খেয়ে যাচ্ছেন। তার পরও রাত আটটা বাজতে না বাজতে একবার বাড়ীতে এসে হাঁক দিয়ে যাচ্ছেন, খাওয়াটা সুবিধের হোলো না মেজরো। ক্ষীর চিঁড়ে কলা থাকে ত তৈরী রেখো। বড়বাড়ীতে ঝুমুর গান আছে। শেষ হলে আমি আর শিবুদা এসে খাব। বলেই ঘরের হাফ প্ল্যাডস্টোন ব্যাগ থেকে অত্যাশ্চর্য টর্চ লাইট হাতে আবার খালি পায়েই বেরিয়ে যাচ্ছেন। রহমৎ বলে, সাহেব দেখছি দারুণ গাইয়া।

ওই টর্চ লাইটটার রহস্য আজো ভেদ করতে পারেনি কনখল। একটা চক্‌চকে চোঙা—গায়ে বোতাম। টিপ্‌লেই ছুঁচের মতো আলো বেরিয়ে বাড়তে বাড়তে দশ বারো হাত আগে জায়গা ঘোর অন্ধকারেও আলো করে দেয়। এই যন্ত্রটা শিলেটে ফায়ার মেরিন ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সাহেব দিয়ে গিয়েছিলো। বলেছিলো, হালে বেরিয়েছে। আর কত কি বেরুবে। দেখো, আমরা ইউরোপীয়ানরা জড় প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করব। এখুনি কি হয়েছে। তোমরা ভারতীয়েরা দৈবে বিশ্বাস করো, আমরা করি বাহু ও মনোবলে।

কনখল ও সব কথা কানে তুলেছে, আর এক কান দিয়ে বার করে দিয়েছে। কিন্তু রাস্তা মেরামতের ঐ যে জানোয়ারের মতো ইঞ্জিনটা, ঐটে ওকে বুঝতে শিখিয়েছে, মানুষ একদিন প্রকৃতিকে জয় করবে। একদিন মানুষ জলে স্থলে পাতালে সমানে দাপট চালাবে। কনখলের "ঠাকুরমার ঝুলির" রূপকথা একদিন সাহেবদের বাহু ও মনোবলে রূপায়িত হবে। কনখল বিস্ফারিত চোখে দিগন্তে তাকায়, এ রহস্য কবে ভেদ হবে, কবে ভেদ হবে। শেষ পর্যন্ত সাহেবরা কি চাঁদের মা বুড়ীর কাছেও গিয়ে পৌঁছবে?

কিন্তু কনখল ছেলেমানুষ। তার মন চায় দিগন্ত ছোঁওয়া মাঠের আনাচে কানাচে উঁকি দিতে। দু' চারটে বাবলার ঝাড়, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হালে উঠে আসা গ্রাম পত্তনের কয়েকটি কুঁড়ে ঘর, প্রান্তরা যমুনার পক্ষপাতী ভাঙন, আর উদয়াস্ত খোলা মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত মার্ত্তণ্ড তাণ্ডব।

যমুনা এ পার ভাঙছে, তো ও পার গড়ছে। ধ্বস্ নামছে যে পারে, অপর পারে জমি জেগে উঠছে। এ যেন জোর যার, মুল্লুক তার। এক লহমায় কনখল বুঝে নিয়েছে, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। পড়েছে কথাটা কোনো কেতাবে, মানে কেউ বুঝিয়ে দেয়নি, কিন্তু

আভাসে আঁচ করে নিয়েছে সদর্থটা।

ওর অপরিণত মানসে এ সব তত্ত্বকথা বেশীক্ষণ আসন গাড়ে না। তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। বলে, রহমৎ, চলো শিকার করে আসি বড় নদীতে। কাল ভোর রাতে। আমি চাইলে বন্দুক হাতছাড়া করবেন না মা বাবা, তুমি চাইলে নিশ্চয় দেবেন। বেরোতে হবে রাত দুটোয়।

নিভাননীকে রাজী করাতে বেগ পেতে হয় না রহমতের। তিনি ভাবেন, ছেলেটা অনভ্যস্ত পরিবেশে এসে কাহিল হয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন, যাক্ না, একটা খেলাধুলোর মতো শিকারে। হৃষীকেশকে আদৌ কিছু বলেন না। বারো আর ষোলো দুটো বোরের বন্দুক আন্দাজ মতো কার্তুজ দিয়ে রহমতের শ্রাতে দিয়ে দেন আগরাত্তিরেই। শুধু বলেন, কনার কোনো অমঙ্গল না হয় দেখো রহমৎ।

নিভাননী মনে মনে আঁচেন, হৃষীকেশ গ্রামে এসে মেতে আছেন বাল্যসাথী আত্মীয়-স্বজন গ্রামীনদের নিয়ে। তাঁকে কিছু এখন বলতে যাওয়া তাঁর বহুদিন পিছে ফেলে আসা দিনগুলোর ওপর বৈধম্য আনা। বুদ্ধিমতী নিভাননী। থাক না সাহেব তাঁর অতীতের মাধুর্যে ছুটির কটা দিন আত্মবিস্মৃত হয়ে। হালের হাকিমী জীবন যেন বিস্মরণের বৈতরণীতে তলিয়ে গেছে। তিনি নিজেও ত গ্রামের সহজ সরল জীবনযাত্রার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে চাচ্ছেন। বাড়ীর ছোট বৌটি হয়ে দুই বড় জার হুকুম তামিল করে যাচ্ছেন, দু' বেলা আনাজ কাটার ধুমে স্থানীয়া ঝিয়ারীদের হার মানিয়ে দিচ্ছেন, দুপুরে ঢেঁকি পাড়েও গ্রাম্য বীরাঙ্গনাদের সাথে সমান পদক্ষেপে চলেছেন। সেদিন সায়া বাদ দিয়ে কস্তাপেড়ে লাল সাড়ী পরে বাড়ীর পাশের পুকুরে ডুব দিয়ে গৃহদেবতা শালগ্রামের মাথায় জল দিচ্ছেন, সজ নৈবেদ্য টাটে সাজিয়ে দিচ্ছেন। কেউ কি কিছু দোষ ধরতে পেরেছে? তবে হেঁসেলে ঢুকতে দেন না মেজ জা, বলেন, চাকরীর জায়গায় অখাদ্য কুখাদ্য খেয়েছিস, যদি খেতে এসে গাঁয়ের পাজীগুলো একটা বেফাঁস কথা বলে, মাথা কাটা যাবে। থাক না নিভা, তুই জোগাড় দে, রান্না আমিই তুলে নিতে পারব। বড়জার হবিষ্যি ঘর, সেখানে ঢোকার কথাই ওঠে না, তবে দাওয়ায় বসে নারকোল কোরান, সেই যে ময়ূরের ঝুঁটি লাগানো বঁটিতে ঘসে ঘসে। ঝুরঝুরে নারকোল গুঁড়িতে বারকোষ ভরে ওঠে, হবিষ্যির চৌকাঠে ঠেলে দিয়ে বলেন,—বড়দি, আর কিছু? বড়দি বলেন, ডালফেলা তরকারীর ডাঁটা লাউগুলো ডুমো ডুমো করে কেটে দে ত নিভা। বড়ো মটরের এই ব্যঞ্জনটা ঠাকুরপো ভালোবাসে। নিভার মনই কনখলে সংক্রামিত হয়েছে। সব অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নেবার আশীর্বাদ তাঁর জীবনদেবতা দিয়ে রেখেছেন। খুশী মনে দাসীবৃত্তি করে যাচ্ছেন দুই বড় জায়ের। মন ভরে উঠছে, বুঝে উঠতে না পারলেও পরিপূর্ণ হয়ে উঠছেন তৃপ্তিতে।

রাত দুটোয় দুই অ-সমবয়সী শিকারী সাথী, রহমৎ ও কনখল, বড়ো ছোটো দুই বন্দুক ঘাড়ে ফেলে, বড় নদীর পথ ধরে। অত রাতে জোলা দিয়ে নৌকা বা ডিঙি বেরোয় না, হেঁটেই পাড়ি দেয় চার মাইল রাস্তা। যমুনার পারে পৌঁছতে তিনটে সাতিনটে হয়। শেষ রাতের কুয়াশা ভেদ করে ভোরের রোশনাই ধীরে ধীরে জাগছে। জলজমিনের কুয়াশা ঘন, ওপরের দিক পরিষ্কার হয়ে আসছে। একফালি ছোটো স্রোতস্বতী, ইছামতী, মিশেছে এসে বাঘিনী যমুনার সাথে, ওরা পৌঁছোয় সেইখানটায়। যমুনার পার পাহাড় সমান উঁচু, নীচে খরস্রোতা ঘূর্ণাবর্তসঙ্কুল সর্বনাশা বাঁচিবিভঙ্গ,—জল ঘোর

নীল। ইছামতীর জল ইলিশ মাছের মতো সাদা। যেখানটায় ডাকিনী যমুনার কোলে আছড়ে পড়েছে সেখানটায় নীল সাদা দুটি রং-এর বিভেদ পরিস্ফুট।

হঠাৎ কুয়াশা কেটে গিয়ে রোদ উঠে যায়। কনখল নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে এই কি নদী? এপারে পৌঁছে গেছে, কিন্তু অপর পার? দিগন্তে মিশে গেছে অনন্ত জলরাশি, ও পার দেখাই যায় না। অজানা ভয়ে গুরগুর করে ওঠে কনখলের বুক। বলে, রহমৎ, এ নদী, না সমুদ্র? রহমৎ বলে, শুনেছি এটা বাইশজুড়ির মোহনা। নদী এখানে বাইশ মাইল চওড়া। ভরা বর্ষার জল এখনও নদীতে থেকে গেছে, মাঝখানের চর-টর সব জলের তলায়। ভয়ানক নদী এ কনাবাবা। হোই দেখ পদ্মার গেরুয়া জল, আর এখানকার জল কি নীল। আরে, এ ছোট নদীটা রুপোর মত চকচকে, কিন্তু ধার কি!

—দেখ দেখ রহমৎ, ওগুলো কি?

—চুপ্ চুপ্ কনাবাবা, লালিশর, ঝাঁকে বোধ হয় শ'পাঁচেক আছে। আর ওই যে ছাইয়ে সাদায় দেখ্‌ছো, হলদে ঠোঁট, ওগুলো দোমেলা। সাহেবরা পিণ্টেল বলে। এ দুটোই খুব ভালো জাতের হাঁস। শুয়ে পড়ো, মাটিতে বুক দিয়ে, আমি এক দুই তিন বলব, একসাথে ফায়ার হওয়া চাই।

সদ্য পড়ন্ত চরের জিল্‌জিলে পাতলা জলবিস্তারের ওপর, ইছামতী যমুনার সংগমে এই হাঁসের পাল, রাত্রি-বিশ্রামান্তে উড়ি উড়ি করে মৃদু মৃদু ডানার ঝাপটা দেয়। এক সঙ্গে পর পর চারটে ফায়ার আওয়াজ গর্জে ওঠে দুটো দো'নলা থেকে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী উড়ে যায়। ঘাড় কাৎ করে মরে প'ড়ে থাকে মোহানায় গুটি কুড়ি। আধমরা গুটি চার পাঁচ ওড়বার বিফল চেষ্টায় ঘোরাঘুরি করতে থাকে।

কনখলের তর সয় না। অতগুলো পাখী পড়েছে, আনতে হবে, আর ও ত পারের কাছেই। হরিণের মতো বেগে দৌড়ে ইছামতী যমুনার বাঁকে নামে, ও জায়গাটা ঢালু, খাড়া পার নয়। জলে পা দেবার সাথে সাথে আর্তনারী কণ্ঠের আর্তনাদ ওঠে,—নেমো না, নেমো না, প্রাণে মরবে—

কিন্তু কনখল এ সাবধানবাণীর মানেও বোঝে না। হাতের কাছে এতগুলো শিকারের পাখী, নামবে না ত আনবে কি করে? ও ঝাঁপ দিয়ে পড়ে থার্মোমিটর ভাঙা পারার মতো তিন আঙুল জলের নীচের বালিতে। হায় হায় করে ওঠে নারীকণ্ঠ। রহমতের কোনো পাত্তা নেই। বুড়োমানুষ, ধীরে সুস্থে এগোয় হয় ত। কিন্তু কনখল ছোট হলেও নারীকণ্ঠের সাবধানবাণীর মানে বোঝে এইবার। এক পা, যেটা আগে পড়েছিল, দেবে গিয়েছে হাঁটু পর্যন্ত। আর এক পা বালিতে দিতে সেটাও দেবে যায়। পার হাত তিনেক দূরে। তারপর যতো চেষ্টা করে ততোই দু'পা পাতাল প্রবেশ করতে থাকে ধীর কদমে, পাঁচ মিনিটে আধ ইঞ্চি রেটে। ওর অজ্ঞাত মানসে ঝলকে ওঠে একটি কথা,—চোরাবালি? তবে, তবে, উপায়?

তীব্র আদেশ আসে পার থেকে—বন্দুক ছুঁড়ে দাও খোকা পারে, ওর ওজনে আরো তাড়াতাড়ি পুঁতে যাবে। এই বুড়ো, একটা বাঁশ-টাশ দেখ্‌না শিগগির, খোকা ত গেল, হতভাগা বুজ্‌রুক কোথাকার—

রহমৎ বন্দুক ফেলে বাঁশের সন্ধানে যায়। ইচ্ছে মতো সহজপ্রাপ্য নয় গ্রামদেশে কোনো জিনিষই। আস্‌তে দেরী হয়। কোমর পর্যন্ত চোরাবালিতে ডোবে কনখল।

কনখলের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আসে, কিন্তু কাতর হয় না। ঘাবড়ায়, কিন্তু ভয় পায়

না। ভয়ের জন্ম বিপদ ঘটবার আগে, ভয় ঘাড়ে এসে পড়লে শুধু সংগ্রাম, ভয় কাটিয়ে ওঠ্‌বার তোড়জোড়। কিন্তু তবুও নিরুপায়, অসহায় মনে হয় নিজেকে। নাভীমূল পর্যন্ত কবরের তলায়, নিশ্চিত মৃত্যু তাকে টেনেই চলেছে নীচের দিকে।

হঠাৎ একটা সাড়ীর আঁচল এসে ঘাড়ে পড়ে। আবার সেই নারীকণ্ঠ—কোমরে বাঁধ দাও খোকা, শক্ত গিঁট। তারপর দুহাত ছড়িয়ে বুক আছড়ে পড়ো জলে। খাড়া হয়ে থেকো না। নির্দেশ মতো কষে কোমরে সাড়ীর আঁচল বাঁধে কনখল। তারপর—তারপর ওর আর কিছু মনে পড়ে না। যেন কত যুগ পরে চৈতন্য ফেরবার পর দেখ্‌তে পায় ওকে কোলে নিয়ে কে যেন বসে আছে পারের ওপর। সস্নেহে চোখে মুখে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, তার আঁচলের গেরো এখনও কনখলের কোমরে বাঁধা। আলুলায়িতাকেশা, উন্মুক্ত-স্তনা, অপূর্বসুন্দরী, শ্যামামূর্তি। সুস্থ সবল দুটি হাত কনখলকে কোলে টেনে রেখেছে। কোমরের গিঁট ছাড়িয়ে গায়ে কাপড় জড়ায় নারীমূর্তি, বলে, আর কোন ভয় নেই। সুস্থির হয়ে শুয়ে থাকো কিছুক্ষণ। কনখল পরম নির্ভয়ে সেই মেয়েটির বুকে মাথা রেখে চোখ বোঁজে। কী যেন ক্লান্তি, থেকে থেকে বিস্মরণ, অভিভূত করতে থাকে ওকে। কখন যে সত্যিই সত্যিই ক্লান্ত অবসাদে ঘুমিয়ে পড়ে জানেও না।

ঘুম ভাঙে প্রাণদাত্রীর তর্জনে। 'কেমন লোক তুমি বুড়ো মিঞা, একটা বাঁশ আনতে দিন কাবার করে দিলে? খোকাকে ত আমি তুলেছি, এখন বাঁশ দিয়ে আঁকশি বানিয়ে যে কটা পারো শিকারের পাখী তোলো। জ্যান্তগুলো অনেক দূর চলে গেছে। ডিঙি ছাড়া আনা যাবে না। তা না যাক্, ছেলে প্রাণে বেঁচেছে, নিয়ে বাড়ী যাও। কোন গাঁ তোমাদের?' রহমৎ গাঁয়ের নাম বলে। বাবার নাম বলে। মেয়েটি হাতের ও-পিঠ গালে লাগিয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকায়, বলে, চিনেছি।

হঠাৎ জেগে কনখল বলে, তোমার নাম কি? ফিক করে হেসে ফেলে শ্যামাসুন্দরী। বলে, কি নাম পছন্দ হয় খোকা? কনখল গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলে,—যমুনা হলে খুশী হই। মেয়েটি, বয়েস কুড়ি বাইশ হবে, বলে—ঠিক বলেছ—অমনি কালোই আমি। তবে, নামটা আমার এলোকেশী।

কনখল অবাক বিস্ময়ে ভাবে, কি মিল যমুনাতে আর এলোকেশীতে। কালো রং নীল চোখ, চূর্ণ-কুন্তল,—নদীতে মেয়েতে যেন দুই যমজ বোন। একটা অলৌকিক শক্তিতে ভরা যেন দুজনারই সর্বাবয়ব।

এলোকেশী বলে, বাইরে থাকো, জানো না ত এসব দেশে কতরকমের বিপদ। চরের পলিমাটিতে কেউ নামে কখনো? সব জায়গায়েই যে চোরাবালি আছে, তা নয়। কিন্তু জলটানের সময় জাগন্ত চরের বেশীর ভাগই চোরাবালি। বুঝলে বুড়ো মিঞা, ওসব জায়গায় ছোট ছেলে নিয়ে শিকার খেলতে এসো না।

রহমৎ খুঁটে খুঁটে কনখলের উদ্ধারের ইতিবৃত্তান্ত সব জেনে নেয়। কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে বুড়োর মন। আকাশের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় খোদার দোয়া প্রার্থনা করে। বলে, মা, আজ কি সর্বনাশ থেকে বাঁচালে তুমি আমাদের। মেমসাহেব যখন শুনবেন আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন কিনা আল্লা জানেন।

মেমসাহেব কে? সুধোয় এলোকেশী। ও খোকাবাবার মা? তা তাঁর যদি বুদ্ধি থাকে, তবে কিছুই দোষ নেবেন না। এ তল্লাটের নদী নালার হালচাল তোমাদের দেশের কেউ হয়ত জানেই না। এতবড় নদী ত তোমাদের দেশে নেই, থাক্‌লেও এমন ভাঙন নেই। ভাঙে

বলেই ত বালি মাটি পড়ে, ভেসে এসে, চোরাবালির সৃষ্টি করে। যাক্, খোকাকে নিয়ে বাড়ী ফেরার আগে আমার ওখানে চলো, বাড়ীর গাইয়ের দুধ আছে, দুয়ে দিচ্ছি, দুজনে দুবাটি খেয়ে নাও। ওইত নদী পারেই ঘর আমার। আমি জেলের মেয়ে কিনা, তাই ফুটিয়ে নিতে বলছি তোমাদের।

রহমৎ ফোক্‌লা দাঁতে একগাল হেসে পাকা দাড়ি চুমড়ে বলে, আজ তুমি ওর মায়ের কাজ করেছ গো মা, তোমার হাতে খেলে আমাদের অক্ষয় স্বর্গবাস হবে। তুমিই ফুটিয়ে দাও।

—চলো।

পকেট থেকে টোয়াইন সুতো বার করে পায়ের দিক গেঁথে গেঁথে পাখীর মালা বানায় রহমৎ। সেই মালা দু ফেরতা গলায় জড়িয়ে রহমৎ চলে, দুটো বন্দুকই ঘাড়ে নিয়ে। কাদামাখা হাফপ্যান্ট পরে এলোকেশীর কোলে চড়ে চলে কনখল, ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও এলোকেশী ছাড়েনি, হাঁটতে দেয়নি। এলোকেশীর সতেজ সবল আস্ফালনের কাছে কনখলের সব দ্বিধা নিষ্প্রভ হয়ে যায়। বাড়ী পেঁাছে ছবির মতো নিকোনো দাওয়ায় বসিয়ে দেয় ওদের। একখানি ঘর, আর একটি হেঁসেল। ওদেশে রাংচিতে কি জিকে গাছের চল নেই। পাতাবাহারী কচু, আর মান, আর ওল, আর দুচারটে বকফুলের গাছ দিয়ে বাড়ীর চৌহদ্দি ঘেরা। ভারী শান্তিপূর্ণ স্নিগ্ধ ভাব বাড়ীটা জুড়ে। দাওয়ায় চাটাই বিছিয়ে দিয়ে এলোকেশী দুধের খবরদারীতে যায়। কনখলের গা এইবারে সত্যিই এলিয়ে আসে। অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে কনুইয়ে মাথা রেখে। রহমৎ অনির্দেশ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে একদিকে। ঠোঁটদুটো বিড়বিড় করে যায়, বাক্য ফোটেনা। চোখের কোণা দিয়ে জল গড়ায়, বোধ হয় প্রার্থনার অনুচ্চারিত মন্ত্রের তাপে বুকের কৃতজ্ঞতার জমাট বরফ দ্রব হয়ে বেরিয়ে আসে চোখ দিয়ে।

দু জামবাটি উষ্ণ এক্‌বল্‌কা দুধ ভিজে গামছায় পেতে দুহাত প্রসারিত করে এলোকেশী এসে এ দৃশ্য দেখে। ওরও মনের মধ্যে মোচড় দেয়। শক্ত মেয়ে এলোকেশী। সামলে নিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—এই বুড়ো চাচা, চ্যাংড়ার মতো কাঁদছ কেন? খোকা যে খালি চাটাইয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ভিজে কাদা কাপড়-চোপড় পরে, হুঁস্‌পবন নেই তোমার? দেখো ত বাছার গায়ে চাকা চাকা চাটাইয়ের দাগ বসে গেছে? ডাক্‌তে হয়না আমাকে? কি রকম বে-আক্কেলে লোক গো তুমি? এই রইল দুধের বাটি। খোকাকে ওঠাও আমি পাতবার কিছু আনি। কনখল ধড়মড় করে জেগে উঠে বসে' চোখ কচলায়। ততক্ষণে এলোকেশী ঋঠে দিয়ে কাচা ফরসা থান এনে ভাঁজ করে পেতে দেয় চাটাইয়ে। নিজের উরুতে ওর মাথা রেখে বলে, না, ওঠ্। বসিয়ে দেয়। —দুধটা খেয়ে নে। একচুমুকে ঈষত্তপ্ত দুধ শেষ করে কনখল। বলে, বাড়ী যাব না?

—কি করে যাবি? ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে যে। বুড়োচাচা, তুমি শিকার আর বন্দুক নিয়ে চলে যাও। ঐ যে কি বললে মেমসাহেব, তাঁকে নিয়ে এসো। আধ ঘণ্টার পথও নয়। না না—উত্তরে না—পশ্চিম দিকের ঐ যে পুকুর—ওর পারেই গাঁয়ের ইস্কুল। ওরই পেছনেই তোমাদের গাঁ। তোমরা ত ঘুর পথে এসেছিলে, তাই দেরী হয়েছিল। যাও, বেলা এখন এক পহরও হয়নি। খোকা ঘুমোক।

নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে কনখল বলে—তাই যাও রহমৎ, আমি ঘুমোই। এলোকেশীর কোলশিয়রি হয়ে কনখল গভীর ঘুমে অচৈতন্য হয়ে যায়।

এলোকেশীর ঘড়ি নেই, তবে সত্যি বেলা তখন সাতটার বেশী হয়নি। কনখলের এলোমেলো চুলে হাত বুলোয়, আর আপন মনে বলে—শতেকখোয়ারী মা! মেমসাহেব! যমদুয়ারে ছেলে পাঠিয়ে ফেরিঙ্গিপনা হচ্ছে! এসো না একবার—দেখব কতো বড়ো মেম তুমি।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মা বাবার দল পৌঁছে যান। কনখল তখনো ঘুমে, নিভা এসে বুকে সাপ্‌টে হুমড়ী খেয়ে পড়েন ছেলের ওপর। এলোকেশী উরু সরিয়ে নেয়, মাথায় কাপড় দেয়না, তবে সাড়ীর আঁচল সামাল করে গায়ে বুকে জড়ায়। উঠে দাওয়া থেকে এক কোণায় দাঁড়ায়।

বড় বাড়ীর শিবুবাবু বলেন—কেরে—মাধব জেলের বিধবা মেয়ে এলোকেশী না? তাই বলি, এত সাহসই বা কার হবে, আর গায়ে এত জোরই বা কোন মেয়ের। রহমতের কাছে শুনে একবার যে মনে হয়নি তা নয়, তবে চোখ-কানের বিবাদ ভঞ্জন হোলো। শুনেছি রে, সব শুনেছি। আচ্ছা, আচ্ছা, ভগবান ত তোর ভালোই করবেন, আমরাও যা পারি করব।

ফিক্ করে আঁচলের আড়ালে হেসে ফেলে এলোকেশী। সঙ্গে সঙ্গে সিংহীর মতো হিংস্র হয় চোখের চাউনী। বড় বাড়ীর বড়বাবুর যা পারি তা করবার কথা এ তল্লাটে আটদশ-খানা গাঁয়ের বিধবারা জানে। জেলে, চুণে, এমনকি ভদ্দর ঘরের কচি রাঁড়িদেরও অজানা নয়। দু' দু'বার দূতী পাঠিয়ে, সন্ধ্যের অন্ধকারে নিজে এসে, সব চেষ্টাতেই ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছেন তিনি। আজকের এই অন্তরঙ্গতা আবার কি অমঙ্গল ডেকে নিয়ে আসবে ভেবে শঙ্কিতা হয়, কিন্তু দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট চেপে হেঁসেলে ঢুকে মনে মনে বলে—কোরো ঠাকুর। কেশী জেলেনিকে সবটুকু চেনোনি। নীচু ছাদের সাথে টাঙানো শিকেয় দু'দুটো মাটির পাতিলের ওপর একটা ছ'ফলা ট্যাটার আধ হাত হাতল সমেত ফলাটা দেখা যায়। দেখেই আশ্বাসে বুক ভরে ওঠে।

হঠাৎ ঝাঁপ খুলে নিভাননী এসে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদেন। কিচ্ছু বলতে পারেন না, খালি ফুলে ফুলে ওঠেন কান্নার ধমকে। এলোকেশী ভাবে, এ কেমন মেমসাহেব? সেমিজ সায়া জুতো মোজা নেই, কপাল জোড়া সিঁদুর আর আদুল গায়ে লাল কস্তাপেড়ে সাড়ী, দু'চরণে আলতা, হাতে নোয়া, শাঁখা, আটগাছা করে চুড়ি—এ কেমন মেমসাহেব? বলে, অধৈর্য হবেন না, খোকা ত ভালোই আছে। সঙ্গে সঙ্গে গরম দুধ খাইয়ে দিয়েছি। ওকেও, বুড়োচাচাকেও। তার পর খিলখিল করে হেসে ফেলে। বলে, জেলেনীর হাতে দুধ খেয়ে তোমার ছেলের জাত গেছে—

নিভাননী ওকে বুকে পিষে ফেলেন। কপালে, গালে চুমো খেয়ে বলেন, জন্ম জন্ম জাত যাক মা, ওর মায়ের পেটের বড়ো বোন ওকে নিজ হাতে দুধ খেতে দিলে যদি ওর জাত যায়ই, যাকগে সে জাত। তোর নাম ত এলোকেশী?

এলোকেশী বলে—কেশী বলে সবাই ডাকে মা।

বাড়ীর দাওয়ায় একটা সোরগোল ওঠে। দু'জনে বেরিয়ে দেখেন, কোমর পর্যন্ত কাদা লেপা এক সাঁই জোয়ান, বয়েস সাতাশ আটাশ হবে, দাঁড়িয়েছে এসে। এক হাতে গামছায় বাঁধা গুটি পাঁচেক হাঁস, আর এক হাতে হাত চল্লিশেক লম্বা বিপর্যয় এক তল্লা বাঁশের লগী। ঠোঁটের কোনো অপরাধীসুলভ বিনীত হাসি। বলে, খোকাকে কেশী যখন টেনে তুলল, তখন বলছিল, ভিঙি না হলে জ্যান্ত পাখী কটা আনা যাবে না। আমি হুই বাঁকে নাও বেঁধে ছিলাম। কেশী ত খোকাকে চ্যাংদোলা করে কোলে তুলে বাড়ীর দিকে রওনা দিল, আমিও ভিঙি খুললাম চোরাবালির ফটিকজলে। কি শয়তান ওই হাঁসগুলো কর্তা, ধরি ধরি, হুস্—

পাঁচহাত দূরে। সবকটা ত পাকড় করলাম, ওই বড়ো দোমেলাটা জন্নালিয়ে খেয়েছে। লাগালের মধ্যে আছে মনে করে যেই ঝুঁকেছি, ভিঙি কাৎ হয়ে পড়ে গেলাম গাঙে। গাঙ ত ভারী—দেখনা হাটু পর্যন্ত গেড়ে গিয়েছি। ভাগ্যিস লগিটা হাতেই ছিল—ভর দিয়ে, পারে এসে উঠলাম। এই বাঁশের দাগ দেখেন কর্তা, ত্রিশ বত্রিশ হাত চোরা—তার পর শক্ত মাটি। উঃ, এই হিমের বিয়ানেও ঘেমে নেয়ে উঠেছি কর্তা।

—শুধু ঘাম কেন, কালঘাম ছোটা উচিত ছিল তোর। গোঁয়ার-গোবিন্দ বোম্বেটে ডাকাত কোথাকার। বলে এলোকেশী ছোটে হেঁসেলে। পাটকাঠির আগুনে তপ্ত করে খানিকটা দুধ। বাটি ভরে এনে দুম করে উঠোনে বসিয়ে দেয়। বলে, বসে খা। তারপর ঘুমোগে যা। হতচ্ছাড়া, মুখপোড়া, গাধা।

নিভাননী যেন আভাসে বোঝেন সব। কেশীকে ধরে হেঁসেলে আনতে এবার কেশীর ফুলে ফুলে কাঁদার পালা। কিন্তু একটি কথাও বার করতে পারেন না নিভাননী তার মুখ থেকে। নির্বাক সান্ত্বনা দিয়ে যান তিনি।

কনখল বীরপূজারী। যেখানে এলোকেশীর আঁচল না থাকলে তার মৃত্যু সুনিশ্চিত ছিল, সেইখানে এই মানুষ একটা লগি নিয়ে ঠেস দিয়ে উঠে আসতে পেরেছে। উঠে এসে লগিটা দু'হাতে তুলতে যায় কনখল। দু আঙুল উঠে আবার পড়ে যায় বাঁশটা উঠোনে। লোকটা হেসে বলে—ভয়ানক ভারী খোকাবাবু, তোমার কর্ম না।

—যখন ভর দিলে, হাতে খুব লাগছিল তোমার?

—কাঁধ কাঁজ বিষ হয়ে আছে বেদনায়। পার থেকে আর দুহাত দূরে থাকলে বাঁচার আশাই ছিল না।

শিবুবাবু হৃষীকেশকে বলেন, এর নাম মনোহর হলদার। এরও সাতকুলে কেউ নেই, বাড়ীও নাই, ঘরও নাই। নৌকা একখান আছে, শোয়া, বসা, রুজি-রোজগার সব তাতেই। কিন্তু ভারী সৎ, আর—হেসে ফেলেন বড়বাবু—ভারী বোকা। দেখলে ত কেশী জেলেনী যা তা বলে গেল—আর ও কেমন ভ্যাকা ভ্যাকা মুখে তাকিয়ে থাকল?

হৃষীকেশ বলেন,—আমি ও দু'জনের কথাবার্তায় একটা রহস্যের—না না, রহস্য সমাধানের ইঙ্গিত পেয়েছি দাদা। তবে দেখুন, বেলা বাড়ছে এবার বাড়ী ফেরা যাক। এ হাঁসকটা এরাই রাখুক। কনা মাকে ডাক ত।

এলোকেশীর কপোল চুম্বন করে নিভাননী ঘোমটা টেনে বেরোন। কনখলকে বুকে নিয়ে চুমো খায় এলোকেশী। দুচোখে জল। রহমৎ অনেক নীচু হয়ে আদাব দেয়।

দলটা একটু এগিয়ে গেলে, ফিরে এসে নিভা কেশীকে বলেন,—মনোহরকে খাইয়ে-দাইয়ে নৌকায় ঘুমোতে পাঠিয়ে আসিস আমাদের বাড়ীতে বিকেলে। গল্প করব। এলোকেশী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়, কিন্তু কান আর গাল বেগুনী হয়ে ওঠে।

১৯

—ন' বছর বয়সে বিধবা হয়েছি মা। আমার বাবার নাম ছিল সাধু, তার সাথে মনহরার বাবার বড়ো কাজিয়া ছিল, যেদিন মনার বাবা আমাকে বৌ করে নেবে বলে প্রস্তাব নিয়ে এলো, আমার বাবা তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন। মনাও মনের দুঃখে দেশছাড়া হোলো। গোয়ালন্দে গিয়ে সাদেকের ইলিশের নৌকায় তাঁবেদার হোলো। ওর বাবা

মরলো দেশে। ও খবর ও পেলোনা। কুঁড়ে একটা ছিলো, পাঁচ জ্ঞাতিতে ভাগাভাগি করে নিল। মনোহর দেশে ফিরে বাড়ী পেলনা। সেও আমার বিয়ের পর বিধবা হওয়ারও চার বছর পরে। আমি তখন তের, মনা আঠারো। আমার বাবা তখনো বেঁচে। বাবা হুঁকোয় টান দিয়ে কাশতে কাশতে বলতেন,—দেখলি কেশী, ওই বাউণ্ডুলেটার হাতে তোকে তুলে দিলে কি তোর দশা হোত! বাড়ী নেই, ঘর নেই, সাদেকের চাকরী নেই, থাকার মধ্যে একটা জেলেডিঙ্গি। হতচ্ছাড়া হাড় হাভাতে!

—আমি মা, কথার পিঠে কথা বলতাম না। বাবা শুধু জেলেই ছিল না, ডাকসাইটে ডাকাতও ছিল। পুজোয় পালে পার্বণে গেরস্ত নৌকো লুটে করে গওনা টাকা আনত, আর মাটিতে পুঁতে ফেলত। কিন্তু সেই বাবাও মরল আমার ষোল বছর বয়সে। মনোহরের খোঁজ আমিই করেছিলাম, কিন্তু পাত্তা পেলাম না। লোকমুখে শুনলাম আশুগঞ্জ না ভৈরব, কোন বন্দরে চলে গেছে। সে নাকি মেঘনা নদীর ওপর, সমুদ্র সেখানে কাছে, জল সেখানে গহীন।

—মাগো, তারপর কী দুঃস্বপ্নে দিন কেটেছে আমার। চরের মধ্যে ওস্তী আছে জানো ত, ঐ বড়বাবুদের চরের জমিতেও আছে। ফাঁপা জল টান দিলে বড়ই কাঁটা ফেলে চরের গর্ত ঢেকে দিলে অনেক মাছ আটকে যায়। সারা শীত কাঁটা তুলে ঐ মাছ ধরে বিক্রী করে জমিদারেরা। সর্দার থাকে প্রত্যেক জমিদারের। হাফিজ মিঞা বড়বাড়ীর সর্দার। একদিন রাত নিশুতিতে এসে কুপ্রস্তাব করে আমার কাছে বড়বাবুর জবানীতে। আমি ঘুম তরাসে লোক, অনেক রাত নদীর ধারে বসে থাকি। হাফিজ বাবার থেকে ছোট, চাচা বলি আমি। কিন্তু সেদিন মা আমি তাকে এমন বাঁ পায়ের লাথি মেরেছিলাম, শীতের পর্বতপ্রমাণ নদীর পার থেকে ঝপাং করে নদীতে পড়ল। আমি বাড়ী ফিরে এসে বাবার বেয়ালমারা কোঁচটা—ঐ যে ছফলা বর্শী, ডাণ্ডা কেটে ছোট করে ছুরির সাইজ বানিয়ে নিলাম। নিরুপদ্রবে কাটল দিনকতক।

—কিন্তু মা, বাবার জমানো অধর্মের টাকার সন্ধান জানলেও এক পয়সা ভাঙিনি, রোজ ছোট ডিঙিটা নিয়ে মাছ ধরে আইরচার ষ্টীমার বাজারে বেচে আসতাম। দুটাকা, আড়াই টাকা হোতো। একার খরচ বাদে টাকা দেড়েক জমত। নির্ভাবনায় ছিলাম। টাঁটা কোমর ছাড়া করিনি, সেদিন আশ্বিনের ঝড়ে তোমাদের গাঁয়ের ঘাটে নৌকো ভিড়োতে হোলো। ঘাটে দাঁড়িয়ে ছিলেন বড়বাবু। জোলার মধ্যে তাঁর নৌকো, তাতে বিধু চৌধেরী। সবাই জানে ওঁর সাথে ওর সম্পর্ক। আত্তি দেখিয়ে বললেন—নৌকো ওইখেনে ভিড়ো কেশী, ভারী পাক, ডুববি। পাক সত্যিই ছিল। আমি গিয়ে কথামত নৌকো ভিড়োলাম।

—এদিকে তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। আমি আইরচার কেনা মুড়িকদমা খাই, হঠাৎ পিছন থেকে লোহার মতো শক্ত হাতে কে যেন আমার বুক বেড়ে টান দিয়ে কোলে নিয়ে ফেলল। খানিকটা গরম নিঃশ্বাস, খানিকটা ঝাপটাঝাপটি, তার পরই—উঃ মেরে ফেলেছে রে—আর্তনাদ। টাঁটা মেরে দিয়েছি পিঠে। খালি গায়ে থাকেন না উনি সেই থেকে। ছুছুটা ফোঁড়ের দাগ পিঠে কায়েম হয়ে গিয়েছে। আমার হাত পায়ের জোরের ত পরিচয় পেয়েছ। তার পরেই এক লাথিতে ঠেলে দিলাম জোলার জলে। শব্দ হোলো ঝপাং। ঝড় তখন নেই। সোজা বাড়ীর পথে ডিঙি চালালাম।

—তারপর সুরু হোলো উপদ্রব। কথা নেই, বার্তা নেই, আজ কোনো মেয়েলোক, কাল একজন চৌকীদার,—বড়বাবু পিসিডেণ্ট কিনা—অনবরত ঘুর ঘুর করে। মনোহরের

কোনো পাত্তা নেই, ভাবলাম, আজ আইরচা যাওয়ার পথে মাঝ গাঙে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ দেব। কিন্তু প্রাণের মায়া, পারলাম না। সূর্য পাটে বসার আগে ফিরে মাছভাত খেয়ে গাঙপারে গিয়ে বসলাম। আমরা জেলের মেয়ে, বিধবা হলেও মাছ খাই। রাইত তখন অনেক, ঘরে ফিরে বারিন্দায় শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে পড়েছি, হঠাৎ একটা চেনা গলার আওয়াজ—কেশী লো, ওঠ্, ওঠ্, ওই পিঠালী গাছের তলা দিয়ে নেমে ইছামতীর মধ্যে আমার ডিঙিতে যা, দেরী করিস না, ধরস্ নামবে। তাকিয়ে দেখি, মনোহর। হাতে ওই পেল্লায় বাঁশের লগি, কাঁধ বুক ফুলে ফুলে উঠছে ঝড়ের ঢেউয়ের মতো। আমার ঘরের পিছনে তিনজন জোয়ান মাটিতে পড়ে, আর দুজন আসছে পার বেয়ে। মনোহর এক ধাক্কায় আমাকে পিঠালি গাছের দিকে ঠেলে দিয়ে, লগি উঁচিয়ে ওই দুটো লোকের দিকে দৌড়ুয়। আর তখুনি, গাঙের পর্বতপ্রমাণ পার ধ্বসে—তিন মুর্দা, জিন্দা গাঙ পাড়ে তলিয়ে যায়। মনোহরের পায়ের দু ইঁঞ্চি দূরে বেবাক ফাঁক—জমিন নেই। আমার ঘরটা বেঁচে যায়। ঝটকা দিয়ে মনাকে টেনে নেই পিছনে—বলি, উজবুক, বাঁদর, পাঁঠা—কে তোকে অত ধারে যেতে বলেছে? গাধার মত দাঁত বের করে লোকটা, বলে, তা ঠিক্, তা ঠিক্, আর একটু হলেই গিয়েছিলাম আর কি।

—এত বড় কাণ্ডকারখানার পর ঘুম আসে না। দুইজনে উঠোনে বসে খবর বার্তা নেই। মনোহর নাকি আজ চারদিন ভৈরব থেকে ফিরে ডিঙি নোঙর করেছে ইছামতীর খাড়িতে। রোজ নাকি আমার ওপর নজর রাখে—সমস্ত রাত জেগে পাহারা দেয়। একটা দৈত্যের মতো হয়েছে শরীরটা। কি খায়, কি পরে, কিছু বলে না। শুধু চলে হাসে, চলে যায়। আমি বলি,—সাদেক মিঞার কামে আবার গোয়ালন্দ যা না কেন? বলে—উঁহু, এসে যা শুনলাম, আমি এই দিক্‌দেশ থেকে নড়ছি না।

—নির্ভরসার থেকে ভরসার মুখ দেখি। কচি ছুঁড়ির মতো লজ্জা লজ্জা করতে থাকে। ঝড়, ঝাপট, অত্যাচার, সব মুছে যায় মন থেকে, কিন্তু বুক টিপ্ টিপ্ করে ভয়ে। পাঁচ পাঁচটা লোক ধ্বসে তলিয়ে গেল, সোরগোল উঠবেই। তবে গাঙের ভাঙনে অমন কত প্রাণ যায়, সুলুক সন্ধান সুরু হয়, আবার ভুলেও যায় সবাই। গাঙ্ আমাদের মা দুর্গা, একহাতে অসুর মারে, আর কত হাতে পালন করে।

এলোকেশী দম ফেলে কাহিনী বন্ধ করে। নিভাননী নির্বাক স্নেহে ওর চুলের রাশে হাত বোলান। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারেন না। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, উপায় একটা হবেই। সাধুর অধর্মের টাকা তুলে ফেল। গাঁ ছাড়তে হবে। লক্ষ্মী-পূর্ণিমার পর আমরা ফিরব। ঐ গোয়ালন্দেই তোদের স্থিতি করে দিয়ে যাব। সাদেকের কারবার এখনো চালু আছে?

—যদি বাবার টাকাকড়ি তুলি তবে মাঝারী কিসিমের ব্যবসা আমরাই চালাতে পারব। সাদেকের নোক্‌রী করার দরকার হবে না।

—তবে তাই হবে। তুই মনহরাকে পয়সা কড়ি দিয়ে ডিঙি, জাল, কিনতে পাঠিয়ে দে কালকেই। আর দিন দশেকের বেশী ত নেই। আবার তার আগে তোর বিয়ের জোগাড় যন্তর করতে হবে। এখন বাড়ী যা, ভর সন্ধ্যে হয়ে এলো। বিপদ আপদ নেই ত?

—বিপদ আপদ পদে পদে, তবে এই যে,—বলে এলোকেশী ছফলা কোঁচটা দেখায়। নিভাননীর পায়ে প্রণাম করে স্কুল বরাবর বাড়ীর পথ ধরে। যতক্ষণ না ভট্‌চাজদের পোড়ো-বাড়ীর মণ্ডপের আড়ালে অদৃশ্য না হয়ে যায়, নিভাননী একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। তার পর

উঠে গৃহকর্মে মন দেন।

হৃষিকেশ যথারীতি পাড়া বেড়াচ্ছেন, কনখল রায়বাড়ীতে ঝুমুর গান শুনতে গেছে। ঝির ঝির করে বিষ্টি এলো। এক লহরা শেয়ালের ডাক সুরু হয়ে থেমে গেল। অশ্রান্ত ব্যাঙের সারিগান সুরু হয়েছে। বাড়ীর পেছনে ডোবার দিক থেকে দু একবার কোনো নাম না জানা রাতচরা পাখীর হৃদয়ভেদী টিট্টিকার শোনা যায়। শরতের বর্ষণভরাক্রান্ত রাত তার বিপুল দেহভার নিয়ে সমস্ত দিনের হর্ষোজ্জ্বল জীবনচাঞ্চল্যভরা ছোট্ট জনপদটির বুকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বস্‌তে আরম্ভ করে। নিভাননী উত্তর দুয়োরীর দাওয়ায়, শিলেট থেকে আনা ডিট্‌জ লণ্ঠনের পল্‌তে উস্‌কে, হালে আসা "প্রবাসী"র পাতা ওলটান। মলাটের উদ্ধৃতি প্রতি মাসে পড়েন, পুরোনো লাগে না।

"নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে
পর দাসখতে সমুদায় দিলে
পর হাতে দিয়ে ধনরত্ন সুখে
পরো লৌহ বিনির্মিত হার বুকে।
পর দীপমালা নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে॥"

রবিবাবুর দু চারটে গান, প্রভাত মুখুজ্যের নবীন সন্ন্যাসী, চারু বাঁড়ুজ্যের ছোট গল্প, ঘণ্টাখানেক মনোহরণ করে রাখে নিভাননীর। সম্পাদকের বিবিধ প্রসঙ্গে রস পান না, তাই উলটে যান। কিন্তু তাতে যে সব প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়, তার প্রত্যেকটিই ওঁর মতের অনুকূল। তবে নিজের মনের কথা আর একজন গুছিয়ে বলছে শোনবার ধৈর্য থাকে না। এসব ত নিজেই ভেবেছেন, নিজেই বলতে পারেন।

শিবু চৌধুরী হাঁসের রোষ্ট খাবেন, তবে মুসলমানের ছোঁওয়া খাবেন না। রেঁধেছে রহমৎ, সদরে কাছারী ঘরের পেছনে পাটশোলার আগুনে। তাকে সাত্ত্বিক করতে হবে। জনকয়েকের মতো রান্না পাখী নিয়ে আসেন নিভাননী, পেতলের ডেক্‌চিতে ঢেঁকিঘরের বাইরে উঠোনে খোঁড়া উনুনে দু'হাতা গাওয়া ঘী ঢেলে মরা আঁচে বসিয়ে রাখেন। সুঘ্রাণে বাড়ী ভরে যায়। সাদা ভাত। মেজবৌ এখনো বসান নি, ছোট্‌ঠাকুরপো'রা এলে গনগনে বাঁশের জ্বালে বসিয়ে দেবেন, দশ পনের মিনিটে হয়ে যাবে। ঐ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ঝুল-কালিপড়া অন্ধকার হারিকেন নিয়ে লাঠি কাঁধে নিধি চৌকীদার আসছে। পেছনে চৌধুরী, হৃষিকেশ, কনখল আর রায়বাড়ীর বিশু—ও কনখলের সমবয়সী। নিভাননী কপটতাকে উপেক্ষা করতে শিখেছেন—রহমতের রসুই নিজের বলে গেঁয়ো গোঁড়াকে খাওয়াবেন তাতে একটুও অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছেন না। দুদিনেই মালুম করে নিয়েছেন, এ সব গাঁ দেশে সব চলে, খালি মুখপাত দোরস্ত্‌ রাখতে হয়।

হৈ হৈ করে দল এসে পড়ে। কাছারী বাড়ীতে ফরাসে বসেন কর্তারা, ছেলে দুটো ভিতর বাড়ীতে যায়। নিভাননী শোলার উনুনে বাঁশের চোঙে ফুঁ দিচ্ছেন, চিক্‌মিক করে আঁচ উঠ্‌ছে আর পড়ছে। বলেন, গা হাত পা ধুয়ে আয়। ওটা কেরে? জয়ার ছেলে বিশু না? আয় বাবা আয়। বিন্দি ঝিটা গেল কোথা? যা যা, বাইরে সদরে বালতি ঘটি গামছা তোয়ালে দিয়ে আয়। ছোট কর্তার চটি নিয়ে যাস্‌।

মেজ বৌ ডেকে বলেন,—ভাত চড়ালাম রে ছোট বৌ—দেখতে দেখতে হয়ে যাবে। তুই মাংসের ডেগ্‌ নামিয়ে ওদের জায়গাগুলো করে রাখ। নিভা বলেন সেকি আর করে রাখিনি,

বিশু আসবে জানতাম না, আর একটা পিঁড়ি দিচ্ছি। বড়দির তহবিল থেকে কিছু তেঁতুল-কাশন বের করে রেখো মেজদি। তোমার ছোট্‌ঠাকুরের লালচের অন্ত নেই। কতো যে খেতে পারে মানুষ। মেজবৌ বলেন, জিভ সামাল দে নিভা, কি খাওয়া ওর দেখলি তুই! প্রাণভরে দশদিন সবরকম ভালোমন্দ করে খাওয়াতেই পারলাম না! চাক্‌রী আর বিদেশ, কি যে খায়, কি যে করে, বুঝিও না, জানিও না।

নিভাননী আলগোছে মুচকি হেসে কাজে মন দেন।

আহার পর্ব সুরু হয়। পরিবেশন মুখ্যত করেন মেজবৌ। কেবল মাংসের হাঁড়ি নিয়ে নিভা বসে থাকেন। বাগ্‌চি ও চৌধুরীর পাতে দুটি করে আস্ত পাখী ছেলেদের দুজনাকে একটা করে, দিয়ে নিভাননী কনখলকে বলেন,—কেটে দেব? কনখল বলে, খুব নরম হয়ে গেছে মা, হাত দিয়ে পারব।

শিবু চৌধুরী দুটি পুরন্ত হাঁস সাবাড় করে বলেন,—অমৃত। বলেই লুব্ধ দৃষ্টিতে ঢাক্‌নী চাপা ডেক্‌চির দিকে তাকান। আরো দুটো পাখী তুলে দেন তাঁর পাতে নিভাননী। তিনি হাঁ হাঁ করে ওঠেন, আরো করো কি বৌমা। একটা একটা, অতো কি মানুষ খেতে পারে। কিন্তু যথারীতি ও দুটিরও হাড় কখানি পড়ে থাকে। তৃপ্তির উদ্গার তোলেন শিবু চৌধুরী। হবিষ্যিঘরের কাউনেবীজের পায়েস দিয়ে ভূরিভোজন সমাধা হয়।

মুখ ধুয়ে পানের বিরদানী হাতে সদরে যেতে যেতে চৌধুরী বলেন,—ধন্য রান্নার হাত তোমার বৌমা। নবমীর দিন ভেড়া বলি আছে। খানিকটা সরিয়ে রাখব—এমনি মোগলাই করে আলাদা রেঁধো। এসব দেবভোগ্য খাদ্য, আমরা কল্পনায়ও আনতে পারিনে। কি বলো হে হৃষিকেশ?

হৃষিকেশ বলেন না কিছুই, কিন্তু ঘোঁৎ ঘাঁৎ শব্দ করে সম্মতিই জানান মনে হয়। শিবু চৌধুরী বিশুর হাত ধরে বাড়ীমুখো রওনা হন। কনখল পশ্চিমদুয়ারী ঘরে শুতে যায়। হৃষিকেশ বর্মাচুরুট ধরিয়ে পায়চারী করেন। নিভাননী তোলা জলে স্নান করে ছাপাছন্দ হয়ে মেজবৌয়ের সাথে রান্নাঘরে খেতে যান।

সুষুপ্তির পরিবেশ নামে গেরস্তালি ঘিরে।

সত্যিই কি সুপ্তি? রাত্রির একটা মুখর জীবন আছে। রাত কথা কয়। কিছুটা হাওয়ার হুহু শ্বাসে, কিছুটা রাত্রেয়দের বাচনিক প্রকাশে, কিছুটা রাত্রিশেষের প্রথম অরুণোদয়ের ইঙ্গিতে। কনখল বিছানা ছেড়ে খোলা উঠোনে এসে বসে পড়ে, সেই একরাতে আয়েষার আকর্ষণে যেমন ডুবে মরতে গিয়েছিল। কিন্তু আজকের আকর্ষণ যেন বিশ্ব-প্রকৃতির। চোরাবালি থেকে প্রাণ নিয়ে ফেরা, গ্রামীন পরিবেশের অনেক কিছু জানা, মা-বাবা থেকে ধীরে ধীরে দূরে দূরে সরে যাওয়া, ওর ব্যক্তিত্ববোধকে উদ্বুদ্ধ করে। এগারো বারো বছরের কনখল আজ মনোহরের মতো সাঁই জোয়ান হয়ে যেতে চায়। চায় আকাশ পাতাল পৃথিবীকে কাগজি লেবুর মতো টিপে রস করে খেয়ে ফেলতে। বুকের দুরাশা। সমস্ত সত্ত্বায়, আশ্চর্য একটি মুখ, এক জোড়া চোখ, সম্মোহন আনে ওর মনে। দাফিয়ে ওঠে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে। ঠোঁট ফেটে বাক্য ফোটে না, কিন্তু ইমাম সাহেবের প্রশান্ত প্রশস্তি ওকে স্বপ্নে আবার ঘুম পাড়িয়ে দেয়। ও যাবে, যাবে, ফিরে যাবে,—সেই শাহ্‌জলালের দরগায়, সেই দেবমূর্তি ইমাম সাহেবের কোলে, সেই অগণন কবুতর কবলিত মিনারের তলায়, সেখানে শান্তি, সেখানে তৃপ্তি, সেখানে আনন্দ। জীবনদেবতা বোধ করি একটি মানুষের মধ্যে রূপায়িত হয়ে দেখা দেন, তা না হলে রক্তমাংসের মানুষ তাঁর নাগাল পাবে কেন।

কনখলের স্বপ্নস্তিমিত চোখে, মনে, বুকে হাজি সাহেবের বলা একটি গল্প রূপ নেয়। ভারত মহাসাগরের এক দ্বীপে কোনো এক রাজকুমারীর কোলে এক ছেলে এসেছিল। রাজকুমারী তাকে ভাসিয়ে দেন ভেলায়। সেই ছেলে আর এক দ্বীপে এসে পৌঁছল। সে দ্বীপে মানুষ নেই। এক হরিণী তাকে ডাঙায় তুলে ছেলের মতো মানুষ করলো। সদ্যোজাতের যা কিছু আকাঙ্ক্ষা আকিঞ্চন হরিণী-মা মেটালো। জীব, জন্তু, গাছ, পালা এই সব সে দ্বীপের বাসিন্দা। ব্যতিক্রম রাজকুমারীর নন্দন। শিখলো পশুদের আত্মরক্ষার সহজাত সহবৎ। হিংস্রদের হাত থেকে কি করে আত্মরক্ষা করতে হয়, কি করে আহার সংগ্রহ করতে হয়, কি করে উল্লাস উল্লম্ফনে জীবন যাপন করতে হয়। হরিণী-মা সব সময়ে সাহচর্য দেন। যেন হাতে কলমে জীবন যাপন শেখান। বিশাল সূর্যকে ঘিরে বিশালতর আকাশ, কুমারের চন্দ্রাতপ। সমস্ত দ্বীপ তার শয্যা ও ক্রীড়াঙ্গন। অগাধ সমুদ্র তার কেলিভূমি। কিন্তু হরিণী-মা মরে গেল একদিন। মরণ কি কুমার জানতো না। শুধু অভিভাবকত্ব ঘুচে গেল, এই বোধ জাগলো মনে। সাথে সাথে সাবালক মনে হোলো নিজেকে।

মানুষের বাচ্চার সাথে জীবজন্তুর প্রভেদ ধীরে ধীরে স্ফুট হয়। গাছের শেকড় পাতা দিয়ে কটিবাস তৈরী করে কুমার। বড়ো গাছের বাকল গায়ে জড়িয়ে শীতাতপ নিবারণ করে। কিন্তু না, এ ত যথেষ্ট নয়। তার হরিণী-মায়ের মতো অনেক পশুপক্ষী মরে পড়ে থাকে এখানে সেখানে। তাদের বৃহত্তর জানোয়ার এসে খেয়ে ফেলে। কেবল মাত্র ঈগল পাখীর দেহের দিকে কেউ যায় না। অনেক পালক, অনেক রোম। কুমার তাই খুলে নিয়ে নিজের দেহবাস বানাতে লাগলো। আপাদমস্তক ঈগলের পালক আর রোমে নিজেকে ভূষিত করলো কুমার।

কী ভয়াবহ চেহারা হোলো তার। অন্য বন্য জীবজন্তু ভয় পেতে লাগলো। শীতে শরীর উত্তপ্ত থাক্‌লো, নগ্নতা নিবারণ হোলো।

আত্মরক্ষার সব ব্যবস্থা হয়ে যাবার পর কুমার ভাবতে লাগলো, কেন হরিণী-মা মরে গেলো। কাল যে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বনবাদাড় উদাল করে ঘুরেছে, আজ কেন সে স্থির হয়ে পড়ে আছে। ছুরীর মতো বাঁশের চাঁচ, তীক্ষ্ণফলা পাথরের টুক্‌রো, এইসব দিয়ে সে পালিকা মাকে কেটে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করলো। শরীরের সব যন্ত্রের শেষে এসে পৌঁছলো বুকের বাঁ দিকে ধুক্‌ধুকি একটুক্‌রো রক্তপিণ্ডের ওপর। সেটাও স্পন্দ শেষে স্তব্ধ হয়ে গেল। এইবার হরিণী-মা একেবারে নিথর হয়ে গেলো। কুমার অনেকক্ষণ ভাবলো, তারপর হরিণীকে নিয়ে কবর দিয়ে এলো।

আদিম প্রকৃতির নিঃসঙ্গ রাজত্বে, সেই বন্যপশুপক্ষী অধ্যুষিত বিস্তীর্ণ বনভূমে, আত্মরক্ষা, আত্মসংরক্ষণ, জীবনধারণ এইসব সহজাত সংস্কারের সাথে কুমারের মানসে প্রকৃতির দুলালদের বশ করবার অভিলাষ মূর্ত হয়ে উঠ্‌তে লাগলো দিনের পর দিন। ক্ষুধাতাড়ন ভোজনোপযোগী মৎস্য মাংস আহরণ, পরিধেয় বস্ত্রহরণ, বাবুই পাখীর কুলায় নির্মাণ কৌশলদৃষ্টে স্বগৃহ নির্মাণ, বন্য অশ্ব বশ করে আরোহণোপযোগী করে নেওয়া—দিনের পর দিন কুমার এই সমস্ত জৈব প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা আয়ত্তে আনবার প্রয়াসে সফলকাম হোলো। মিট্‌লো জীবন ধারণের দৈনন্দিন দুশ্চিন্তার পালা।

পায়ের তলায় পৃথিবী ভোগ্যা হয়ে এলো, কিন্তু রাত্রিনিশীথে আকাশের দিকে তাকিয়ে কুমার মনের মধ্যে অন্তহীন জিজ্ঞাসায় জর্জরিত হয়ে উঠতে লাগলো। এই আকাশ, এত তারা, চাঁদ, সূর্য—কিন্তু সবায়ের আবির্ভাব নিয়মতন্ত্রী। তাহলে কে এদের চালাচ্ছে?

একজন নিশ্চয় সৃষ্টি করেছেন। তিনি স্রষ্টা। তিনি ছক্‌মাফিক চালাচ্ছেন। তিনিই একমাত্র সত্ত্বা। তিনি অনন্ত। তিনিই অখণ্ড পরিপূর্ণতা। তিনিই সুন্দরতম। তিনিই শক্তি, তিনিই সার্থকতম প্রকাশ। তিনি তিনিই। তাঁর পায়ের নীচে সমস্ত স্বর্গমর্ত্য পাতাল অবনত। তিনি স্বয়ম্ভূ।

স্বপ্নাচ্ছন্ন কনখল খোলা উঠোনে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে। সকালে নিভাননী বেরিয়ে খোলা গায়ে ছেলে পড়ে আছে দেখে হায় হায় করে ওঠেন। ছেলে বড় হয়ে গিয়েছে, কোলে তুলে নিয়ে যাবার ক্ষমতা নেই। আর্তনাদ করে ওঠেন,—মেজদি, বলে। দুই জা'য়ে ছেলেকে ঘরে ওঠান। আচ্ছন্নের মতো কনখল ঢলে পড়ে বিছানায়। সেদিন ওর অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুম ভাঙে না।

২০

পুজো এসে গিয়েছে। আজ সপ্তমী। কেশী মনোহরের বিয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে দিয়েছেন নিভাননী হৃষিকেশ। ওরা দুজনেই আজ এ বাড়ীতে। মনোহরের ডিঙি বাবলা বনের তলায় জোলার মধ্যে বাঁধা। মনোহর বলির পাঁঠা ধোয়াতে গেছে, এলোকেশী ইয়া জগদ্দল পাটায় মশলা পিষ্‌ছে। বাড়ীতে পুজো, তবুও হৃষিকেশের পাড়া বেড়ানোর কামাই নেই। বাজনাদারেরা চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বাজনা বাজিয়ে চলেছে, বাল্যভোগের বাজনা। হরনাথ ঠাকুর পূজারী, টিকিতে ফুল বাঁধা, খালি গা, উত্তরীয় জড়ানো, মুখে যথাসম্ভব গাম্ভীর্য এনে ভুল মন্ত্র পড়ে যাচ্ছেন। আশে পাশের পাঁচখানা গাঁয়ের ছেলেমেয়ে ভিড় করেছে পুজো মণ্ডপের সামনে। কে যে কি করছে, তার তদারক করবার লোকের অভাব। ভেতর বাড়ীতে তিন জা'য়ের ব্যস্ততার অন্ত নেই। হরনাথের হুঙ্কারে বড়বৌ ফাইফরমাস খাটছেন। মেজবৌ ভোগ রান্নার ঘরে, জোগানদারনী রায়বাড়ীর সর্বজায়া ঠাক্‌রুণ, বিশুর মা। ঢেঁকিঘর থেকে ঢেঁকি সরিয়ে দুটো উনোন পাতা হয়েছে, তাতেই বিরাটকায় কড়াই চাপানো, মাছ এখনো আসে নি, অন্যসব নিরামিষ উপাদান চড়ে গেছে।

তপ্তকাঞ্চনবর্ণা সর্বজয়া ঠাক্‌রুণ যেন ঘুরতি লাটিম। এই ডালে কাঠি দিচ্ছেন, এই কচুর শাকে খোন্তা ঘোরাচ্ছেন। আর থেকে থেকে বলছেন,—মেজবৌ, যাওনা কেন, একটু মিছ্‌রীজল মুখে দিয়ে এসো। সেই ভোর রাতে উঠেছো, ধকল ত সমস্ত দিনমানই আছে, শরীরে সইবে কেন? মেজবৌ বলছেন—তোর শুক্‌না মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কোন প্রাণে জলগ্রহণ করি বল। সর্বজয়া বালবিধবা—নিরম্বু উপবাসিনী। কিন্তু মুখরা। বলেন,—আ মর। আমরা যমের অরুচি। তুমি সধবা, তুমি শুকিয়ে মরবে কেন।

নিভাননী, আরো দু একটি গিন্নীবান্নীর সাথে পেল্লায় বঁটি পেতে আনাজ কোটায় ব্যস্ত। তরিতরকারীর পাহাড় জমে উঠ্‌ছে পরাতের ওপর। কল কল করে কলকাকলীর অবধি নেই, কিন্তু গিন্নীদের হাত ধারালো বঁটির ওপর চলছে কলের মতো তাকে, একটুও বে-হিসেবী অঙ্গুলী চালনা নেই। এই সময়ে মাছ এসে পড়ল। পরাণ জেলের মাথায় চ্যাঙারী, উঠোনের মাঝখানটায় উপুড় করে ঢেলে দিল। সাত আট সেরী গুটি চারেক রুই, একটা প্রকাণ্ড বোয়াল, আর আধ মণ আন্দাজ টাটকিনি খরসোলা। মেজবৌ ঝামটা দিয়ে ওঠেন—তোর কি হুঁস পবন হবে না কোন দিন পরাণে? মাছ কোটা হয় ঐ জগডুমুরের তলায়, নামালি মাঝবাড়ীতে?

পরাণ একগাল হেসে বলে,—সবাই দেখুক মা, তার পর আমি আর মদ্না ঠিক জায়গায় মাছ নিয়ে পোঁছে দেব। মদ্না পরাণ-জেলের ছেলে, বছর দশবারো বয়েস হবে। ছাতাপড়া দাঁত বের করে হেসে বলে,—হেঁ কর্তামা, সব ঠিক জায়গায় পোঁছে দেব। মাছ দেখতে ভিড় হয়ে যায় গোল করে। একজন বলে,—বোয়ালটা একটা জ্যান্ত মানুষের সাইজ রে, মণখানেক হবে। আর একজন টিপ্পনী কাটে—রুইগুলো কি টক্‌টকে লাল রে, এখনো কান নড়ছে। মেজবৌ মাছ দেখে আহ্লাদিতা, নিভাকে ডেকে বলেন—ছোটবৌ, মাছ দেখে যা।

মৎস্য পর্ব শেষে আবার গতানুগতিক কর্মব্যস্ততা বাড়ীটাকে ব্যাপৃত করে রাখে। বিশু আর কনখল এ পাড়া ও পাড়া টইলদারি করে ফিরে আসে। কনখল সোজা এলোকেশীর সামনে গিয়ে সিঁধেয় দগ্‌দগে সিঁদুর দেখিয়ে বলে, মাকালী সেজেছিস্ কেন কেশীদি? এলোকেশীর মুখে কটুকাটব্য ফুটতে গিয়ে ধন্দ খেয়ে যায়—তোকে খাব বলে। সাম্‌লে নিয়ে বলে, আমি কালো, তাই বলছিস ত? কনখল বলে,—না না, অতো সিঁদুর লেপেছিস কেন কপালে? এলোকেশী ফিক করে হেসে বলে,—মাকে জিজ্ঞেস কর। কনখল দাঁড়ায় না। কিন্তু হাত ধরে ভোগরান্নার জায়গায় উঁকি দেয়, সর্বজয়াকে দেখিয়ে বলে—তোর মা'ই যেন দুর্গাপ্রতিমা, মুখে কেমন জ্যোতি দেখেছিস্। সর্বজয়ার মুখে আশীর্বাণীর প্রলেপ পড়ে। বলেন,—তোরা দুটিতে কিছু খেয়ে নেত এইবার। মধ্যাহ্ন ভোগের ঢের দেরী। মেজবৌ উঠে আসেন। দু' ছেলের হাত ধরে হবিষ্য ঘরের সামনে বসিয়ে দেন। খিচুড়ি, ভাজা, একটা ঘণ্ট তরকারী, পেট ভরে খেয়ে নেয় ওরা। খাওয়া শেষ হলেই আবার বেপাত্তা হয়ে যায় একাধিক পুজোবাড়ীর আঙিনায়। গাড়িয়ে গড়িয়ে চলে দিন। পুজোর সমস্ত আণ্টিক একটার পর একটা সুষ্ঠু ভাবে সংঘটিত হয়ে চলে। বলির সময় বুকিয়ে থাকে কনখল। বন্দুক দিয়ে পাখী মারতে যে নির্মম, হাড়িকাঠে ফেলা হাত পা বাঁধা অসহায় ছাগশিশু বধে তারই মনে আর্তনাদ জাগে। বলে, এ অন্যায়, এ ভালো না। বলির বাজনা থামলে স্বপ্নাবিষ্টের মতো চোখ মুছে ওঠে। চোখের কোণের জলের ধারা মোছে। আড়াল থেকে একজন ওর কীর্তিকলাপ দেখছেন, দেখতে পায় না কনখল। নিভাননী আঁচলে চোখ মুছে নিঃশব্দে সরে যান।

রাত্তিরে বড় বাড়ীতে যাত্রা। পালা সেই চিরন্তন রাধাকৃষ্ণের। নাম বুঝি 'চতুরালী'। আয়ান ঘোষের গাঁক্ গাঁক্ গর্জন, জটিলা কুটিলার অপদস্থ হওয়া, কেন্টর কালী হয়ে যাওয়া, ফুটো কলসীতে রাধার জলভরা—দেখে দেখে আশ মেটে না কনখলের। কানে হাত দিয়ে একটানা সুরের গানগুলো মোহিত করে ওকে।

'ওদের বাড়ী আর যাব না,
ক্ষীর সর ছানা, নবনী আমি
চুরী করে আর খাব না—'

যশোদার কপট গঞ্জনা বুঝতে পারে কনখল। সুবলটা দেখতে অনেকটা বিশুর মতো। নিজেকে দেখতে পায় না, কিন্তু কেন যেন মনে হয় কেন্টর সাথে কিছুটা মিল আছে ওর। কেন্টর অলৌকিক কার্যকলাপ সব যেন করতে পারে, এমনি মনে হয় ওর। যাত্রা ভাঙ্‌লে মা'র হাত ধরে বাড়ী ফেরে। চেনা জগতে পা পড়ে না, যাত্রার জগৎ দখল করে থাকে মনপ্রাণ। বুকে গুণ্‌গুণ্‌ করে গান ঠেলে ঠেলে ওঠে। হঠাৎ খিল খিল করে হেসে ওঠে খামখাই। নিভাননীর হাতে ঝাঁকি দিয়ে বলে,—খুব ভালো যাত্রা, না, মা? নিভাননী ছেলের পাগলামীতে অভ্যস্ত, বলেন—ভালোই ত।

পুজোর কটা দিন বেশ কাটে। নবমীর দিন শিবু চৌধুরীর বাড়ীর বলির ভেড়ার খানিকটা চালান হয়ে আসে বাগচি বাড়ীতে। যথারীতি রহমৎ কোর্মা বানিয়ে ডেক্‌চি চালান দেয় নিভাননীর কাছে। উনি আবার দই ঘী দিয়ে আর একবার ফুটিয়ে বসে খাওয়ান সবাইকে। রান্নার তারিফ পড়ে যায়। নবমীর রাত শেষে বিজয়ার ভোরে সানাইয়ে করুণ তান ওঠে। 'নবমীর নিশি তুমি আজ আর পোহায়ো না, তুমি গেলে উমা আমার চলে যাবে, আর আসিবে না'। বিষাদের সুর। প্রত্যুষে চোখ মেলে কনখলের মন উদাস হয়ে যায়।

মেয়ে বৎসরান্তে বাপের বাড়ী এসেছিল, আজ ফিরবে শ্বশুর ঘরে। আবার একটি বছর অদর্শন। মেয়ের মায়ের বিলাপ ঐ রাগিণীতে বেদনা ঝরায়। এ সব "কথা ও কাহিনী" বই পড়ে আর শাস্তর শুনে কনখলের জানা হয়ে গেছে। তাই মেনকার দুঃখে ওরও মন কাঁদে।

কিন্তু না। হৈ হুল্লোড়ের ব্যাপার আছে—ভাসান ও বিসর্জন। নদীতে যাওয়া হবে বিকেলে। নতুন কাপড় পরতে হবে। বিসর্জন অন্তে প্রণাম কোলাকুলির ধুম পড়ে যাবে। এ বাড়ী ও বাড়ী মিষ্টিমুখ, অনেক রাত হবে সারতে সারতে। পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দেশ দিয়ে রাখেন নিভাননী।

প্রতিমা নিরঞ্জন হয়ে যায় আগবেলায়। গোটা তিনেকের সময় সোরগোল করে নামানো হয় উঠোনে। ছেলেমেয়েরা ডাকের সাজের সাড়ীর আঁচল, শোলার গয়না সংগ্রহ করে দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতীর গা থেকে। কার্তিকের হাতের তীর ধনুক কনখল খুলে নেয়। গণেশের কলা বৌ হুমড়ী খেয়ে পড়ে পড়ে, হরনাথ ঠাকুর টিকি নেড়ে সামাল সামাল করেন। আটজোয়ানের স্কন্ধবাহিনী হয়ে মা দুর্গা সপরিবারে নৌকাভিমুখীন হন, বাড়ীতে মা জ্যোঠিরা ঘন ঘন শাঁখ বাজান, খই ছেটান, যারা নৌকোয় যাবে তারা বীরদর্পে এগোয়, যারা যাবে না তারা খালি মণ্ডপে মাথা ঠোকে।

বড় গাঙে এসে বিরাট জোড়া নৌকোর সন্ধিস্থলে প্রতিমা বসানো হয়। ঢাকি, ঢুলি, করতালবাদকেরা মৌহ করে বসে কান কালা করা বাজনা বাজায়। কর্তারা শশব্যস্ত হয়ে বিপদ-আপদের তদারক করেন। আসোটিলিন গ্যাসব্যতির আট দশটা ডাণ্ডা তৈরী করে রাখা আছে, সূর্যাস্তের পর জ্বলবে। ছেলেমেয়েরা থেকে থেকে ধমক খায় নৌকোর কানাচে ভিড় করবার জন্য, মাঝখানে এসে বসতে হয়। এইবার নৌকো ছেড়ে দেওয়া হয়।

ঘণ্টাখানেক পার থেকে মাঝনদী, এক ফেরতা, দু' ফেরতা পরিক্রমা করতেই সন্ধে ঘনিয়ে আসে। ঠিক মাঝ গাঙে নয়, অথচ জল গভীর, এমন জায়গায় নৌকো থামে। তারপর জোড় খুলে দিয়ে দু' নৌকো দু'ধারে হটতে থাকে। ঢাক ঢোল করতাল উত্তাল হয়ে ওঠে। প্রতিমা বিরাট শব্দ তুলে তলিয়ে যায়। হাত বাড়িয়ে নদীর জল এ ওর গায়ে ছেটায়। গ্যাস্‌বাতি জ্বলে ওঠে। কোনো সৌখীন কর্তার নাও থেকে হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান সুরু হয়। তারপর, ধীরে ধীরে বাড়ীমুখো। কড়া কড়া নির্দেশ আসে, যে যার বাড়ী গিয়ে আগে মণ্ডপ প্রণাম করবি, তারপর প্রণাম কোলাকুলি।

প্রণাম কোলাকুলি সুরু হতে আশপাশের গাঁ অবধি গতায়াত চলে। মাইলখানেক দূরে উত্তরের গাঁয়ে খুব ডামাডোল, একটি যুবককে কেন্দ্র করে। চক্রবর্তী বাড়ীর নরেশ। আঠারো বচ্ছর বয়সে আন্দামান হয়েছিল কোন লাটের গাড়ীতে বোমা ফেলার সন্দেহে, বারো বচ্ছর কারাবাসের পর সচ্চরিত্র মেয়াদী বলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে

করোনেশনের বছর বলে। কনখল আগামী ডিসেম্বরে দিল্লী দরবার হবে জানে, পঞ্চম জর্জ কুইন মেরী আসবেন শুনেছে। বিশুতে ওতে নরেশকে দূর থেকে দেখে আসে। রোগা-পটকা বিশ্রী চেহারা, কিন্তু সবাই মিলে তাকে নিয়ে কি যে করছে। কেউ বলছে দাদা, কেউ কাকা, কেউ বা তুই তোকারি করছে, কিন্তু ভাবখানা একই। নরেশ যেন মস্ত বীর, হয়ত একটা রাজ্য জয় বা করে এসেছে। বিশু কনখল গাঁয়ে ফেরে। কনখল রাত্রে মাকে বলে, আচ্ছা মা, চক্রবর্তী বাড়ীর নরেশ কি খুব বীর?

নিভাননী নরেশের পূর্বাতিহাস হৃষিকেশের কাছে সব শুনেছেন। বলেন,—কেন রে, তাকে দেখে এলি বুঝি? শুনেছিলুম ছাড়া পাবে।

—হ্যাঁ মা, ছাড়া পেয়েছেন ত বটেই, কিন্তু কথাবার্তা শুনে ভালো লাগ্‌ল না। পরেশদার মতো নয়।

—এরা সব অন্য দলের। পরেশরা অন্য দলের। এরা ধর্মাধর্ম মানে না। পরেশদের সেবাব্রতই মূল লক্ষ্য। ওরা সব স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য কিনা। নরেশরা ভালো লোক নয়, ওদের সাথে যেন ভাব করতে যাস্‌ নে।

কনখল বুঝতে চায় কেন একটি লোক বহুজনের আকর্ষণের মধ্যমণি হবে যদি তার ভেতরে লোকত্তর গুণ কিছু না থাকে। মায়ের কথায় সন্তুষ্ট হয় না। শুতে যায়। ঐ বয়সে কনখলের মনে অনেক কথা বলা, অনেক কথা জিজ্ঞেস করা, অনেক ভাবের আদান-প্রদানের সঙ্কল্প জাগে, কিন্তু ভাষায় কুলোয় না। কে ওকে সব ভাষা শেখাবে? ভাষা না হলে ভাব প্রকাশ করা যায় না, ফুঁসে ফুঁসে ওঠে ওর চিত্তচাঞ্চল্য, কিন্তু বৃথা, সব বৃথা। রাত্রির স্বপ্নে না বলা কথার তুবড়ি ছোটানো যায়, কিন্তু দিনে? দিনে ওর ঠোঁটে লাগসই কথাগুলো কে জুগিয়ে দেবে? ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। ভেসে ওঠে মানসে ইমাম সাহেবের সৌম্য মূর্তি। তিনি যেন হাত বুলিয়ে ওর মনের চোখ খুলে দিচ্ছেন, ঠোঁটে ভাষা দিচ্ছেন, কি জাদু আছে তাঁর ধ্যানে, এ সব সমস্যা সমাধানের আগেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমার পরের দিন এসে পড়ে। আজ কনখলেরা শিলেট ফিরবে। রহমৎ বাক্স প্যাটরা নিয়ে ষ্টীমার ঘাটে গিয়ে বসে আছে সকাল থেকে। কেশীদি মনোহর গোয়ালন্দে গিয়ে অপেক্ষা করছে। ষ্টীমার ছাড়বে নটায়। ফেণা ভাত খাইয়ে চোখের জলে ভেসে বড়বৌ মেজবৌ দেওর ভাজকে বিদায় দেন। শিবু চৌধুরী বাগ্‌চিকে সহোদরের চেয়েও ভালো বাসেন। দু'জনে অশ্রুসজল আপ্যায়নে নিজেদের ভুলিয়ে রাখতে চান। কনখল বিশুর মা সর্বজয়াকে প্রণাম করে আসে। বিশু ষ্টেশনে যাবে। কনখল কানে কানে বলে, উঁচু ক্লাসে উঠি, এক সাথে পড়ব একদিন, কি বলিস? বিশু ফুঁপিয়ে সম্মতি জানায়।

ঘাট থেকে ষ্টীমার ছাড়ল। সেই চেনা শব্দ, সেই সোরগোল, সেই পার থেকে রুমাল নাড়া—কনখল রহমতের হাত ধরে দোতলার ডেকের রেলিঙে দাঁড়িয়ে সব দেখে। ফিরে যায় যখন, তখন বাগ্‌চি আর গাইয়া নেই। পুরোদস্তুর সাহেব। মা আবার মেমসাহেব। রহমৎ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচে।

দু' ঘণ্টায় গোয়ালন্দ পৌঁছে যায় ষ্টীমার। আর একবার নামবার পালা, চাটগাঁর বিরাট ডাকজাহাজে ওঠবার পালা। কিন্তু ডাকজাহাজ ছাড়তে প্রায় দু' ঘণ্টা দেরী। ঘাট থেকে দুটি প্রাণী যে হা প্রত্যাশে জাহাজের দিকে তাকিয়ে আছে, প্রথম নজরে পড়ে

নিভাননীর। চেঁচিয়ে উঠেন তিনি, ওগো ওই দেখ, কেশী আর মনোহর। ডাকো না ওদের।

হৃষিকেশ বলেন—তার চেয়ে চলো আমরাই নামি। এখনো কলকাতার গাড়ী আসেনি, ঢের সময় আছে।

রহমৎ খবরদারীতে থাকে, মা, বাবা, কনখল নেমে আসে ঘাটে। এলোকেশী কনখলকে কোলে নিয়ে বলে,—চল্‌, আমাদের বাড়ী দেখ্‌বি চল্‌। মনোহর বোকার মতো দাঁত বের করে হাসে। কথা বলতে পারে না।

ষ্টীমার ঘাট থেকে এক রশি দূরে দুটি নৌকো বাঁধা। একটা দুই কামরার ছইঅলা নৌকো, আর একটা ইলিশ মাছের জাল সমেত জেলেডিঙি। বসবাস করবার নৌকোর ব্যবস্থা চমৎকার। শোবার ঘর, রান্নাঘর, সব সুন্দর। নিভাননী বলেন,—খাসা বাড়ী হয়েছে ত কেশী।

—দু'জন দাঁড়ি রাখতে হয়েছে মা। একজন ওকে নিয়ে মাছ ধরতে বেরোয়, আর একজন ঘাটের নৌকোয় পাহারা থাকে।

—টাকা কড়ি কি করলি?

—বাবা ত ব্যবস্থা করেই দিয়েছেন। রাজবাড়ীর ডাক ঘরে জমা আছে।

—তোদের ভালো হোক। দ্যাখ্‌, তোর বাবা হয়তো এইখানেই বদ্‌লী হয়ে আস্‌তে পারেন।

শুশীতে উপ্‌ছে পড়ে এলোকেশীর চোখ মুখ। তারপর হঠাৎ মুখ ঝাম্‌টা দিয়ে বলে,—ওরে বাঁদর, হাড় গিলে—নোতা ইলিশের হাঁড়ি?

মনোহর থত মত খেয়ে বড় নৌকোয় ঢুকে এক বিরাট হাঁড়ি বার করে নিয়ে আসে। এলোকেশী বলে, মা গো,—গোটা আষ্টেক বড় ইলিশ নুনজারা করে দিয়ে দিয়েছি। দুদিনের রাস্তা অনায়াসে চলে যাবে। হৃষিকেশ হৃষ্টচিত্তে বলেন, ফাইন। নিভাননী এলোকেশীর কানে কানে বলেন,—তোর বাবাটি বড় লোভী রে, হয়ত জাহাজে উঠেই বলবেন ইলিশ মাছ ভাজা আনো। আর ঐ যে তোর বুড়ো চাচা, সঙ্গে সঙ্গে ষ্টীমারের বাবুর্চি-খানা থেকে ভাজিয়ে আনবে। তা ভালোই করেছিস। এ ইলিশ 'ত শিলেটে কেউ দেখতেই পায় না।

অনেক প্রণাম, অনেক আশীর্বাদ, অনেক চোখের জল। বাগচিরা জাহাজে ফিরে আসেন। ঘাট পারে দাঁড়িয়ে থাকে মনোহর এলোকেশী। কলকাতার মেলগাড়ী এসে গেছে। জাহাজও পুরো দমে থর থর করে কাঁপে। যাত্রী ওঠার পালা শেষ হয়ে যায়। সিঁড়ির পাটাতন খালাসীরা হেঁইও হেঁইও করে ওঠায়। মোটা শিকলের কড় কড় শব্দ, জলদ গম্ভীর সুরে জাহাজের শিঙা, তারপর বয়লারের বাষ্প নিকাশের সাথে জাহাজ ছাড়ে। ডাঙায় এলোকেশী ফুঁপিয়ে কাঁদে, জাহাজে নিভাননী চোখ মোছেন।

২১

শিলেটে পৌঁছে কনখলের প্রথম কাজ হয় কাঞ্চনের তদবির। এতদিনের অনুপস্থিত বন্ধুর প্রতি অভিমান করে থাকে কাঞ্চন। অনেক ঘাড় দলাইমলাইয়ের পর আড় চোখে তাকায়, তারপর ল্যাজ দুলিয়ে চিঁ হি হি শব্দ করে। ভাব হয়ে যায় সাথে সাথে। মাকে

গিয়ে বলে,—আমি দরগায় ইমাম সাহেবের সাথে দেখা করে আসব মা?

—যা না। কিসে যাবি?

—কেন, কাঞ্চন।

—আচ্ছা যা। আর দেখ্, ফেরবার পথে আয়েষাদের বাড়ীতে খোঁজ নিয়ে আসিস।

—আস্তে বলব?

—না, থাক। শুধু আমরা ফিরেছি, খবর দিয়ে আসিস।

সকৌতুকে তাকান ছেলের দিকে নিভাননী। কিন্তু তাজ্জব বনে যান লক্ষ্য করে যে কনখলের আয়েষার নামে কোনো ভাব বৈলক্ষণ্য হয় না। সে উস্‌খুস করে ছুট্‌তে, তার ঊর্দ্ধনেত্রে অপার্থিব অঞ্জন লেগেছে। এটা তো কোনো মানুষী আকর্ষণ নয়। হঠাৎ ভয় পেয়ে যান নিভাননী। বলতে চান, ওরে থাম থাম—কিন্তু বলবার আগেই টগ্‌বগ্ করে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে যায় কনখল। নিভাননী ঘর দোর গোছগাছে মন দেন। ব্যাঙা কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে আঙিনায়, সব আদর ঢেলে দিতে চান তার ওপর। ব্যাঙা কেঁদে ফেলে। বলে,—বাবা মরে গেছে।

—কি হয়েছিল রে?

—কালো জলের জ্বর না কি, আমি ত বলতে পারব না মা। তবে উকীল হরেনবাবু হাঁসপাতালে ভর্তি করেছিলেন, উনি সব জানেন।

—তোদের চল্‌ছে কি করে? খাস-দাস কোথায়?

—কনাবাবার নতুন মাসী আমাদের সব ভার নিয়েছেন। আমি ত হারুণের সাথে এই বাড়ীতেই খাই। মা এখন নতুন মাসীর বাড়ীতে ঝিয়ের কাজ করে।

কথা শেষ হবার আগেই ঊষা এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। নিভা ঊষার থুত্‌নী ধরে চুমো খেয়ে বলেন,—কি লো, খবর সব ভালো ত? ঊষা ম্লান হাসি হাসে। নিভা বলেন,—চল ঘরে যাই। ব্যাঙা, তুই হরেনবাবুর বাসায় একটা খোঁজ দে ত যে আমরা এসেছি। ব্যাঙা চলে যেতে বলেন,—ওদিকের খবর কি সব?

ঊষার কাছ থেকে যে খবর সংগ্রহ করেন, তা মোটামুটি হোলো যে প্যারীবাবু পক্ষাঘাত হয়ে শয্যাশায়ী। কলকাতার ব্যারিষ্টার এসে সলা পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন। ফায়ার মেরিনের এক পয়সাও পাওয়া যাবে না, তবে আগুন লাগানোর ফৌজদারী হয়ত ফেঁসে যাবে। তেমন জোর প্রমাণ নাকি হয়নি। ঊষা গিয়ে পরেশের মায়ের পায়ে একদিন পড়েছিল, মা পরেশকে ডাকিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন, যাতে ঊষার সর্বনাশ না হয় গীতা সোসাইটি যেন দেখে। পরেশরা নির্দোষ প্রমাণ হয়ে গেছে। তারা আর প্যারীবাবুর বিরুদ্ধে উল্টো অভিযোগ আনতে চায়নি। অপরাধী অজ্ঞাত কেউ, এই সিদ্ধান্তই সাব্যস্ত হয়ে আছে। আর বিপিন কার্লাইলকে কারা যেন পুজোর ছুটিতে দেশে যাবার পথে বদরপুর জংশনে চলন্ত সুরমা মেল থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। প্রাণে মরে নি, তবে একটা পা আর একটা চোখ গেছে। এখন সেইটেই মামলা, আবার গীতাসোসাইটির ওপর হাম্‌লা হচ্ছে। বেলুড় থেকে কে একজন স্বামীজি এসেছেন, সমস্ত শহর ভিড় করছে সন্ধ্যেবেলায় তাঁর কথকতা শুনতে।

এক নিঃশ্বাসে এত খবর দিয়ে হাঁপিয়ে ওঠে ঊষা। বাইরে হরেন চাকরীর হাঁড়ি চাঁছার মতো কর্কশ ডাক শোনা যায়—কই হে মিস্টার,—বৌদি কোথায়,—আরে এই যে, তা একখান এক পয়সার সরকারী দূত পাঠাতে বাধা কি ছিল বৌদি, অন্তত একবেলা অধমের

আতিথ্য গ্রহণ করে ঘরদোর গোছাতে পারতেন।

হৃষিকেশ এসে হরেনবাবুর হাত ধরে বাইরে নিয়ে যান। বলেন,—চলো হে, বসিগে চলো। ওরে হারুণ, বিদ্যাভূষণ মশায়কে সেলাম দে। ওগো শুনছ, কিছু চা টা—

ঊষার দিকে তাকিয়ে কপট রোষে নিভাননী বলেন,—কি বেআক্কেলে লোক রে বাপু। ঘণ্টাদুয়েকেও হয় নি,—চলত, ঠাকুর ত এসেছে, দেখি কি হয়।

লুচি আলুর দম করে চায়ের সাথে পাঠিয়ে দেন বাইরে বিদ্যাভূষণ মশায় আবার খাবার সময় জুতো ছাড়বেন। তাঁর বসবার এবং খাবার দুটি জলচৌকীই ধুয়ে মুছে বাইরে পাঠান। হাত মুখ ধোবার জল নিজে নিয়ে রেখে আসেন ঘোমটা টেনে। হাঁ হাঁ করে ওঠেন হরেনবাবু—আরে একি, একি, মানে—

হৃষিকেশ বলেন—থামো হে চাকী, এ হোলো সহধর্ম। গোঁড়া বামুনের সহধর্মিনী, আচারনিষ্ঠ হিন্দু ঘরের বৌ, পুজোর পর আস্‌ছে গাঁয়ের বাড়ী থেকে। কি করতে হয় না হয়, বেশ জানেন উনি।

বিদ্যাভূষণ দাঁড়িয়ে ডান হাত তুলে আশীর্বাদ করেন।—চিরায়ুষ্মতী হও মা, ধনে-পুত্রে সার্থক হও। ও হরেনটার কথায় কান দিও না। ওটা অতি ফিচেল। হরেনবাবু কপট রোষকষায়িত চোখে বলেন,—বটে ভট্‌চায, আচ্ছা, Fair presence, এখন কিছু বলছি না, তবে দেখে নিচ্ছি দাঁড়াও।

আড্ডা জমে ওঠে। ঊষা যা যা নিভাননীকে বলেছিলো, সে সবও আলোচনা হয়ে গেল। হৃষিকেশ বলেন,—বিপিনবাবুর ব্যাপারটা ত নতুন জটিলতার সৃষ্টি করল হরেন।

হরেনবাবু চট্ করে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।—জটিলতা? জটিলতা কোথায়? ও, হ্যাঁ, প্রাণে বেঁচে গেছে, তাই জটিলতা থেকে যাচ্ছে বটে। একেবারে সাবাড় হয়ে গেলে কেস্ সাফ্ হয়ে যেত। ফৌজদারী ব্যাপারে মোক্ষম প্রমাণ ছাড়া কাকে দায়ী করবে বাপু, অপরাধী বলে? পুলিশ সন্দেহ করছে পরেশদের গ্রুপকে, কিন্তু ওদের একজনও শহর ছাড়ে নি ঘটনার দিন। অ্যাক্‌সিডেণ্টটা হোলো বদরপুর জংশনে—এটা পিওর অ্যাক্‌সিডেণ্ট হতে বাধা কি? আর কার্লাইল যে গেঁজেল, সে ত ওর চেহারায়ই মালুম। ছোট কল্‌কেয় বড় তামাক ডবল ফুঁকে পড়ে যায়নি, তার প্রমাণ?

বিদ্যাভূষণ মশায় বলেন,—হরেন, লোকের চরিত্রে মসীলেপন তোমার বড় বদভ্যাস। আইন আদালত হচ্ছে, সেখানেই যা হবার ধার্য হয়ে থাক্ না কেন। মনে মনে এ যুক্তির সমর্থন করেন হৃষিকেশ। কিন্তু মুখে কথার মোড় ঘুরিয়ে দেন। বলেন,—ওহে, প্যারী-বাবুর পক্ষাঘাত ত একটা শোচনীয় দুর্ঘটনা।

মুখফোড় হরেন চাকী বলেন,—স্বকৃত।

বিদ্যাভূষণ এবার দুঃখিত হন। বলেন,—হরেন, শুনেছি জীবনের নতুন মা মর্মাহত হয়ে মরার বাড়া দিন যাপন করছেন। মনে হোলো যেন তিনি এই বাড়ীতেই আছেন। বেফাঁসে এ সব কথা তাঁর কানে গেলে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো লাগবে।

যৌক্তিকতা বোঝবার মতো বুদ্ধির অভাব নেই হরেনবাবুর। মাথা নীচু করে থাকেন, জবাব দেন না। হৃষিকেশ প্রসঙ্গ বন্ধ করবার জন্য বলেন,—কনাটা আবার দেখলুম কাঞ্চন-সওয়ারী হয়ে ছুট্‌লো। কোথায় গেল এই অবেলায়—

ভেতর থেকে নিভাননী মৃদু কণ্ঠে বললেন—ইমাম সাহেবের কাছে। ডাক্তারের বাসায়ও খবর দিতে বলেছি।

বিদ্যাভূষণ মশায় বলেন—বুঝলে হে বাগচি, বুঝলে হরেন, ধর্ম মত যার যাই হোক, এই ইমাম সাহেবটির দেবাংশে জন্ম। এত মহৎ, এত উদার, এত ধর্মপ্রাণ লোক লাখে একজন মেলে কিনা সন্দেহ। আর পাণ্ডিত্য—অসাধারণ। সুফীধর্ম নিয়ে একদিন আলোচনার অবকাশ হয়েছিল, অবাক হয়ে গেলাম শুনে। উনি জালালউদ্দীনরুমীর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সুফী সাধকদের মর্মবাণী বুঝিয়ে দিলেন। আরো অনেকের। সেদিন অভিভূত হয়ে ফিরেছি।

হৃষিকেশ আন্তরিক সমর্থনে ঘাড় নাড়েন।

এই সময়ে কনখল ফিরে আসে। ঘোড়া আস্তাবলে হারুণের জিম্মা করে লাফাতে লাফাতে মার কাছে যায়। গিয়ে বলে—ইমাম সাহেব খুব খুশী হয়েছেন মা। কত আশীর্বাদ করলেন, তোমার কথা, বাবার কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি চোরাবালিতে পড়ে যাওয়া, কি করে কেশীদি আমায় বাঁচালো, সব বললাম। শুনে কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকলেন। ফার্সীতে মন্ত্রের মতো কি যেন বলে আমার মাথায় হাত রাখলেন।

নিভাননী জিজ্ঞেস করেন,—জাফর ডাক্তারদের ওখানে যায়নি?

—গিয়েছি ত। ওঁরা আসছেন। আর জানো মা, আয়েষার নাকি বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে। নতুন ডাক্তার সাহেবের সাথে। বলতে বলতে কনখলের মুখ লজ্জারাঙা হয়ে ওঠে। নিভা বলেন,—আরে বিয়ের কনে আয়েষা, তুই অমন মুখ চোখ সিঁদুরে করছিস্ কেন? কোন জবাব না দিয়ে কনখল নিজের ঘর গুছোতে যায়।

ইতিমধ্যে জাফর ডাক্তারের গাড়ী কম্পাউণ্ডে ঢোকে। বোরখা ঢাকা দুটি নারী খিড়কি দিয়ে অন্দরে যান। জাফর বারান্দার আড্ডায় এসে বসেন। কুশল সম্ভাষণাদি শেষ হলে জাফর কথাটা তোলেন।—আরে বাগচি সাহেব, আয়েষা মাই-র বিয়ে প্রায় ঠিক্ হয়ে গেল যে। নতুন যে সিভিল সার্জন এসেছে লেঃ আব্বাস, তার সাথে। ঢাকার নবাব গুষ্টির সাথে কি যেন দূর সম্পর্ক আছে, চেহারাটিও ভালো।

বাগচি বলেন—কিন্তু বয়েসে বেমানান হয়ে যাবে না?

—হ্যাঁ,—তা—তবে সেটা এমন বেশী কিছু নয়। আয়েষা প্রায় পনেরয় পড়ছে, আর আব্বাস প্রায় চব্বিশ পঁচিশ। ওটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। বিয়ে হলেও আয়েষা কনভেণ্টে পড়বে, বলেছে ক্যাপটেন ডাক্তার সাহেব।

—তাহলে ত খুব উদার মতাবলম্বী হে জাফর।

—বিলেত ফেরৎ কিনা, চায় যে স্ত্রীও ইংরেজি জানা কেতাদুরস্ত মেয়ে হয়।

—আচ্ছা, এ বিয়ের যোগাযোগ ঘটল কি করে?

—সে এক মজার ব্যাপার। নতুন ডাক্তার সাহেব আমার হাসপাতাল ইন্‌স্‌পেক্‌সনে আসবেন। উনি যখন টিলায় উঠেছেন, মনে আছে তোমার পুরোনো বাংলার পিছে অনেক কটা ছোট বড় গাছ আছে? সেই যেখানে কনা আর আয়েষা হরিয়াল মেরেছিল? তারই একটা গাছে হ্যামক টাঙিয়ে আয়েষা দুলে দুলে বই পড়ছিল। শিক্ষিত সভ্য লোক—হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখবার মতো অভ্যতা করেন নি। হাসপাতালে তদারক শেষে যাবার সময় আমায় খালি জিজ্ঞেস করলেন যে দোলনায় বসে যে মেয়েটি বই পড়ছে, সে কে। আমি বললুম যে আমার একমাত্র সন্তান। তারপর থেকে ডাক্তার সাহেবের কাজে অকাজে আমার ওখানে আসা বেড়ে গেল। একদিন, বোধ হয় দিন দশেক পর, মুখ ফুটে নিজেই বিয়ের প্রস্তাব করলেন।

হৃষিকেশ মনে মনে ভাবেন, এ যে রীতিমত রোম্যান্স। আয়েষা মেয়ের মতো, তাই মুখে কিছু বলেন না।

হরেন চাকী ও বিদ্যাভূষণ প্রায় এক সাথেই বলেন,—এত সর্বাংশে যোগ্য বিয়ে। আয়েষার মতো অপূর্ব সুন্দরী ও সম্বংশের মেয়ের উপযুক্ত পাত্র। আমরা বড়ো খুশী হয়েছি ডাক্তার জাফর।

ওদিকে বাড়ীর মধ্যেও ঘটিনাটি আলাপচারী হয়। আয়েষা কনখলের ঘরে, কাজেই খোলাখুলিই নিভাননী বলেন,—হ্যাঁরে, এ ত প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়ে বিয়ে। তার ওপর ঘর বর দুইই ভালো। রূপে গুণে আমার আয়েষার তুলনা নেই। তুই ভাগ্যবতী, কুলসম।

কনখলের ঘরে আয়েষা পড়ার চেয়ারে বসে। কনখল খাটের ওপর। এ ওর দিকে মাঝে মাঝে তাকায় আবার মুখ নীচু করে। কেউ কথা কয় না। মনে মনে কত কথার আদান প্রদান হয় অনুচ্চারিত ভাষায়, ওদের ভাবভঙ্গী দেখলেই বোঝা যায়। এ বই সে বই নাড়ে আয়েষা, খানিক পর স্তব্ধতা ভেঙে যেন জোর করে সহজ হবার চেষ্টায় বলে—কিরে বাঁদর, ধন্দ ধরে গেলি কেন? ছুটি কাটিয়ে এলি দেশে, গল্পটল্প কর।

ড্যাবডেবে চোখে আয়েষার দিকে তাকিয়ে কনখল হাসে। করুণ সে হাসি। হঠাৎ কাঁধ ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। যে আবেগ ঠেলে ঠেলে উঠ্‌ছিলো বুক থেকে গলা পর্যন্ত, ঝাঁকি দিয়ে দাবিয়ে দেয় তাকে। তারপর খুব সহজভাবে আয়েষার হাত ধরে বলে,—চল পুকুর পারে যাই। ছুটির অনেক গল্প আছে, সব বলি গে চল।

চোরাবালির গল্প শুনে আয়েষার গাম্ভীর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। ঠিক আগেকার মতো ওকে বুকে বেঁধে, চুমো খেয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়। ভালো লাগা আর ভালোবাসার বিভেদ রেখা বড় লাজুক, কখন কিসের ছোঁয়া লেগে সে রেখা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কেউ বলতে পারে না। দুজনে গালে গাল ঠেকিয়ে জড়াজড়ি করে অনেকক্ষণ বসে থাকে। মায়ের ডাকে যখন উঠে আসে অপরিসীম তৃপ্তিতে দুজনেরই বুক ভরে থাকে।

[ক্রমশঃ]

নৈরাজ্যবাদ : বিপ্লবযুগ

অতীন্দ্রনাথ বসু

১৮৭১ সাল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ধর্মরাজের জয় হল কিন্তু ধর্মরাজ্যের পত্তন হল না। ইটালী ও জার্মানী রাষ্ট্রীয় ঐক্য লাভ করল, ইটালী ও ফ্রান্স স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত হল, জয়ী হল জাতীয়তা ও গণতন্ত্র কিন্তু জনতার দুঃখমোচন হল না, জনতার অধিকার অর্জিত হল না। সামন্ততন্ত্রের দুর্গপ্রাকার ধূলিসাৎ করে চলে গেল বিপ্লবের ঝড়, তার ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উঠল ধনতন্ত্রের সাতমহলা কুঠি, সমাজতন্ত্রের স্বপ্নসৌধ হতবাক্ সংগ্রামীর চোখের সামনে মিলিয়ে গেল।

বিধাতা এই নিষ্ঠুর তামাসাটি খেললেন যে ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবলম্বন করে সেটি হল প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়। এর আশু পরিণাম প্রাশিয়ার নেতৃত্বে জার্মান যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম, ইটালীর রাষ্ট্রীয় একায়নের সমাপ্তি, ফ্রান্সে একনায়কত্বের অবসান। তৃতীয় নেপোলিয়নের জায়গায় রাজতন্ত্র অথবা গণতন্ত্র বসবে তা যখনো স্থির হয় নি, প্যারি যখন জার্মান সেনাদ্বারা বেষ্টিত ও ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন তখন সমাজবাদী, নৈরাজ্যবাদী ও উগ্র প্রজাতন্ত্রবাদীরা মিলে প্যারিতে এক স্বায়ত্ত কমিউন বা শ্রমিকতন্ত্র স্থাপন করল। এরা অন্যান্য শহরগুলিকেও আহ্বান করল বুর্জোয়া শাসন উচ্ছেদ করে প্যারির সঙ্গে যুক্ত হবার জন্যে। এর আগেই বাকুনিনের পরিচালনায় লিয়ঁতে কমিউন গঠিত হয়, মার্সাই, তুলু প্রভৃতি গুটিকয়েক শহরেও অনুরূপ বিপ্লব ঘটল কিন্তু একটিও টিকল না। অবশেষে বিজয়ী জার্মান সেনা অবরোধ তুলে নেবার পর ভার্সাই থেকে এল ফরাসী জাতীয় মহাসভার ফৌজ, প্যারি অবরুদ্ধ হল দ্বিতীয়বার। প্যারিকে বাঁচাবার সাধ্য ক্ষুদ্র বিপ্লবী সেনার ছিল না। ২৬শে মার্চ থেকে ২১শে মে (১৮৭১) পর্যন্ত দু'মাসের মিয়াদের পর কমিউন বিধ্বস্ত হল, ভার্সাই সেনা নগরীতে প্রবেশ করল। গৃহযুদ্ধের উত্তাল তরঙ্গে ডুবে গেল এই অভিনব গণবিপ্লব। ক্ষণজীবী প্যারি কমিউনের সাথে সাথে কমিউনিস্ট ও এনার্কিস্টদের আশা ভরসা বিলুপ্ত হল, ফ্রান্সে বহাল হল বুর্জোয়া গণতন্ত্র।

কুরুক্ষেত্রের রণপর্বের পর ব্যাসদেব লিখেছিলেন শান্তিপর্ব, শ্মশানের মহাশান্তি নিয়ে। উনিশ শতকের শেষ পাদে বিপ্লবপীড়িত ইয়োরোপের কপালেও শান্তি জুটেছিল, জার্মানীতে কাইজারতন্ত্রের আর রাশিয়ায় জারতন্ত্রের শান্তি। জার্মানীর সমরনায়কেরা গোটা জাতিকে দাস বানিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তারের লোভে আত্মহারা হল—ইয়োরোপের আকাশে এই ধূমকেতুর আবির্ভাব বাকুনিনের দৃষ্টি এড়ায় নি। রুশ সরকার সন্ত্রাসবাদের জবাবে বিপ্লবীদের নির্যাতন করে ক্ষান্ত হলেন না, সকল প্রকার স্বাধীন চিন্তার ও স্বাধিকারবোধের মূলোচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। ফ্রান্স, ইটালী ও স্পেনের গণতান্ত্রিক সমাজবাদী দলগুলিও নতুন রাস্তার নিশানা দিতে পারল না, তাদের নিস্তেজ বাক্‌সর্বস্ব প্রতিরোধে সাধারণ মানুষের মন সাড়া দিল না। কলকারখানার দৌলতে দেশে দেশে উৎপাদন বাড়ল, সম্পদ জমল কিন্তু কুলিমজুরের কপালে ধনিকের উচ্ছিষ্টও জুটল না। বিপ্লব হল, গণভোট নির্বাচন ও দায়িত্বশীল সরকার নিয়ে এল স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র, যুগ বদলাল কিন্তু মানুষের ভাগ্য বদল হল না। একের বদলে এল আর এক হুজুর, আর এক মালিক। এই যখন

ইয়োরোপের অবস্থা সেই সময়ে আশার ভাণ্ড শূন্য করে বাকুনিন মৃত্যুশয্যায় শয়ান হলেন আর রুপটাকন শুষ্ক সলিতার নিভন্ত দীপশিখাটি আগলে অন্ধকারে পথ খুঁজতে লাগলেন।

ইতোমধ্যে নৈরাজ্যবাদের চিন্তাধারা ফ্রান্স, সুইৎজার্ল্যাণ্ড ও রাশিয়ার সীমানা পেরিয়ে দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। বাকুনিন স্পেনবাসীদের উদ্দেশ্যে একটি ইস্তাহার প্রচার করে তার পিছনে ফানেলি নামে একজন বিশ্বস্ত দূতকে স্পেনে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর চেষ্টায় ক্যাটালানিয়া ও বার্সিলনায় ঘাঁটি তৈরী হল। ইটালীতে নিরাজমন্ত্র নিয়ে এলেন কার্লো ক্যাফিরো ও এনারিকো মালাতেস্তা। মিলান থেকে নেপ্‌ল্‌স পর্যন্ত জায়গায় জায়গায় জোট গজিয়ে উঠল। ১৮৭৬ সালে বাকুনিনের মৃত্যুবৎসরে সুইৎজার্ল্যাণ্ডের বার্ন শহরে একটি আন্তর্জাতিক এনার্কিস্ট কংগ্রেসের অধিবেশন হল। এখানে কাফিরো ও মালাতেস্তা সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তাব পাস করালেন। পরের বছর তাঁরা নেপ্‌ল্‌স্-এর বেনেভেন্তোর আশপাশে চাষীদের ক্ষেপিয়ে কিছু গোলমাল সৃষ্টি করলেন বটে কিন্তু এ বিদ্রোহ ঠাণ্ডা করতে ইটালীর সরকারকে বেগ পেতে হয় নি।

১৮৭৯ সালে পরবর্তী কংগ্রেসের অধিবেশন হল সুইস জুরার লা শো-দ্য-ফঁ নামক স্থানে। এখানে খোলাখুলিভাবে প্রস্তাবিত হল 'কাজের দ্বারা প্রচারের' নীতি, রাষ্ট্রনায়কদের হত্যা করে বিভীষিকা সৃষ্টি করবার নীতি। ১৮৮১ সালে আরো তোড়জোড় করে লণ্ডনে আবার এক বৈঠক বসল, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইটালী, স্পেন, জার্মানী, অস্ট্রিয়া, সুইৎজার্ল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রতিনিধি এল, কিন্তু কংগ্রেস কোন কার্যকরী সিদ্ধান্তে আসতে পারল না।

আসলে রামরাজ্যের রঙীন চিত্র ছাড়া তাদের দেবারও কিছু ছিল না। জ্যাঁ গ্রাভের 'মুমূর্ষু সমাজ ও নৈরাজ্য' এবং চার্ল মালাতোর 'নৈরাজ্যবাদের দর্শন' এই চিত্রের ওপর দাগা বুলানো ছাড়া আর কিছু নয়। স্বর্গলোকে পৌঁছবার জন্যে মর্তলোকের কোন কর্মসূচী তাঁরা দিতে পারেন নি, কিন্তু তাঁদের বিচারধারা থেকে একটা সূত্রের প্রতিপাদন হল অনায়াসে—যদি আইন ও কর্তৃত্ব অন্যায় হয় তা হলে তাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ ন্যায়সঙ্গত। অবশ্য বলপ্রয়োগ হবে দেশব্যাপী, তার আগে কোথাও না কোথাও তাকে শুরু করতে হবে। দেশলাই কাঠির ছোট্ট একটু আগুন না জ্বাললে ঘর পোড়ে না। তেমনি গুপ্তহত্যার স্ফুলিঙ্গ না তুললে কোনকালে সর্বগ্রাসী হিংসার দাবানল জ্বলবে না। বাকুনিন ও নিহিলিস্টরাও হত্যা ও হিংসার পথে নেমেছিলেন। কিন্তু তাঁদের হত্যা ছিল বিপ্লবী দর্শন ও কার্যক্রমের অঙ্গ। ফ্রান্স, ইটালী ও স্পেনের হতাশার অন্ধকারে যারা হত্যার সুড়ঙ্গপথে পা বাড়াল নৈরাজ্যবাদের তত্ত্বমা আটলেও তাদের মাথায় কোন বিপ্লববোধ ছিল না। 'কাজের দ্বারা প্রচারের' গরম গরম বুলি তাদের দুর্বল মগজে জট পাকিয়ে বসল, বংশধারা ও পতিত জীবনের অপরাধবৃত্তি বিকৃত মস্তিষ্কের খেয়ালকে আমন্ত্রণ করল বিচার বিবেকহীন নরহত্যার উৎসবে।

নৈরাজ্যবাদের নামে বেপরোয়া খুনখারাবির পিছনে যে মনোবৃত্তি ও সমাজপরিবেশ কাজ করছিল এদের দু' একজনের পরিচয় দিলে তা বোধগম্য হবে। ফ্রান্সে লোয়ার নদীর উপত্যকায় একটি মিলমজুরের বস্তিতে রাবাচল মানুষ হয়েছিল। এক রঞ্জকের দোকানে সামান্য বেতনে সে কাজ করত। কোন কারণে মালিক তাকে বরখাস্ত করে। কোথাও কাজ না পেয়ে সে চুরি ডাকাতি শুরু করল। এ কাজের সমর্থনে নৈরাজ্যবাদী প্রচারপত্র থেকে সে

একটি যুক্তিও খাড়া করল। ১৮৮৬ সাল থেকে ১৮৯২ সাল পর্যন্ত নানাস্থানে নিরীহ লোকেদের খুন করে ও নিরর্থক বোমা ফাটিয়ে সে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। অবশেষে সে ধরা পড়ে এবং তার ফাঁসি হয়। মৃত্যুর পর কোন কোন নৈরাজ্যবাদী পত্রিকায় সে শহীদের সম্মান লাভ করল।

ফ্রান্সের অগস্ত ভাইয়াঁ ছিল মায়ের অবৈধ সন্তান। শিক্ষাদীক্ষা তার কিছুই হয় নি। চৌদ্দ বৎসর বয়সে নিঃসম্বল অবস্থায় তাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হল। কিন্তু এখানে সেখানে দৌড়দৌড়ি সার হল, সে পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেল না। একটু শান্তির আশায় সে ঘর বাঁধল কিন্তু স্ত্রী একটি শিশুকন্যাকে ফেলে ঘর ভেঙে পরম শান্তির আশ্রয়ে চলে গেল। ভাইয়াঁর কোন বদখেয়াল ছিল না, কাজে কর্মে তার আগ্রহ ছিল যথেষ্ট, তবু কেন তার এই দুর্ভোগ তার কোন মানে সে খুঁজে পেল না। সে স্থির করল অভিশপ্ত জীবন আর রাখবে না কিন্তু কারও না কারও ওপর প্রতিশোধ নিয়ে একটা আদর্শের জন্যে মরতে হবে। শুধু শুধু সে মরবে না। নৈরাজ্যবাদী পুস্তিকায় আদর্শের সন্ধান পাওয়া গেল। ১৮৯৩ সালে ফ্রান্সের বিধান সভায় দর্শকদের মঞ্চ থেকে সে বোমা ছুড়ল। বিচারে তার প্রাণদণ্ড হল এবং সে শহীদের বরমাল্য লাভ করল।

লুইগি লুচেনির জন্ম হয় পারিতে। সেও জারজ সন্তান। জন্মের কিছু পরেই মা তাকে ফেলে চলে যায় এবং সে ইটালীতে পার্মার এক অনাথ আশ্রমে মানুষ হয়। বাল্য বয়সে সে মজুরের কাজে ভর্তি হল। এ কাজ তার ভাল লাগল না। কাজ ছেড়ে সে রাস্তায় নামল। বেকার ভবঘুরে জীবনে নানা উৎকট চিন্তা মাথায় ঘুরত। একটা কিছু করে চমক লাগাবার নেশা তাকে পেয়ে বসল। ১৮৯৮ সালে সে অস্ট্রিয়ার সম্রাট্ ফ্রান্সিস জোসেফের রানী এলিজাবেথকে হত্যা করে মনের সাধ মেটাল।

এই হতভাগ্য বেকারের দল যারা সমাজে পতিত, যাদের বেঁচে থাকবার অধিকারও স্বীকৃত নয়, যাদের কঙ্কালের ওপর হৃদয়হীন আমলাতন্ত্র তার ঠাটঠমক জাঁকিয়ে বসেছে তাদের কাছে ন্যায় অন্যায়ের মূল্যবোধ কতটুকু? তাদের মনের দুয়ারে ঘা দিল রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও বুর্জোয়া নীতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধে নৈরাজ্যবাদীদের জেহাদ,—'কাজের দ্বারা প্রচারের' নীতিতে তারা খুঁজে পেল তাদের হিংসাবৃত্তির সমর্থন। তা বলে এ কালের সকল হিংসাত্মক কাজের পিছনে যে নৈরাজ্যবাদী মন্ত্রণা ছিল তা নয়। ফ্রান্স, ইটালী ও স্পেনে অনেক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে যার সঙ্গে কোন রাষ্ট্রদর্শনের সম্পর্ক ছিল না। তার কারণ এসব দেশে গণতান্ত্রিক শাসনে সাধারণ লোক কোন সামাজিক অধিকার পায় নি, তাদের দুর্গতির কোন উপশম হয় নি। কোন ধ্বংসাত্মক মতবাদের চেয়ে এই সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিবেশই এই অপরাধগুলির জন্যে বেশী দায়ী।

কিন্তু দুর্নামের কলঙ্কটুকু লেগে রইল নৈরাজ্যবাদের গায়। রক্ষণশীল কাগজগুলির অবিরাম প্রচারের ফলে নৈরাজ্যবাদ হয়ে দাঁড়াল গুপ্তহত্যা ও ষড়যন্ত্রের নামান্তর। তার ওপর দেশে দেশে চলল অবাধ দমননীতির মহড়া। ফলে সাচ্চা ও ঝুটার তফাত চলে গেল, যারা ছিল আদর্শনিষ্ঠ নৈরাজ্যবাদী তাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল।

এদিকে ইয়োরোপের চেহারা বদলে যাচ্ছিল খুব দ্রুত। শিল্পবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মজদুর শ্রেণী সঙ্ঘবদ্ধ হল, ঘোরাল হয়ে উঠল শ্রেণী সংগ্রাম। গণতান্ত্রিক সমাজবাদীদের বৈধানিক পন্থায় নির্ভর না করে তারা নিজেদের পাওনা আদায়ের জন্যে কোমর বেঁধে দাঁড়াল। এই ঘনায়মান শ্রেণী সংগ্রামকে অবলম্বন করে, শ্রমিক সঙ্ঘগুলিকে কেন্দ্র করে নৈরাজ্যবাদের

নবরূপায়ন হল, অন্ধকারের মধ্যে জ্বলে উঠল দীপশিখা, তার আলোয় মেহনতী জনতা দেখতে পেল নিঃশোষণ সমাজের ছবি।

১১। সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্

ফরাসী সিণ্ডিকেট্ বা মজুর ইউনিয়ন থেকে সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্ কথার উৎপত্তি। নৈরাজ্যবাদের নূতন ভিত্তি হল শ্রমিক ইউনিয়ন এবং কর্মপন্থা হল শ্রমিক সংগ্রাম। ইউনিয়ন কেবল লড়াইয়ের হাতিয়ার নয়, ইউনিয়ন হবে ভবিষ্যৎ সমাজের কাঠাম। প্রুদ'র যুক্তকরণের নীতি অনুসরণ করে ইউনিয়নগুলি পরস্পর চুক্তি করবে, মাঠে খনিতে কারখানায় তারা উৎপাদনের কাজ পরিচালন করবে, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সরিয়ে আনবে শ্রমতান্ত্রিক সমাজ। যারা পরিশ্রম করে না, সমাজে যাদের কোন কাজ নেই, শ্রমতান্ত্রিক সমাজে তাদের জায়গা হবে না। যারা সমাজের খোরপোষ জোগায় সমাজ তাদের—এইটেই সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্-এর মোদ্দা কথা। এতদিন সমাজবাদ ও নৈরাজ্যবাদ ছিল বুদ্ধিজীবীর কপোলকল্পনা, এবার তাদের প্রতিষ্ঠা হল শ্রমজীবীর কর্মশালায়। সমাজবাদীরা এতকাল মজদুর ইউনিয়নকে কাজে লাগিয়েছে ক্ষমতা করায়ত্ত করবার ফিকিরে, সমাজতান্ত্রিক বিধানে তাদেরকে কোন স্থান দেয় নি। মার্কস্ এবং তাঁর অনুচররাও শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণীচেতনা জাগিয়ে তোলার বেশী ইউনিয়নের কোন ভূমিকা দেখতে পান নি এবং তাঁদের শ্রেণীহীন সমাজে ধনতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়নগুলিরও বিলোপ প্রতিশ্রুত হয়েছে।

১৮৬৯ সালে বাসেলে শ্রমিক আন্তর্জাতিকের চতুর্থ অধিবেশনে এই মতের প্রতিবাদ হল। বেলজিয়াম প্রতিনিধি ইউজেন হিন্‌স্ একটি ইস্তাহার পেশ করলেন, সুইস্ জুরা ও ফরাসী প্রতিনিধিদের সমর্থনে সেটি গৃহীত হল। এই ইস্তাহারের মর্মে একটি প্রস্তাব পাস হল :

> এই কংগ্রেস ঘোষণা করিতেছে যে শ্রমিকরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রতিরোধ সঙ্ঘ গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে। একটি ট্রেড ইউনিয়ন খাড়া হওয়া মাত্র ইউনিয়নগুলিকে জানাইতে হইবে যাহাতে এক এক শিল্পে একটি করিয়া জাতীয় শ্রমিক সংহতি গড়িয়া উঠিতে পারে। জাতীয় সংহতিগুলির কর্তব্য হইবে আপন আপন শিল্প সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা। যৌথভাবে প্রতিকার-সাধনের পথ দেখান এবং সেই পরামর্শ অনুসারে যাহাতে কাজ হয় সেদিকে নজর রাখা—যাহাতে অন্তিমে বর্তমান অন্নদাস প্রথা দূর হইয়া মুক্ত মজদুরদের একটি ফেডারেশন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

উৎপাদন পরিচালনা যাতে এককালে শ্রমিকশ্রেণীর হাতে আসে তার প্রস্তুতির জন্যে শ্রমিক পরিষদ গড়বার প্রস্তাবও এই কংগ্রেসে হয়। কিন্তু ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ার যুদ্ধ ও পারি কমিউনের পতনে সব জল্পনা কল্পনা বরবাদ হয়ে গেল।

যদিও যন্ত্রশিল্প ও তার আনুষঙ্গিক শ্রমিক ইউনিয়নের জন্ম হয় ইংল্যাণ্ডে তবু সিণ্ডিক্যালিস্ট মত ও বিশ্বাস পরিপুষ্ট হল ফ্রান্সের জলহাওয়ায়। তার কারণ ফ্রান্সে দলীয় রাজনীতি এতদূর দূষিত হয়েছিল যে সরকার ও সরকারী ব্যবস্থায় কারও আর আস্থা ছিল না। কুখ্যাত দ্রেফুর মামলা এর একটি বিশিষ্ট নজির। ১৮৯৪ সালে আলফ্রে দ্রেফু নামে একজন ইহুদী সামরিক অফিসারের বিরুদ্ধে বিদেশে গোপনীয় সংবাদ

পাঠাবার অভিযোগ আনা হয়। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও সামরিক আদালতে তিনি যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডিত হলেন। লোকসমক্ষে চূড়ান্ত অপমানের পর তাঁকে দক্ষিণ আমেরিকার একটি অস্বাস্থ্যকর দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হল। দু'বছর পরে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের কর্তা কর্নেল পিকার আবিষ্কার করলেন যে দলিলটির ওপর নির্ভর করে দ্রেফুসকে সাজা দেওয়া হয়েছিল আসলে সেটি দ্রেফুর লেখা নয়, সেটির হস্তাক্ষর আর একজনের। সমরবিভাগের কর্তারা খুশী হলেন না, তাঁরা পিকারকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় বসালেন কর্নেল হেনরি নামে এক অফিসারকে। কিন্তু লোকের মুখ বন্ধ হল না। একটা সাংঘাতিক রকমের অবিচার হয়েছে এরকম আশঙ্কা চারিদিকে মুখর হয়ে উঠল। প্রতিবাদের মুখপাত্র হলেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক এমিল জোলা। ন্যায়বিচার দাবি করার অপরাধে তাঁর কারাদণ্ড ও জরিমানা হল।

এর অল্প পরে হেনরির এক জালিয়াতি ধরা পড়ল এবং সে আত্মহত্যা করল। দ্রেফুর নির্দোষিতার আর একটি প্রমাণ পেয়ে ফরাসীরা ক্ষেপে উঠল। সামরিক কর্তারা তাঁর পুনর্বিচার করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু মর্যাদা খোয়ানো বড় কঠিন। আদালত তাঁকে বেকসুর খালাস না করে দণ্ডের মিয়াদ কমিয়ে করল দশ বৎসর, আর রাষ্ট্রপতি তাঁকে মাপ করে মুক্তি দিয়ে জিদের মর্যাদা ও ন্যায়বিচারের সামঞ্জস্য করলেন। দ্রেফুর সমর্থকরা দাবি করল ক্ষমা নয় দোষ খণ্ডন। অবশেষে এ দাবি মানতে হল। ফ্রান্সের সদর আদালত সামরিক আদালতের রায় নাকচ করে ঘোষণা করল দ্রেফুর বিরুদ্ধে সাজানো অভিযোগ ভিত্তিহীন।

ফ্রান্সের ইতিহাসে দ্রেফুর বিচারপর্ব এক দুরপনেয় কলঙ্ক। সামরিক আদালতের অবিচার ও অসাধুতার চেয়েও যা বেশী লজ্জাকর সে হল রাজনৈতিক নেতা ও দলগুলির ভূমিকা। দলীয় স্বার্থ ও নেতৃত্বের লোভ মানুষকে কত নীচে নামাতে পারে এই ঘটনায় তার পরিচয় পাওয়া গেল। সমরবিভাগের সঙ্গে যে সব ক্যাথলিক, ইহুদীবিদ্বেষী ও রাজতন্ত্রবাদীরা হাত মিলিয়েছিল তাদের উদ্দেশ্য ছিল প্রজাতন্ত্রকে বেইজ্জত ও ঘায়েল করা। এই ষড়যন্ত্রের সামনে ন্যায়বিচার ও আইনের মর্যাদারক্ষার জন্যে প্রজাতন্ত্রবাদীরা দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারে নি। তাদের নীতিহীন ও মেরুদণ্ডহীন আচরণে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের বনিয়াদ শিথিল হয়ে গেল।

সমাজতন্ত্রী নেতারাও কোন সদ্‌দৃষ্টান্ত রাখতে পারল না। সমাজবাদ ও সুবিধাবাদের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে বের করা দুরূহ হয়ে উঠল। ১৮৯৯ সালে বিধানসভায় নির্বাচিত সমাজবাদী নেতা আলেকজাণ্ডার মিয়েরাঁ দলত্যাগ করে বিরোধী দলের মন্ত্রীসভায় স্থান করে নিলেন, শ্রেণীসংগ্রাম ছেড়ে শান্তির নামাবলী গায় দিলেন। এর পরে রাজনৈতিক নেতাদের ওপর সকল ভরসা খুইয়ে সিণ্ডিক্যালিস্টরা শ্রমিকদের নিজেদের শ্রেণীসংস্থার ওপর নির্ভর করতে আহ্বান করল।

ফ্রান্সে সিণ্ডিক্যালিজম্‌-এর জন্মবৃত্তান্ত খুঁজলে যেতে হয় ১৮৮৬ সালে যখন শ্রমিক ইউনিয়নগুলির ওপর থেকে আইনের নিষেধ প্রত্যাহার করা হল। ১৮৯২ সালে ফার্নাদঁ পেলুতিয়ের নেতৃত্বে তৈরী হল বুর্সে দু ত্রাভাই নামে একটি মজদুর ফেডারেশন। এক অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন শিল্পের মজুর ইউনিয়নগুলি মিলিত হয়ে গড়ল বুর্সে, নানা অঞ্চলের বুর্সে একজোট হয়ে গঠিত হল বুর্সে দু ত্রাভাই। মালিকের হয়ে চেম্বার অব কমার্স যে কাজ করে মজুরের হয়ে বুর্সে দু ত্রাভাই করে সে কাজ। এ রাজনীতির ধার

ধারে না। এর কাজ ইউনিয়নকে মজবুত করা আর সাধারণ ধর্মঘট এবং অন্যান্য উপায়ে শ্রমিকের লড়াই চালিয়ে যাওয়া। এর সংগঠন প্রুদঁর পরিকল্পিত বিকেন্দ্রায়ন ও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

সকল শিল্প ও শিল্পাঞ্চল এই সংগঠনের সামিল হয় নি। খনিমজুর, বস্ত্রমজুর, ছুতারমিস্ত্রি এরা সব যার যার জাতীয় ফেডারেশন করে বসেছিল। ১৮৯৫ সালে এদের একত্র করে আর একটি শ্রমিক সংস্থা গঠিত হল—ক'ফেদেরাশিয়' জেনেরাল দু ত্রাভাই। বুর্সে ছিল চরমপন্থী, ক'ফেদেরাশিয়' কিছুটা নরমপন্থী। উভয়ের মিলনের এই অন্তরায়-টুকু দূর হল দ্রেফুর মামলা ও মিয়েরাঁর দলত্যাগের ফলে। ফ্রিফুয়েলে প্রমুখ বামপন্থী সমাজবাদীরা এবং পুজে ও দেলেসালে প্রমুখ নৈরাজ্যবাদীরা ক'ফেদেরাশিয়'তে যোগ দিয়ে একে সংস্কারমুক্ত করলেন। এঁদের আন্দোলনের ফলে বৈপ্লবিক কর্মপন্থার ওপর দুই সংগঠনের ঐক্য সাধিত হল। ১৯০২ সালে বুর্সে ক'ফেদেরাশিয়'তে যোগদান করল।

ক'ফেদেরাশিয়' বা সিজিটি আসলে একটি সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। এতে প্রত্যেকটি ইউনিয়ন ও বুর্সের স্বাতন্ত্র্য সুরক্ষিত। প্রত্যেকটি ইউনিয়নকে দুটি ফেডারেশনে ঢুকতে হয়। একবার এক অঞ্চলের অন্যান্য শিল্পের ইউনিয়নের সঙ্গে মিলে জুটতে হবে স্থানীয় বুর্সের সঙ্গে, স্থানীয় বুর্সেগুলি যুক্ত হবে তাদের ফেডারেশনে, আর একবার অন্যান্য অঞ্চলের সমশিল্পের ইউনিয়নগুলির সঙ্গে মিলে সেই শিল্পের জাতীয় ফেডারেশনের সামিল হতে হবে। আঞ্চলিক প্রীতি ও বৃত্তিগত স্বার্থ উভয়ের সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে এই ব্যবস্থা। দুই ফেডারেশনের ইমারত উঠেছে তলা থেকে উপরে, ইউনিয়নগুলির স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতায়, স্বার্থের সমতা ও বিশ্বাসের একতা ছাড়া তাদের আর কোন বন্ধন নেই। এই বিকেন্দ্রিত সংগঠনে শ্রমিক শ্রেণী একাধারে পেল তাদের লড়াই-এর হাতিয়ার এবং ভবিষ্যতের মুক্তসমাজের কাঠাম।

১৯০৪ সালে মোট সংঘবদ্ধ মজদুরের মধ্যে শতকরা ২০·৯ জন ছিল সিজিটির সভ্য আর মোট ইউনিয়নের শতকরা ৪২·৪টি ছিল সিজিটির অন্তর্গত। ১৯১০ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয় শতকরা ৩৬·৬ ও৫৭·১[১] সংখ্যার অনুপাতে এর শক্তি ছিল বেশী কারণ গুরুত্বপূর্ণ ইউনিয়নগুলি প্রায় সবই সিজিটিতে ভর্তি হয়েছিল।

সিণ্ডিক্যালিজম্‌-এর মতবাদ ও পথনির্দেশ রচিত প্রুদঁর নৈরাজ্যবাদ ও মার্কস্‌-এর শ্রেণীসংগ্রামের মিশ্রণে। প্রুদঁর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে স্বাধীনতা ও যুক্তকরণের আদর্শ, মার্কস্‌-এর কাছ থেকে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিতান্ত্রিক সংগ্রামের পদ্ধতি। ধনতন্ত্র ও তার হাতিয়ার রাষ্ট্রকে একসঙ্গে নিপাত করা এর লক্ষ্য। এ কাজ রাজনৈতিক দলের নয়। সরেল ও তাঁর শিষ্য লাগার্দেল রাজনৈতিক দল ও অর্থনৈতিক শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। সমাজবাদী দল বিভিন্ন স্তরের লোক নিয়ে তৈরী একটা জগাখিচুড়ি, এদের চিন্তায় ঐক্য আছে বটে কিন্তু স্বার্থের মিল নেই। তারা দল করে কারণ রাজনীতি তাদের নেশা, রাজনীতিতে তাদের অহংকার মেটে ও স্বার্থসিদ্ধি হয়। পক্ষান্তরে শ্রেণী সমস্তরের লোক নিয়ে তৈরী, তাদের স্বার্থ এক, যার বন্ধন মতবাদের চেয়ে দৃঢ়।[২]

দলের দুর্বলতার একটি জ্বলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত জার্মানীর সোস্যাল ডিমক্র্যাট দল।

---

[১] জে. এ. এসটে : রিভলিউশনারী সিণ্ডিক্যালিজম্‌, লণ্ডন, ১৯১৩, ৪৬ পৃষ্ঠা।
[২] য়ুবের লাগার্দেল : সার্দিকালিজম্‌ এ সোসিয়ালিজম্‌, ৪৫ পৃষ্ঠা।

১৯৩২ সালে ডায়েটে তাদের বল ছিল দ্বিতীয়। তাদের পক্ষে ছিল এক কোটি কুড়ি লক্ষ ভোটার আর হাতে ছিল ষাট লক্ষ ইউনিয়ন মজদুর। প্রাশিয়ার যুক্তসরকারে তারা ছিল প্রধান দল এবং মন্ত্রীসভায় নেতৃত্ব ছিল তাদের। তা সত্ত্বেও যখন ভন প্যাপেন জার্মানীর চ্যান্সেলার হয়ে জুলাই মাসে জোর করে প্রাশিয়ার মন্ত্রীসভা ভেঙে দিলেন তখন তারা কোন বাধা না দিয়ে হাইকোর্টে আপীল করতে গেল। জার্মানীতে গণতন্ত্রের পতনের সূত্রপাত এই থেকে। হিটলার যখন ক্ষমতা করায়ত্ত করলেন তখন সমাজবাদী দল টু শব্দটি করল না এবং মাসকয়েকের মধ্যে তাদের ইউনিয়নগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

সিন্ডিক্যালিস্টদের কর্মপন্থা প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ যার মানে লড়াইর দায়িত্ব অপরের হাতে তুলে না দিয়ে মজুরদের নিজের হাতে রাখা। তাদের লড়াইর চূড়ান্ত কৌশল সাধারণ ধর্মঘট। চলতি ধর্মঘটের উদ্দেশ্য মজুরদের দাবিদাওয়া আদায় করা। সিন্ডিক্যালিস্টদের বিপ্লবী ধর্মঘটের উদ্দেশ্য ধনতন্ত্র ও ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র উচ্ছেদ করে শ্রমতন্ত্র প্রবর্তন করা। সুতরাং অন্য সকল উপায় ব্যর্থ হলে যে ধর্মঘটে নামতে হবে তা নয়, যখনই সুযোগ মিলবে তখনই এই অস্ত্রে শান দিতে হবে। এমিল পুজের কথায় বলতে গেলে "কাজের সমর্থন কাজে : ফল কি হবে তার খোঁজে দরকার নেই।"

সকলে একসঙ্গে না নামলে যে সাধারণ ধর্মঘট সম্ভব হবে না তা নয়। অল্প কয়েকজন লোকও কোমর বেঁধে নামলে ধনতান্ত্রিক বিধানকে অচল করতে পারে। পুজে দেখিয়েছেন যে গুটিকয়েক মৌলিক শিল্পে ধর্মঘট হলেই কাজ হাসিল হয়। খনিমজুররা যদি কয়লা তোলা বন্ধ করে, ডকমজুররা যদি জাহাজের মাল না নামায়, রেলমজুররা যদি মাল ও মানুষের চলাচল আটকে দেয় তাহলে একদিনের মধ্যে ধনিক অর্থনীতি বেসামাল হয়ে যাবে এবং বিপ্লব ঘটবে। মূল শিল্পগুলি রাষ্ট্রের হাতে আসার ফলে এই কৌশল আরো সুসাধ্য হয়েছে। "রাষ্ট্র মানুষের শরীরের মত ক্ষণভঙ্গুর, একটি মাত্র শিরা কেটে দিয়ে তাকে খতম করা যেতে পারে।"[৩]

সিন্ডিক্যালিস্ট দার্শনিকদের অগ্রগণ্য জর্জ সরেল (১৮৪৭-১৯২২) তাঁর রেফ্লেকসিয়ঁ স্যর লা ভিওলাঁস নামক গ্রন্থে (১৯০৮) সাধারণ ধর্মঘটকে নিয়ে একটা রোমাঞ্চকর দর্শন রচনা করলেন। তাঁর আসল বক্তব্য হল যে মানুষ সংগ্রামের প্রেরণা মতবাদ থেকে পায় না, পায় যুক্তিহীন বিশ্বাস থেকে। এক একটি কথায় এমন জাদু থাকে যে তার সামনে যুক্তি-তর্ক দাঁড়াতে পারে না।

> বড় বড় সামাজিক আন্দোলনে যাহারা শরিক হয় তাহারা সর্বদা স্বপ্ন দেখে যে যুদ্ধে তাহাদের জয় অবধারিত। এই বিশ্বাসগুলিকে আমি বলিতে চাই মিথ্; সিন্ডিক্যালিস্ট সাধারণ ধর্মঘট ও মার্কস্-এর সর্বনাশা বিপ্লব এই প্রকারের মিথ্।[৪]

আদিম খৃষ্টান ধর্ম, ষোড়শ শতকের রিফর্মেশন, আঠার শতকের ফরাসী বিপ্লব— যাবতীয় বিরাট জন-আন্দোলনের পিছনে আছে মিথের শক্তি, সুনিশ্চিত জয়লাভে যুক্তিহীন বিশ্বাসের শক্তি। যুক্তি দিয়ে এর থেই পাওয়া যায় না, কারণ এখানে সংগ্রামের উপজীব্যই হল অন্ধ বিশ্বাস। বিশ্বাস জোগায় সংকল্প ও সংগ্রামের বল। আর যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে

[৩] হার্বার্ট রীড : এনার্কি এন্ড অর্ডার, লন্ডন, ৫২ পৃষ্ঠা।

[৪] রেফ্লেকসিয়ঁ, অনুবাদ, টি. ই. হিউম, লন্ডন, ১৯২৫, ২২ পৃষ্ঠা। পরবর্তী পৃষ্ঠানির্দেশ বন্ধনীতে দেওয়া হল।

গড়া হয় ইউটোপিয়া, আদর্শ সমাজচিত্র, এতে মনের ক্ষুধা মেটে রক্তে নেশা ধরে না। দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমাজবাদ ছিল ইউটোপিয়ার আদর্শবিলাস। মার্কস্ অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের অন্ধ বিশ্বাস আমদানি করে সমাজবাদকে বৈপ্লবিক শক্তি দিলেন।

অযৌক্তিক হলেও মিথ্ অবৈজ্ঞানিক নয়। সমাজবিজ্ঞানের কাজ সামাজিক শক্তি-গুলিকে আবিষ্কার করা, আর বিপ্লবীর কাজ নতুন সমাজগঠনে সেগুলিকে প্রয়োগ করা। এক একটা মিথের পেছনে প্রচণ্ড সামাজিক শক্তি দানা বেঁধে ওঠে। যীশুখৃষ্ট আবার ফিরে এসে মানুষের মনের ময়লা মুছে ফেলবেন এই অলীক কল্পনা মধ্যযুগে কত সহিষ্ণুতা, কত বলিদানের খোরাক জুগিয়েছে। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার মায়ামন্ত্র হাজার হাজার লোককে পাগল করেছিল বলেই না ফরাসী বিপ্লবে সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ হতে পেরেছিল। আসন্ন প্রলিতারিয় বিপ্লবে সাধারণ ধর্মঘটেরও হবে এইরূপ ভূমিকা। শ্রমিকশ্রেণীর সকল আশাআকাঙ্ক্ষার নির্যাস নিয়ে উচ্চারিত হবে ধর্মঘটের জাদুমন্ত্র। যুক্তি দিয়ে, সম্ভাবনার মাপকাঠি দিয়ে এর যাচাই হবে না, শুধু দেখতে হবে এই মন্ত্র দিয়ে মজুরদের মাতিয়ে তোলা গেল কিনা।

মজুরদের সবচেয়ে বড় শত্রু রাষ্ট্র। চরম ক্ষমতা মুঠোর মধ্যে এনে, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচালনায় রাষ্ট্র পোপের চেয়েও শক্তিশালী একটা দানবিক পীড়নযন্ত্রে পরিণত হয়েছে। সিন্ডিক্যালিস্ট রাষ্ট্রকে শোধরাতে চায় না, চায় নাশ করতে। মার্কস্ অবশ্য তা চান নি। তিনি চেয়েছিলেন যতদিন না শ্রেণীস্বার্থের বিলোপন হয় ততদিন প্রলিতারিয় একনায়কত্বে রাষ্ট্রশক্তি বজায় থাকবে। মার্কস্ ধনতন্ত্রের বিস্তারকে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন, প্রলিতারিয় বিপ্লবের পথও ঠিক বাতলিয়েছেন, কিন্তু প্রলিতারিয় সংগঠন সম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছু জানতেন না এবং বলেনওনি, শ্রেণীসংগ্রামের যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তেও তিনি আসেননি।

> যে সকল ঘটনার সঙ্গে আজকাল আমরা পরিচিত মার্কস্-এর তাহা জানা ছিল না। ধর্মঘট কি ব্যাপার আমরা তাঁহার চেয়ে ভাল করিয়া জানি কারণ আমরা সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘকালব্যাপী অর্থনৈতিক সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সাধারণ ধর্মঘটের মিথ্ জনপ্রিয় হইয়াছে, মজদুরের মনে কায়েম হইয়া বসিয়াছে। মার্কস্-এর হতভাগ্য শিষ্যরা এতকাল ধরিয়া তাঁহার শাস্ত্রবাক্যের টিকা রচনা করিয়াছে। তার বদলে আমাদের উচিত তাঁহার দর্শনের অভাব পূরণ করা। (৩৪-৩৫)

নিশ্চয়ই মার্কস্ চান নি একদল সংখ্যালঘুকে সরিয়ে আর একদল সংখ্যালঘু সরকারের গদিতে বসুক। তাঁর ভক্তরা বুর্জোয়া বিপ্লবীদের দৃষ্টান্ত নকল করে ঠিক তাই চেয়েছে, শুধু বুর্জোয়াদের জায়গায় এনেছে শ্রমিকদের। বলপ্রয়োগ চাই কিন্তু শাসনকর্তৃত্ব লাভ করবার জন্য বলপ্রয়োগ আর শাসনকর্তৃত্ব উচ্ছেদ করবার জন্যে বলপ্রয়োগ এক জিনিস নয়—এ তাদের খেয়াল নেই। সিন্ডিক্যালিস্টদের কার্যকলাপ মার্কসীয় ছকের মধ্যে আবদ্ধ নয়। তারা কালের দাবি অনুসারে মার্কস্‌বাদের সংস্কার করে নেবে।

রাজনৈতিক ধর্মঘট ও প্রলিতারিয় ধর্মঘট উভয়ের পার্থক্য মৌলিক। রাজনৈতিক ধর্মঘট বুর্জোয়াদের একটা চাল। নির্বোধ জনতার হয়ে ভাববার গুরু দায়িত্ব তাদের মাথায়। জনতার মনে আছে রাষ্ট্রের জাদুকরী শক্তিতে অটল আস্থা। ওপরে ধনিকরা ধর্মঘটের আতঙ্কে অস্থির। একের অজ্ঞতা ও অপরের ভীরুতা উভয়ের সুযোগ নিয়ে বাক্যবীর সমাজবাদীরা দলের হাতে সকল ক্ষমতা দখল করে নেয়।

এদের ধাপ্পাবাজি ফাঁস করবার একমাত্র উপায় প্রলিতারিয় ধর্মঘট। প্রলিতারিয়

ধর্মঘট ধনিক-শ্রমিক সংঘর্ষের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি এবং চরম শক্তিপরীক্ষা,—শ্রমিকের দুর্বার সঙ্ঘশক্তির প্রমাণ। এর লক্ষ্য শ্রমিকের দাসত্বমোচন, সরকার বদল নয়। শ্রমিকের সকল চিন্তাভাবনা আশাআকাঙ্ক্ষা এর মধ্যে মূর্তিমান হয়ে ওঠে।

> ধর্মঘট শ্রমিকের মধ্যে গভীরতম ও উচ্চতম আবেগের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। সাধারণ ধর্মঘট তাহাদিগকে নানা স্থান হইতে আনিয়া একত্র করে, একটি চিত্রে সন্নিবেশ করিয়া প্রত্যেককে চরম উত্তেজনায় টানিয়া আনে। (১৩৭)

সফলতা দিয়ে একে মাপা যায় না। ধর্মঘট সমাজবিপ্লবের প্রস্তুতি, সংগ্রামের মহড়া। এর মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যচেতনা জেগে ওঠে। সুতরাং বাস্তবে এর ফলাফল যাই হোক না কেন, এর দূরবর্তী সম্ভবনার দিকে তাকিয়ে সুযোগ পেলেই ধর্মঘটের সংগ্রাম ঘোষণা করতে হবে।[*]

রোম জয় করার পর জার্মানরা নিজেদের বর্বরতায় লজ্জা পেয়ে রোমানদের কাছে সভ্যতার শিক্ষানবিসি করেছিল। এই অধমতাবোধ থেকে শ্রমিকদের বাঁচতে হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে না শিখলে তাদের বুদ্ধিজীবী সুবিধাবাদীদের ফাঁদে পড়তে হবে। জ্যাঁ জরে প্রমুখ[*] গণতন্ত্রী সমাজবাদীরা দুই শ্রেণীকে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলিয়ে নির্বাচনের রাস্তা পরিষ্কার করে। বিপ্লবের ভয় দেখিয়ে তারা ধনিকদের কাছ থেকে কাজ বাগায় আর শ্রমিকদের দাবিদাওয়া নিয়ে লড়াই করবার ভান করে তাদের ধাপ্পা দেয়। ধনিকদের বেশী চটাতে তারা সাহস করে না কারণ তাহলে ধনিকরা বিগড়ে গিয়ে দেশ রক্ষণশীল সরকারের হাতে তুলে দেবে। এইসব কারচুপিগুলোকে ফাঁসিয়ে দিতে হলে একমাত্র অস্ত্র প্রলিতারিয় ধর্মঘট।

ধর্মঘটের আগে মালিক বলে থাকে ব্যবসার যা অবস্থা তাতে মজুরের দাবি মেটান চলে না। ধর্মঘটের চাপে শুকনো গরুর বাঁট থেকে দুধ বেরোয়, পাওনাগণ্ডা আদায় হয়। দেখা যায় ধর্মঘটের অবিরাম চাপ না থাকলে ন্যায়বিচার মেলে না। সুতরাং সামাজিক কর্তব্য বা দায়িত্ব সব বাজে কথা। কাজের কথা শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে দাবি আদায়। শ্রমিকদের বোঝাতে হবে তারা ভিক্ষা চাইছে না, যা চায় তা কেড়ে নিচ্ছে। সরকারও ধর্মঘটকে ভয় পায়, তারা আপস করবার জন্যে মালিকদের চাপ দেয়। ধনিকদের এই দুর্বলতা ধনতন্ত্রের পতনের পূর্বাভাস এবং শ্রমিক ধর্মঘটের সুস্পষ্ট সমর্থন।

কিন্তু এ ব্যাপারটা বিপ্লবের পক্ষে খুব শুভ নয়। বিপ্লবের পূর্ণ সফলতা নির্ভর করে উভয় পক্ষের তেজস্বিতার ওপর। একপক্ষ নিস্তেজ হয়ে গেলে অপর পক্ষও দুর্বল হয়, তার শক্তির ঠিক পরীক্ষা হয় না। ধনিকশ্রেণী যদি শান্তির আশায় ধনতন্ত্রের সংস্কার শুরু করে আর শ্রমিকশ্রেণী যদি আপসে রাজী হয় তা হলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বিপ্লবকে ফলপ্রসূ করতে হলে এ হতে দেওয়া চলবে না, বুর্জোয়াদের আপস ও আত্মসমর্পণ করতে দেওয়া হবে না। একটু নতি স্বীকার করলেই দাবির মাত্রা বাড়িয়ে ধর্মঘটের চাবুক মেরে তাদের শান্তির স্বপ্ন ভেঙে দিতে হবে।

---

[*] সরেল এবং লাগার্দেলের মত ধর্মঘটকে এপ্রকার আধ্যাত্মিক গুরুত্ব অন্যান্য সিন্ডিক্যালিস্টরা দেননি। এদের মধ্যে গ্রিফুয়েলে, পেলুতিয়ে প্রভৃতি যাঁরা ইউনিয়ন চালিয়েছেন তাঁরা ফলাফল চিন্তা না করে ধর্মঘটের পক্ষপাতী ছিলেন না।

[*] ফ্রান্সের এই গণতন্ত্রী সমাজবাদী নেতার বিরুদ্ধে সরেল প্রাণ খুলে বিষোদ্গার করেছেন। ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে গণতন্ত্রবিরোধী পত্রিকাগুলির প্ররোচনায় একটি রেস্তরাঁয় তিনি নিহত হন।

> ধনতন্ত্র যখন পূর্ণবয়স্ক, যান্ত্রিক বলে পূর্ণতা লাভ করিয়া যখন ইহা ঐতিহাসিক দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছে, অথচ যখন অর্থব্যবস্থা উন্নতিশীল, মার্কস্-এর বিপ্লববাদ বলে ধনতন্ত্রের মর্মস্থলে আঘাত করিবার তাহাই প্রশস্ত সময়। যদি অর্থব্যবস্থা নিম্নগামী হয় তাহা হইলে কি হইবে এ প্রশ্ন তাঁহার মনে জাগে নাই।......ঐতিহাসিক যুগ হইতে যুগান্তরে উত্তরণকে মার্কস্ দায়াধিকারের সহিত তুলনা করিয়াছেন। নূতন যুগ পুরাতন যুগের সম্পদ উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়। যদি অর্থনৈতিক অবনতির মধ্যে বিপ্লব ঘটে তবে এই সম্পদ কি কমিয়া যাইবে না এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরায়িত করিবার কি কোন আশা থাকিবে? (৯১-৯২)

যে শ্রেণীসংগ্রামের ওপর মার্কস্ তাঁর গোটা বিপ্লববাদকে দাঁড় করিয়েছেন ধর্মঘট তাকে ঘনীভূত করে। যারা একটু উঁচুদরের মজুর, যেমন এঞ্জিনীয়ার ফোরম্যান কেরাণী, এবং সংগ্রামে দোমনা, ধর্মঘটের বেলায় তারা সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয়।

> যখন হইতে দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি, প্রত্যেকটি সংঘর্ষ শ্রেণীগত যুদ্ধের অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়, যখন প্রত্যেকটি ধর্মঘট এক সর্বান্তক ধ্বংসের চিত্র তুলিয়া ধরে, তখন সামাজিক শান্তির সম্ভাবনা, গতানুগত্যে আত্মসমর্পণ কিংবা দরদী মালিকের উপর ভরসা সব নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়। সাধারণ ধর্মঘটের ধারণার পিছনে এমন একটা দুর্ণিবার শক্তি রহিয়াছে যে ইহা যাহাকে স্পর্শ করে তাহাকেই বিপ্লবের রাস্তায় টানিয়া নামায়। এই ধারণার ফলে সমাজবাদের থাকে চিরযৌবন। সামাজিক শান্তির চেষ্টা ছেলেমানুষি বলিয়া মনে হয়, সাথীদের মধ্যবিত্তদলে যোগদান জনতাকে নিরাশ করে না বরং তাহাদিগকে বিদ্রোহ করিতে আরো উত্তেজিত করে; এক কথায় দুই দলের ভেদরেখা মুছিয়া যাইবার কোন ভয় থাকে না। (১৪৫)

এদিকে ধর্মঘট ধনিকদেরকে নিজ শ্রেণীস্বার্থে সচেতন করে তোলে, তারা সংগ্রামে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয় এবং তাদের তেজস্বিতা ফিরে আসে। ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক সম্পূর্ণতা লাভের জন্যে এবং তার সম্পদ বিপ্লবের হাতে সমর্পণ করবার জন্যে ধনিকদের শ্রেণীবলকে জাগিয়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। প্রলিতারিয় সংগ্রাম এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করবে।

> যে সকল স্পার্টান বীররা থার্মপীলির গিরিপথ আগলাইয়া প্রাচীন সভ্যতাকে রক্ষা করিয়াছিল তাহাদের নামে যেমন গ্রীকরা মাথা নোয়াইত আমরাও তেমন সভ্যতার ত্রাণকর্তা প্রলিতারিয় বিপ্লবীকে নমস্কার করিব। (৯৯)

সরেলের বইর নাম "বলপ্রয়োগের ভাবনা"। বইএর পাতায় পাতায় ভিয়োলাঁস বা বলপ্রয়োগ শব্দটির উচ্ছ্বসিত সুখ্যাতি। এ থেকে আশঙ্কা হতে পারে তিনি বুঝি-বা হত্যা ও নাশাত্মক কাজে প্ররোচনা দিচ্ছেন। বস্তুত তাঁর ভিয়োলাঁস শিল্পযুদ্ধের বলপ্রয়োগ, ধর্মঘটের জুলুম। আন্তর্জাতিক যুদ্ধের মত এতে মারামারি খুনোখুনি নেই। বিপ্লবী শ্রমিক ধনিকশক্তিকে আঘাত করে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত লোকগুলিকে নয়। সমাজের দুঃখ-দুর্দশার জন্য জনকয়েক দুষ্ট লোককে তারা দায়ী করে না। তারা জানে যে,

> গোটা সমাজব্যবস্থা এক অনড় নিয়মের নিগড়ে আবদ্ধ। ইহাকে এড়াইবার উপায় নাই। ইহা একটি অখণ্ড সত্তা। ইহাকে নাশ করিতে হইলে চাই সর্বাত্মক বিপ্লব যাহাতে গোটা ব্যবস্থায় ঘা পড়ে। (১১)

মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিপ্লবীরা চার্চ ও রাজতন্ত্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ক্ষমতাশালী লোকগুলোর উপর আক্রমণ চালায়। দৈবাৎ তাদের হাতে যদি ক্ষমতা আসে তাহলে তারা প্রজাপীড়নে চার্চ, বুরবোঁ রাজা এবং বিপ্লবনায়ক রোব্‌স্‌পীয়েরের চেয়ে কম যাবে না।

একদিন ছিল যখন ফরাসীদের বুকে ছিল রক্তারক্তির নেশা। তারা রাস্তায় নেমে বাস্তিল দুর্গে আগুন লাগিয়েছে, নেপোলিয়নের পিছনে পিছনে সারা ইয়োরোপ চষে বেড়িয়েছে। জেকবিনদের বিভীষিকা, নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যবিস্তার তাদের ওপর মায়াজাল বিস্তার করেছে। সেদিন আর নেই। হিংসার পুরোহিতরা আজ আর বীরের সম্মান পায় না। এ যুগের বীরপুরুষ প্রলিতারিয় যোদ্ধা, ধর্মঘটের পরিচালক। ক্ষমতালোভী বিবেকহীন রাজনীতিব্যবসায়ীগুলোকে সরিয়ে প্রলিতারিয় বীর এক বলিষ্ঠ নীতিমান রচনা করবে, সমাজকে সে দুর্নীতির পাঁকে ডুবতে দেবে না।

দ্রেফুর ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দেওয়া থেকে বোঝা যায় যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের নৈতিক সম্বল ফুরিয়ে গেছে। এখন এর নীতি ফটকা বাজারের নীতি।

> পুঁজিওলা বাজারে ঢাক পিটাইয়া বড় বড় কোম্পানী খুলিয়া বসে, বছর কয়েকের মধ্যে কোম্পানী ফতুর হইয়া উঠিয়া যায়। আর রাজনৈতিক পাণ্ডা দেশবাসীকে অজস্র কল্যাণকার্যের প্রতিশ্রুতি দেয়, অথচ জানেনা কেমন করিয়া প্রতিশ্রুতি পালন করিবে, প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত পার্লামেন্টের গাদা গাদা নথিপত্রে পর্যবসিত হয়। দুজনার মধ্যে খুব বেশী তফাত নাই। (২৫৯-৬০)

দুই রত্ন পরস্পরকে বেশ ভাল করে চেনে। শেয়ারহোল্ডারদের সভা ও পার্লামেন্টের সভা ভর্তি করে বসে থাকে এদের হাততোলার দল। গণতন্ত্র তাই জুয়াচোর ফাটকাবাজদের ভূস্বর্গ।

এই লোকগুলোর কোন ন্যায়নীতির বালাই নেই বলে কি মানুষ উচ্ছন্নে যাবে? প্রলিতারিয় বীর এদের সঙ্গে এদের দুর্নীতি জুয়াচুরি ঝেঁটিয়ে দূর করবে, মানবসমাজে নূতন মূল্যবোধ সৃষ্টি করবে।

সাধারণ ধর্মঘট ও শ্রমিক বীরকে ঘিরে সরেল যে মায়াময় পরিমণ্ডল রচনা করেছেন তাতে বাস্তববাদী বিপ্লবী সিণ্ডিক্যালিস্টরা সায় দেয়নি বটে, তবে সাধারণ ধর্মঘটকে শ্রমিকদের ব্রহ্মাস্ত্র বলে সবাই গ্রহণ করেছে। ১৯০৬ সালে সিজিটির শ্রমিকরা দৈনিক অনধিক আটঘণ্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট করে প্রায় বৈপ্লবিক অবস্থার সূচনা করেছিল।

সিণ্ডিক্যালিস্টদের দ্বিতীয় অস্ত্র কাজ পণ্ড করা বা সাবতাজ। ধনিকের বিধানে শ্রম পণ্যবিশেষ। বাজারের নীতি,—যেমন দাম দেবে তেমন জিনিস পাবে। তেমনি নীতি,—যেমন মজুরি দেবে তেমন কাজ পাবে। মজুর পাওনা না পেলে কাজে অবশ্যই ফাঁকি দেবে—এ বাজারের নিয়ম, শ্রেণীদ্বন্দ্বেরও নিয়ম। দরকার হলে সে যন্ত্রপাতি এবং মালপত্রও নষ্ট করে দেবে। পুজে উদাহরণ দিয়েছেন—একমুঠো বালি একটা মেশিনকে বন্ধ করতে পারে, দরজী পোশাকের ছাটকাট খারাপ করে মালিককে নাস্তানাবুদ করতে পারে কিংবা ক্ষেতমজুর খারাপ বীজ বুনে জমিদারের ফসল মাটি করতে পারে।* সাধারণ ধর্মঘটের চেয়ে এতে ঝক্কি কম অথচ ফল বেশী। ১৯০৬ সালের মে মাসে পারির সেলুনগুলোকে কস্টিকের ছোপ দিয়ে বিকৃত করে নাপিতরা আটঘণ্টা কাজের দাবি আদায়

* লা সাবতাজ, ৩৪ পৃষ্ঠা। যে সরেল এত করে জবরদস্তির প্রশস্তি গেয়েছেন তিনি কিন্তু এ সব কাজ সমর্থন করেননি, কারণ এতে শ্রমিকের উৎপাদনশক্তি নষ্ট হয়ে যায়।

করেছিল। মালিক পুলিশ ও দালাল লাগিয়ে ধর্মঘট ভাঙবার চেষ্টা করতে পারে কিন্তু যন্ত্রকে বিকল করে ধর্মঘটে জেড়াতে পারলে আর সে ভয় নেই।

সিণ্ডিক্যালিস্টদের আর এক হাতিয়ার সেনাবাহিনীকে দলে টানা। এরা ধনিকতন্ত্র ও ধনিক রাষ্ট্রের খুঁটি। শ্রেণীসংগ্রাম সঙ্গিন হয়ে উঠলে সরকার ফৌজ লাগিয়ে শ্রমিকদের দমন করে। অথচ সেনা ও শ্রমিক একই শ্রেণীর লোক, একই সামাজিক স্তর থেকে এসেছে তারা। শ্রমিকদের শায়েস্তা করে তাদের কোন লাভ নেই। দেশরক্ষার জন্যে তাদের জীবন বলি দিতে বলা হয় অথচ দেশের একটুকরো চাষের জমিও তাদের নেই। এই মন্ত্রগুলো তাদের কানে ঢুকিয়ে দিতে হবে এবং তাদের বোঝাতে হবে তারা যেন শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করে।* তাবলে সিণ্ডিক্যালিস্টরা সেনাবাহিনী ভেঙে দিতে চায় না বা শান্তির স্বপ্ন দেখে না। সৈন্যদের নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া শ্রেণীযুদ্ধের এক কৌশল।

সিণ্ডিক্যালিস্ট শ্রেণীসংগ্রামের আরো নানারকম কায়দা আছে। যেমন মালের ওপর লেবেল লাগানো। যে কারখানায় ইউনিয়নের দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে সেখানকার মালের ওপর ইউনিয়ন একটা লেবেল মেরে দেবে। অধিকাংশ ক্রেতা শ্রমিক এবং শ্রমিকরা লেবেল ছাড়া জিনিস কিনবে না। লেবেল তাই দাবি আদায়ের একটা অস্ত্র। এছাড়া সভা, জলুস, হরতাল, বয়কট এসব ত' আছেই।

এনার্কিজ্‌ম্‌-এর সঙ্গে একটি কর্মপন্থা ও সংগঠন জুড়ে দিয়ে সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌ তৈরী। শতাব্দীর অন্তে ঘোর দুর্দিনে পড়ে এনার্কিস্টদের অনেকে সন্ধান করেছিল একটি বাস্তব কর্মপদ্ধতির এবং এমন একটি শ্রেণীর যাদের স্বার্থ নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে জড়িত, যারা এ নিয়ে লড়াই করবে। এই শ্রেণী হল প্রলিতারিয় শ্রমিক, কর্মপন্থা হল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। শ্রমিকরা ইতোমধ্যে ইউনিয়নে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে, ইউনিয়নকে তারা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। এমতাবস্থায় নৈরাজ্যবাদীদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেয়ে উৎপাদনে ধর্মঘট করে অচলতা সৃষ্টি করা সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সব দেখে পেলুতিয়ে, পুজে, দেলেসাল প্রভৃতি নৈরাজ্যবাদী সিণ্ডিক্যালিস্ট শিবিরে যোগ দিলেন। কিন্তু অধিকাংশ রয়ে গেল বাইরে। তারা সিণ্ডিক্যালিস্ট সংগ্রামে সহানুভূতি জানাল কিন্তু সশস্ত্র বিদ্রোহের বদলে সাধারণ ধর্মঘটকে নিতে রাজী হল না। ১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে আমস্টার্ডামে এক আন্তর্জাতিক এনার্কিস্ট কংগ্রেসে সমবেত হয়ে তারা ঘোষণা করল,

> সকল দেশের সাথীদিগকে নির্দেশ দেওয়া হইতেছে তাহারা যেন শ্রমিক শ্রেণীর নিজেদের দ্বারা পরিচালিত সংগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং ইউনিয়নগুলির মধ্যে বিদ্রোহের ভাবনা, ব্যক্তিগত উদ্যম ও সংহতির শক্তি বাড়াইয়া তোলে যাহা নৈরাজ্যবাদের সার কথা।......কিন্তু ভুলিলে চলিবে না যে নৈরাজ্যবাদীরা মনে করে যে ধনতান্ত্রিক ও প্রভুত্বশীল সমাজকে শুধু সশস্ত্র বিদ্রোহ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তি দ্বারা ধ্বংস করা সম্ভব। সরকারের সামরিক শক্তির সঙ্গে লড়বার যাহা প্রত্যক্ষ ও অনিবার্য পদ্ধতি সিণ্ডিক্যালিস্ট সংগ্রামে ও সাধারণ ধর্মঘটে উৎসাহ দিতে গিয়া তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

প্রথম প্রথম ক্রপটকিনও এই মত পোষণ করতেন। তারপর যখন তিনি দেখলেন সশস্ত্র সংগ্রামের আশা সুদূরপরাহত এবং এর পরিণতি হয়েছে লক্ষ্যহীন গুপ্তহত্যায়

* জি. ডেভেজো : লা মানুভেল দু সলদা ; মরিস চার্নাই : অ্যান্টিমিলিটারিজ্‌ম্‌ দু সলদা।

তখন তিনি সিণ্ডিক্যালিস্টদের পুরোপুরি সমর্থন না করলেও আশীর্বাদ জানালেন। গোঁড়া নৈরাজ্যবাদীরা যাই বলুক না কেন আসলে সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌ শিল্পযুগের পরিপ্রেক্ষিতে এনার্কিজ্‌ম্‌-এর নয়া সংস্করণ। অনেকে এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁরা এনার্কিজ্‌ম্‌ বলতে বোঝেন গডউইন, স্টার্নার ও প্রুদ'র ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রজ্ঞানির্ভর দর্শন, বাকুনিন ও ক্রুপটকিনের যুথকেন্দ্রিক সংগ্রামনির্ভর নৈরাজ্যবাদের কথা তাঁরা চিন্তা করেন না।[৯] সরেল প্রমুখ অনেকে এনার্কিস্টদের মধ্যবিত্তশ্রেণীর কল্পনাবিলাসী বলে ব্যঙ্গ করেছেন।[১০] এনার্কিস্টদের গরম গরম কথায় রাষ্ট্রের ইমারত থেকে একটি ইটও খসেনি। তবে তাদের বেপরোয়া হিংসার বাণী সিণ্ডিক্যালিস্টদের কাজে লেগেছে, "তারা মজুরদের শিখিয়েছে যে হিংসাত্মক কাজে লজ্জার কিছু নেই" (৪১)। আশ্চর্যের কথা যে প্রুদ'র শিষ্য হয়েও সরেলের মনে পড়ল না যে তাঁর নিরাজ সমাজের আদর্শ এবং স্বাধীনতা ও যন্ত্রকরণের নীতি নৈরাজ্যবাদের জনকের কাছ থেকে পাওয়া। মার্ক্‌স্‌-এর শ্রমিক আন্তর্জাতিকে কমিউনিজ্‌ম্‌-এর বিরুদ্ধে এনার্কিজ্‌ম্‌কে লালন করেছিল যে ল্যাটিন দেশগুলি, সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌-এর বিকাশ ঘটেছিল যে সেই দেশগুলিতেই এ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়।

ইউনিয়ন কেবল লড়াইর হাতিয়ার নয়, ইউনিয়ন মজুরদের শিক্ষাশালা। এর মারফত তাদের সাহস ও দায়িত্ববোধ বাড়বে, লড়াইর কায়দাকানুন রপ্ত হবে, আর চোখের সামনে ফুটে উঠবে ইউনিয়ন-আশ্রয়ী সহযোগী সমাজের চিত্র। ভবিষ্যতে সমাজ কি চেহারা নেবে সে সম্বন্ধে সিণ্ডিক্যালিস্টরা কোন সুস্পষ্ট মন্তব্য করে নি। কেবল মাত্র পাতাউ ও পুজে একখানি পুস্তকে পুলিশের গুলিবর্ষণ থেকে শ্রমিক সমাজের উদ্‌ভব পর্যন্ত ঘটনা-পরম্পরার কাল্পনিক বিবরণ দিয়ে একটা মনোরম রামরাজ্যের ছবি এঁকেছেন।[১১] একদিন ধর্মঘটি মজুরের ওপর পুলিশ গুলি চালাল। সঙ্গে সঙ্গে আগুনের মত কলে কারখানায় ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ল, মেশিন বিকল হল। জনতার কোপে পড়ে পুলিশের মেরুদণ্ড ভেঙে গেল, বিপ্লবীদের প্রচারের ফলে সেনাবাহিনী বন্দুক নামিয়ে বসে রইল। বিষদাঁত ভেঙে সরকার যখন কাবু হয়ে পড়েছে তখন ইউনিয়নগুলি সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে সংগঠনের কাজ হাতে নিল—তারা জনসাধারণের খোরপোষ ও বাসের দায় গ্রহণ করল। যাবতীয় জাতীয় কল্যাণকার্য ও সেবাকার্য তারা পরিচালনা করতে লাগল, শ্রমিকদের জাতীয় সিণ্ডিকেট রেলগাড়ি চালাবার, খনিমজুর পরিণ্ডিকেটের ফেডারেশন কয়লা তুলবার দায়িত্ব নিল। উৎপাদন ও জনহিতের যাবতীয় কাজের মধ্যে যোগাযোগ রাখবার ভার নিল ইউনিয়নের ফেডারেশনগুলির এক সার্বভৌম সাধারণ কনফেডারেশন।

চাষীরা জমিদারের জমি দখল করে মালিক হয়ে বসল, ক্রমশ তারাও সহযোগিতা ও যন্ত্রকরণের নীতি মেনে নিয়ে সিণ্ডিক্যাল ব্যবস্থার সামিল হল। শিক্ষকদের ইউনিয়ন সার্বজনীন শিক্ষার প্রবর্তন করল, শিক্ষাকে শ্রমমুখীন করল। ধনতন্ত্রের আওতায় যে সকল প্রতিভা চাপা পড়ে ছিল এখন তা মুক্ত হয়ে নূতন আবিষ্কার ও উৎপাদন বুদ্ধির কাজে

[৯] যেমন—এসটে : রিভলিউশনারী সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌, ১২৭ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা।

[১০] সরেল নিজে ছিলেন মধ্যবিত্তশ্রেণীর, তাঁর নজরে পড়েনি যে বিদ্রোহের নেতৃত্ব—যাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—প্রথমে তাদের ভেতর থেকেই বেরোয়। রাশিয়ায় ডিসেম্ব্রিস্ট, পপুলিস্ট, বাকুনিন, ক্রুপটকিন সব ছিলেন অভিজাত বংশের লোক।

[১১] কর্মা নু ফের' লা রেভল্যুশিয়' (কেমন করে আমরা বিপ্লব সমাধা করব?)

নিযুক্ত হল। উৎপন্ন বিত্ত ইউনিয়নগুলির মারফত সকলকে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হল, কারও হাতে কোন মুনাফা রইল না। সুতরাং প্রতিযোগিতা এবং বাড়তি উৎপাদনের অনর্থ সমাজকে ভুগতে হল না। ধর্ম উঠে গেল, তার জায়গা নিল চারুকলা। এতদিন পুরোহিত, রাজামহারাজা ও বেনিয়ারা চারুকলাকে বন্দিনী করে রেখেছে—এবার চারুকলা হল সমাজলক্ষ্মী।

বিপ্লবের শেষে জন্মলাভ করল মার্কসীয় রামরাজ্যের শ্রেণীহীন রাষ্ট্রহীন সমাজ।

> ধনতান্ত্রিক যুগের নরপশুর জায়গায় উপস্থিত হইয়াছে নূতন পরিবেশ, নবীন আবহাওয়ার সৃষ্টি মৈত্রীপরায়ণ নবজাতক। মানুষ সৎ হইয়াছে কারণ অসৎ হইয়া তাহার লাভ নাই।
>
> মানুষে মানুষে হানাহানি মারামারির পরিবর্তে আসিয়াছে চুক্তি, সৌহার্দ্য, পরস্পর সহায়তা। যুদ্ধ চলিতেছে কেবল প্রকৃতির রাজ্যে। এখানে মানুষ একযোগে প্রতিকূল শক্তিগুলিকে পরাস্ত করিয়া সমাজের কাজে খাটাইতেছে। সকল সন্দেহের নিরসন হইয়াছে, পৃথিবী জুড়িয়া বিপ্লবের দামামা বাজিতেছে, ঘরে ঘরে আসিয়াছে শান্তি মুক্তি ও কল্যাণ। ভিতরে ও বাহিরে কোথাও কোন বিপদের ভয় নাই। তাই এখন জীবন মধুময় হইয়াছে, বাঁচিয়া সুখ আছে।[১২]

বৈপ্লবিক সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌ ফ্রান্সের ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ ছিল না। ইয়োরোপ ও আমেরিকার দেশে দেশে, বিশেষ করে স্পেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল।

স্পেনে শ্রমিক আন্দোলনের প্রবর্তক প্রুদ'র শিষ্য পি ই মারগাল। তিনি ছিলেন সমাজবাদী ও রাষ্ট্রবিরোধী। তাঁর তৈরী জমিতে বাকুনিন বীজ ফেললেন। স্পেনীয় শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে লেখা ইস্তাহার এবং ফানেলির সংগঠন শ্রমিক আন্তর্জাতিকের স্পেনীয় শাখাকে মার্কস্‌বিরোধী নৈরাজ্যবাদী শিবিরে টেনে নিয়ে এল। ১৯১০ সালে ল্যাটিন স্বাতন্ত্র্যবাদের ঐতিহ্য বহন করে স্থাপিত হল কনফেদেরেসিয়ন নাসিয়নাল দেল ত্রোবাজো নামে সিণ্ডিক্যালিস্ট শ্রমিক ফেডারেশন, সংক্ষেপে সিএনটি।

১৯৩৬ সালের উনিশে জুলাই জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে ফাসিস্ত বিদ্রোহের সূত্রপাত হল। এই কালশনিকে রুখবার কাজে অগ্রণী হয়ে এল সিএনটি এবং তার সমধর্মী আইবেরিয়ার এনার্কিস্ট্‌ ফেডারেশন ফাই (এফ. এ. আই)। লড়াইর সাথে সাথে তারা জোতজমি চাষী সমবায়ের হাতে আনল, কলকারখানা শ্রমিক ইউনিয়নের হাতে আনল। ক্যাটালনিয়া ও বার্সিলনা থেকে আন্দোলন উপদ্বীপের অন্যান্য অংশে বিস্তারিত হল এবং সমাজতন্ত্রী দলের ইউনিয়নগুলিকে ফাসিবিরোধী সংগঠনে ভাঙিয়ে নিয়ে এল, চাষী ও মজুরদের সঙ্গে বুদ্ধিজীবিদেরও অনেকে এসে জুটল। সকলের সমবেত চেষ্টায় ক্যাটালনিয়ার অর্থনৈতিক চেহারা ফিরে গেল। জমির তিনচতুর্থাংশ এল চাষী সমবায়ের যৌথকর্তৃত্বে। বাকি জমি স্বল্পবিত্ত চাষীপরিবারগুলির মধ্যে লোকসংখ্যার অনুপাতে বেঁটে দেওয়া হল। সামুদ্রিক কৃষির হিড়িক এরাগনেও পৌঁছল। এখানে পতিত জমির শতকরা চল্লিশ ভাগ আবাদ হল পর্যাপ্ত পরিমাণ যন্ত্র ও রাসায়নিক সারের প্রয়োগে।

যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে এরা অসাধ্যসাধন করল। সিএনটি ভার নিয়ে রেলগাড়ি,

[১২] অনুবাদ, শার্লট ও ফ্লেডারিক চার্লস, অক্সফোর্ড ১৯১৩, ২৩৩ পৃষ্ঠা।

বাসলার ও জাহাজ চালাল, বিজলি কাপড় ও যন্ত্রের কারখানা চালাল। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামে উৎপাদনের সংস্কার হল। যুদ্ধের রসদ পয়দা করবার জন্যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শত শত কারখানা বসল। এদিকে সিএনটির পরিচালনায় এক লক্ষ বিশ হাজার স্বেচ্ছাসৈনিক ফাসিস্তদের সঙ্গে লড়ছে, আর ওদিকে যুদ্ধধ্বস্ত অঞ্চলের ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিচ্ছে ক্যাটালনিয়া। ইংল্যান্ডের ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টির সম্পাদক ফেনার ব্রকওয়ে এই সময়ে (১৯৩৭) স্পেন ঘুরে এসে লিখেছিলেন "সামনে তারা ফাসিবাদের সঙ্গে লড়ছে, পিছনে তারা গড়েছে নবীন শ্রমিকসমাজ। তারা দেখেছে যে ফাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা আর সমাজবিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, দুটি কাজ অবিচ্ছেদ্য।"[১০] স্পেনের দারুণ সংকটের কালে সিণ্ডিকেটগুলি দেখিয়েছে যে তারা সমান মাত্রায় সামরিক শক্তি ও গঠনপ্রতিভার অধিকারী।

এ সত্ত্বেও তারা ফাসিস্ত বাহিনীকে রুখতে পারেনি। ফাসিস্তদের হাতে ছিল প্রচুর কাঁচা মাল, তারা পেয়েছিল হিটলার ও মুসোলিনির সামরিক সাহায্য, আর তাদের সঙ্গে ছিল গৃহশত্রু পঞ্চম বাহিনী। পক্ষান্তরে বিপ্লবীরা বিদেশের শ্রমিক দলগুলির থেকে বিশেষ কিছু সাড়া পায় নি, নিজ নিজ দেশের সরকারকে স্পেনে সৈন্যসাহায্য পাঠাবার জন্যে তারা বিশেষ কোন চাপ দেয়নি।

ফ্রান্সের সিজিটি ও স্পেনের সিএনটির মত আর একটি লড়াকু শ্রমিকসংঘ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আই ডব্লিউ ডব্লিউ। ইয়োরোপের চেয়ে এখানে ধনতন্ত্র ফেঁপে উঠেছিল অনেক বেশী এবং ধনিকসংঘগুলির ছিল অপর্যাপ্ত ক্ষমতা। এখানে বিদেশ থেকে আনকোরা মজুর আসত দলে দলে যে আপদ ইয়োরোপে ছিল না। মার্কিন শ্রমিকদের হাত ছিল কাজে পাকা, তাদের মজুরিও ছিল মোটা। বলতে গেলে এখানে দুটি আলাদা শ্রমিকশ্রেণী গজিয়ে উঠল যাদের জীবনের মানমাত্রা এক নয়। সুদক্ষ কারিগররা সংগঠিত হল আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবারে, আনকোরা বাহিরাগতের দল এসে ভিড়ল ইণ্ডাস্ট্রিয়েল ওয়ার্কার্স অব দি ওয়ার্লড্-এর ঝাণ্ডার নীচে।

১৯০৫ সালের জুলাই মাসে শিকাগোয় শ্রমিকনেতাদের এক বৈঠকে এই সংঘটির পত্তন হয়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই এর ভেতর এক মতভেদ দেখা দিল। সমাজবাদী নেতা দ্য লিণ্ড চাইলেন একদিকে আই ডব্লিউ ডব্লিউ যেমন অর্থনীতির ওপর শ্রমিক প্রভাব বাড়াতে থাকবে অন্যদিকে তেমনি সমাজবাদী দল নির্বাচনে নেমে সরকার দখল করবে, করে রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করবে। বিল হেউড ও ভিনসেণ্ট সেণ্টজন প্রমুখ সিণ্ডিক্যালিস্ট নেতারা এ মত সায় দিলেন না। দলবাজি ও ভোটাভোটির মধ্যে না গিয়ে তারা চাইলেন সরাসরি রাষ্ট্রকে উৎখাত করতে। এই বিবাদে সংগঠন দু' দুবার ভেঙে গেল (১৯০৬, ১৯০৮)। বিদেশী আনকোরা মজুরদের ভোট ছিল না—তাই রাজনৈতিক দলের ওপর তারা ভরসা করত না। এদের সমর্থন পেয়ে সিণ্ডিক্যালিস্টরা জিতে গেল। এ পর্যন্ত আই ডব্লিউ ডব্লিউর সংবিধানের গৌরচন্দ্রিকায় সমাজবাদী রাজনৈতিক কর্মপন্থার স্বীকৃতি ছিল। এবার সেটুকু তুলে দিয়ে সংবিধান সংশোধন করা হল। দ্য লিণ্ড সংগঠন ছেড়ে এসে সোস্যালিস্ট লেবার পার্টি নামে একটি দল তৈয়ারী করলেন।[১১]

[১০] রুডল্ফ্ রকার : এনার্কো-সিণ্ডিক্যালিজম্, লণ্ডন, ১৯৩৮, ১০১ পৃষ্ঠা।

[১১] ১৯১২ সালে সোস্যালিস্ট পার্টি সিণ্ডিক্যালিস্টদের দল থেকে তাড়িয়ে দেয়। এতে দুই মতের ভেদরেখা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সংশোধিত গৌরচন্দ্রিকায় ঘোষিত হল যে অর্থনৈতিক অস্ত্রই সর্বৈব। ইউনিয়নের আওতায় গোটা শ্রমিকশ্রেণী সংগঠিত হবে, ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে চলবে আপসহীন সংগ্রাম যতদিন না তারা পরাস্ত হয়ে হৃতসর্বস্ব হয়।

> মজুরশ্রেণী ও মালিকশ্রেণীর মধ্যে কোথাও মিল নাই.....এই দুই শ্রেণীর পরস্পর সংঘর্ষ চলিবে যতদিন না দুনিয়ার মজদুর শ্রেণীগত ঐক্য লাভ করিয়া সারা পৃথিবী ও উৎপাদনের যাবতীয় উপকরণ করায়ত্ত করে এবং অন্নদাসত্বের অবসান ঘটায়।

সমাজবাদীরা বেরিয়ে যাবার পরে আই ডব্লিউ ডব্লিউকে আরো ধাক্কা সামলাতে হয়েছিল। এর প্রধান অঙ্গ ছিল পাশ্চাত্ত্য খনিমজুর ফেডারেশন। ১৯০৭ সালে এই সঙ্ঘ রক্ষণশীলদের হাতে আসার পর পিতৃসংস্থা থেকে বিদায় নিল। এ সত্ত্বেও আই ডব্লিউ ডব্লিউর তাগদ রয়ে গেল যথেষ্ট। পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে গতিমুখে অজস্র নিম্নস্তরের মজুরকে টেনে আনল এরা। মধ্যপশ্চিমের চরমান শ্রমিকদের ঠাঁই ছিল শিকাগোর দপ্তরে—সংস্থার পত্রিকা অফিসও ছিল এখানে। এদের লড়াই সবচেয়ে ঘোরাল হয়ে উঠেছিল ১৯১২ সালে যখন ম্যাসাচুসেট্স্-এর লরেন্স সুতাকলের ত্রিশ হাজার মজদুর ধর্মঘট সফল করে দাবি পুরিয়ে নেয়। ভাষণের স্বাধীনতা ও অন্যান্য নাগরিক অধিকারের জন্যেও আই ডব্লিউ ডব্লিউ লড়েছে কম নয় এবং এ সব দঙ্গলে কখন কখন মারামারি রক্তারক্তিও ঘটেছে খুব।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এদের অনেকে সরকারী ডাক অমান্য করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল। যুদ্ধের পর এদের ওপর সাঁড়াশির কামড় পড়ল দুদিক থেকে। একদিকে রাজ্যসরকারের দমননীতি, অন্যদিকে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের চাপ। ১৯১৮ সালের আগস্ট মাসে শিকাগোর আদালতে বিচারে এদের মাথা মাথা লোকেদের দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ড হয়ে গেল। আইন করে বিদেশ থেকে বেকার মজুর আসা রদ হল,—আই ডব্লিউ ডব্লিউর সভ্যতালিকায় ভাঁটা পড়ল। বাকি বকেয়ার মধ্যে অনেকে আমেরিকান কমিউনিস্ট পার্টিতে ভিড়ে পড়ল। সিণ্ডিক্যালিজম্-এর গরম হাওয়া তুষারপাতে জুড়িয়ে গেল।

সিণ্ডিক্যালিজম্-এর জোয়ারে ভাঁটা পড়ল রুশবিপ্লবের পর থেকে। ১৯১৯ সালে বলশেভিক দল সারা দুনিয়ার বিপ্লবী শ্রমিক সংস্থাগুলিকে পরবৎসর মস্কোতে সমবেত হয়ে একটি নূতন আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘ গঠন করবার জন্যে আমন্ত্রণ পাঠাল। ইউরোপ ও আমেরিকার বিক্ষিপ্ত সিণ্ডিক্যালিস্ট শক্তিগুলিকে একত্র করে দলে টানবার ফিকিরে ছিলেন লেনিন। সময়টা ছিল প্রশস্ত কারণ রুশ বিপ্লবের আকস্মিক ও চমকপ্রদ কীর্তিতে তারা তখন মুগ্ধ। ১৯২০ সালের গ্রীষ্মকালে মস্কোর কংগ্রেসে সম্মিলিত হয়ে তারা তৃতীয় শ্রমিক আন্তর্জাতিক গঠনে সম্মতি দিল।

তাদের মোহ ভাঙতে বেশী দিন লাগল না। কিছুদিনের মধ্যে তারা প্রলিতারিয় একনায়কত্বের স্বরূপ দেখতে পেল। অবলশেভিক সমাজবাদীদের সঙ্গে রুশ নৈরাজ্যবাদীদের জায়গা হল জেলখানায়। বলশেভিক রুশের কূটনীতির সমর্থনে গোটা ইয়োরোপের শ্রমিক আন্দোলনকে কাজে লাগানো হল তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কূটকৌশল। সিণ্ডিক্যালিস্টরা বিপ্লবী ব্রেড ইউনিয়নগুলিকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র সঙ্ঘ গড়তে চাইল, কমিউনিস্টরা রাজী হল এই সর্তে যে সে সঙ্ঘ তৃতীয় আন্তর্জাতিকের তাঁবে

থাকবে। ১৯২১ সালে মস্কোতে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের তাঁবেদার একটি শ্রমিক কংগ্রেসের অধিবেশন হল—সেখানে সিণ্ডিক্যালিস্টরা হেরে গেল। ১৯২২-২৩ সালের বড়দিনে তারা বার্লিনে এক পাল্টা অধিবেশন করল। আর্জেণ্টিনা, চিলি, মেক্সিকো, নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, সুইডেন, স্পেন, পর্তুগাল, ইটালী, জার্মানী, ফ্রান্স ও রাশিয়ার প্রতিনিধিরা মিলে ইণ্টারন্যাশন্যাল ওয়ার্কিংমেন্স্ এসোসিয়েশন নামে এক আন্তর্জাতিক সিণ্ডিক্যালিস্ট সংস্থা তৈরি করল। নূতন আন্তর্জাতিকের বিঘোষিত নীতিমালার দ্বিতীয় দফায় বলা হল—

> বৈপ্লবিক সিণ্ডিক্যালিজ্ম্ সর্ববিধ আর্থিক ও সামাজিক একাধিকারের অবিচল প্রতিদ্বন্দ্বী। দল ও সরকারের তাঁবেদারি হইতে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত স্বাধীন শ্রমিকপরিষদের ভিত্তির উপর মাঠের ও কারখানার মজুরদিগকে লইয়া স্বাতন্ত্র্যশীল সমাজ সৃষ্টি করা ও সমাজকৃত্য পরিচালনার ব্যবস্থা করা ইহার লক্ষ্য। রষ্ট্র ও দলের রাজনীতির পরিবর্তে ইহা নির্ভর করে শ্রমিকের অর্থনৈতিক সংগঠনের উপর। ইহা মানুষকে শাসন করিতে চায় না, চায় বিত্তের ব্যবস্থাপনা। সুতরাং ক্ষমতা অধিকার করা ইহার উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য সমাজজীবন হইতে সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় অধিকার দূর করা। ইহা বিশ্বাস করে যে বিত্তের একাধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতার একাধিকারেরও বিলোপ করিতে হইবে; এবং রাষ্ট্রকে যে কোন আকারে হাজির করিলে, তাহা প্রলিতারিয় একনায়কত্ব হইলেও সর্বদা নূতন একাধিকার ও নব নব স্বার্থের জন্ম দিবে, কখনো জনমুক্তির সহায় হইবে না।

এই থেকে কম্যুনিজ্ম্ ও সিণ্ডিক্যালিজ্ম্-এ ছড়াছড়ি হল—আই ডব্লিউ এম এ চলল নিজের রাস্তায়। ১৯৩৩ সালে এর কেন্দ্রীয় দপ্তর বার্লিন থেকে হল্যাণ্ডে সরিয়ে আনা হল, তারপর মাদ্রিদে। তখন এর চলবার শক্তি নেই, এর কোষগুলির জীবনীশক্তি ফুরিয়ে এসেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আই ডব্লিউ ডব্লিউ ম্রিয়মান। ফ্রান্সে ১৯০৬ সালের সাধারণ ধর্মঘট ব্যর্থ হবার পর থেকেই সিজিটিতে ভাঙন ধরেছিল—একদল বিপ্লব ছেড়ে শান্তিময় সংস্কারের পথ ধরেছিল, আর একদল তরি ভিড়িয়েছিল কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকে, কেবল এক টুকরো সিণ্ডিক্যালিস্ট গোষ্ঠী বার্লিনের আই ডব্লিউ এম এ-তে এসে যোগ দিয়েছিল। মুসোলিনি ও হিটলারের অভ্যুত্থানের পর ইটালী ও জার্মানীর ছোট ছোট শাখাগুলি নিশ্চিহ্ন হল। পর্তুগাল ও স্পেনে একনায়কত্বের পাল্লায় পড়ে সিণ্ডিকেটগুলির একই হাল হল। স্পেনে প্রাইমো ডি রিভেরার তিরোধানের পর তারা আবার মাথা তুলেছিল বটে কিন্তু ফ্রাঙ্কোর কবল থেকে বাঁচোয়া ছিল না। পূর্ব ইয়োরোপের সিণ্ডিক্যালিস্টরা একদিকে জার্মান নাৎসি অন্যদিকে রুশ কম্যুনিস্টদের জাঁতাকলে পড়ে ছারখার হয়ে গেল। কেবল সুইডেনের সঙ্ঘটি এই জাঁতাকল থেকে রেহাই পেয়ে কোন রকমে টিকে রইল। আরজেনটিনার সঙ্ঘ ফেদারেসিয়ন ওবেরা রিজিয়ন্যাল আরজেনতিনা জেনারেল উরিবুরা ও পের'র একতন্ত্র থেকে আত্মগোপন করে রক্ষা পেল। ১৯২৯ সালের মে মাসে ফোরা সারা দক্ষিণ আমেরিকার একটি সিণ্ডিক্যালিস্ট কংগ্রেসও আহ্বান করেছিল। এই কংগ্রেসে তারা গঠন করেছিল সারা আমেরিকার ওয়ার্কিংমেন্স্ এসোসিয়েশন। এটি ছিল আই ডব্লিউ এম-এর আমেরিকান শাখা এবং এর কেন্দ্র ছিল বুয়েনস আইরেস, পরে উরুগুয়ে।

সিণ্ডিক্যালিস্ট আন্দোলনের ধার ক্ষয়ে যাবার কারণ শত্রুপক্ষের উৎপীড়ন ততটা নয়,

যত তার নিজস্ব ত্রুটি ও দুর্বলতা। মধ্যবিত্তদের আশ মিটিয়ে গালাগালি দিলেও এদের অনেকেই ঐ শ্রেণী থেকেই এসেছিলেন, যেমন পেলুতিয়ে, সরেল, লাগার্দেল। মধ্যবিত্ত সমাজবাদীদের সামাজিক কল্পনার মত তাদেরও সাধারণ ধর্মঘটের ভাষ্য ছিল সমান ধোঁয়াটে ও অবাস্তব। পাতাউ ও পুজের বিপ্লবের খসড়া এই কল্পনাবিলাসের একটি সুন্দর নমুনা। ক্রপটকিন 'রুটির জয়'তে যে সহযোগী মুক্ত সমাজের একটু আভাস দিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন এরা তার ওপর কল্পনার রঙ্ চড়িয়েছেন। মানবচরিত্র ও বাস্তব পরিবেশকে এরা পছন্দ মত সাজিয়ে নিয়েছেন যাতে বিপ্লবের স্রোত অবাধ গতিতে বইতে পারে। সবই যেন বিদ্রোহীদের জয়যাত্রার জন্যে তৈরী হয়ে আছে। ক্রপটকিনের মত যে আশাবাদী তিনিও ভূমিকায় লিখছেন—

> সমাজবিপ্লবের গতিপথে যে প্রতিরোধ আসতে পারে ইহারা তাহাকে বহুলাংশে এড়াইয়া গিয়াছেন। রাশিয়ায় বিপ্লবের উদ্যোগ যে বাধা পাইয়াছে তাহা আমাদিগকে দেখাইয়াছে এইরূপ কল্পনাবিলাস হইতে কত প্রকার বিপদ আসিতে পারে।[১৫]

দেখা যাচ্ছে যে শ্রমিক নেতাদের চেয়ে উচ্চবিত্ত প্রিন্সের বাস্তববোধ একটু বেশিই ছিল।

শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব এবং সাধারণ ধর্মঘটের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা প্রুদ' বাকুনিন ও ক্রপটকিন তিনজনেই টের পেয়েছিলেন। তাঁরা শ্রমিকসংস্থা ও ধর্মঘটের সাফল্য মুক্তকণ্ঠে কামনা করেছেন, মুক্ত সমাজের বাহক বলে শ্রমিককে আশীর্বাদ করেছেন। ধর্মঘটের বলে শ্রমিকরা শ্রেণীগত সুবিধা শুধু আদায় করে নি, কখনো কখনো বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তনও সাধন করেছে। ১৯০৫ সালে রাশিয়ায় সাধারণ ধর্মঘট জারকে আধাগণতান্ত্রিক সংবিধানে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছিল। ১৯২০ সালে জার্মানীতে এক জঙ্গীদল আচমকা সরকার দখল করে নেওয়ার পর জার্মান শ্রমিকরা সাধারণ ধর্মঘট করে তাদের পতন ঘটিয়ে গণতন্ত্রকে বাঁচিয়েছিল। পার্লামেণ্টি সমাজবাদীরা বৈধ উপায়ে যে সকল সংস্কার অর্জন করেছে শ্রমিক ধর্মঘটের চাপ পেছনে না থাকলে তা সম্ভব হত না।

কিন্তু শ্রমিকধর্মঘট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃতকাম হয়েছে তখনই যখন এক বৃহত্তর গণআন্দোলনের সঙ্গে এ জড়িত থেকেছে এবং জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেছে। অন্যথায় শ্রেণীগত সংগ্রামেও ধর্মঘট বড় একটা সফল হয় না। ১৮৯৪ সাল থেকে ১৯০৭ সালের মধ্যে ফ্রান্সে যখন সিণ্ডিক্যালিজ্ম্-এর স্বর্ণযুগ তখন সেখানে যে কটি ধর্মঘট হয় তার মধ্যে সফল হয়েছিল শতকরা ২৩টি, বিফল হয়েছিল শতকরা ৪১টি, মিটমাট হয়েছিল শতকরা ৩৬টির।[১৬] ১৯০৬ সালে আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে সিজিটির অতবড় যে জীবনমরণ ধর্মঘট তাও বরবাদ হয়ে গেল, অনেক শ্রমিককে বিনাসর্তে কাজে ফিরে যেতে হল, বহু ইউনিয়ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সকল যুদ্ধেই অবশ্যি হারজিত আছে। কিন্তু ব্রহ্মাস্ত্র যখন তখন ছাড়তে নেই, তাতে তার গুণ নষ্ট হয়ে যায়। সফলতার দিকে না তাকিয়ে শ্রমিকের শ্রেণীচেতনা বাড়াবার জন্যে পারলেই ধর্মঘট করতে হবে এমন বেয়াড়া যুক্তি আর হয় না। ধর্মঘটে হেরে যাওয়ার পর শ্রমিকের মনে কি পরিমাণ অবসাদ আসে, সংগ্রাম এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে

---

[১৫] ১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারীতে লেখা, ১৯০৫ সালের বিপ্লবপ্রচেষ্টার উল্লেখ।
[১৬] সরকারী সংখ্যা—এসটে : রিভলিউশনারী সিণ্ডিক্যালিজ্ম্, ১৩৭ পৃষ্ঠা।

পিছিয়ে যায় কত বেশি তা আজ কারও অজানা নয়। যে ইংল্যাণ্ডকে শ্রমিক ইউনিয়ন আন্দোলনে ফ্রান্সের অগ্রজ বলা যেতে পারে সেখানেও ১৯১২ সালে খনিমজুরদের ধর্মঘট শেষ পর্যন্ত বানচাল হয়ে গিয়েছিল। শিল্পক্ষেত্রের যুদ্ধ সংগঠন ও সম্বলের লড়াই। সম্বলে সর্বদা এবং সংগঠনে অধিক সময়ে ধনিকরা শ্রমিকদের চেয়ে বলবান।

সিণ্ডিক্যালিস্টদের দ্বিতীয় অস্ত্র সাবতাজ। এটি শাঁখের করাত, দুদিকেই কাটে, যেমন ধনিককে তেমন শ্রমিককে। সরেল কাজে ঢিলে দেওয়া এবং মালপত্র খারাপ করার নিন্দা করেছেন কারণ এতে শ্রমিকের উৎপাদন শক্তি ব্যাহত হয়, আর বিপ্লবের সফলতা নির্ভর করছে এই শক্তির ওপরই। বস্তুত সাবতাজের ভাঙননীতি শিশুমনোবৃত্তির পরিচয়, ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকদের যখন ইউনিয়ন গড়বার অধিকার ছিল না তখন লুডাইট নামে পরিচিত তাদের একদল মেশিন ভেঙে তার ওপর রাগ ঝাড়ত। শৈশবের এই পাগলামি পরিণত বয়সের শ্রমিক আন্দোলনে সাজে না। এসব বুঝলেও দার্শনিক সরেল আন্দোলনের নেতাদের সামলাতে পারেন নি। শ্রেণীসংগ্রাম ও হিংসার যে অনর্গল উত্তাপ তিনি বর্ষণ করেছিলেন তাতে সংগ্রামীরা এমনি তেতে উঠেছিল যে আখেরের কথা ভাববার অবসর তাদের ছিল না। শত্রুকে যে কোন উপায়ে ঘায়েল করা হল একমাত্র লক্ষ্য—এবং যন্ত্রভাঙা, মালে ভেজাল, কাজে ঢিলেমি এর চেয়ে মোক্ষম উপায় আর কি আছে? এর ফলে মালিকের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতি হল খরিদ্দারের, সাধারণ লোক শ্রমিকআন্দোলনের ওপর বিগড়ে গেল।

কোনও ব্যবস্থা বিপ্লবের আঘাতে ধ্বসে পড়ে তখনই যখন নিজের গলদে তার গোড়া ক্ষয়ে যায়, যখন তার আয়ু ফুরিয়ে আসে, উন্নতির সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়। মার্কস্‌ও এ কথাই বলেছেন। সরেল শোনালেন এক অদ্ভুত কথা যে ধনতন্ত্র যখন চরম সৃষ্টিক্ষম তখনই তাকে নাশ করতে হবে। কজেই চাই এমন এক দৃঢ়মতি ধনিকশ্রেণী যারা সূচ্যগ্র ভূমি ত্যাগ করবে না। দুর্ভাগ্যের বিষয় ধনিকরা এরকম গোয়ার্তুমি না করে আপসের রাস্তা ধরল, শ্রমিকদের কিছু কিছু দাবি মিটিয়ে বিপ্লব থেকে তাদের সংস্কারের পথে টেনে নিয়ে এল।

এখানে কার্ল মার্কস্‌ও ভুল করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন ধনিকদের নির্বোধ স্বার্থপরতাই শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে দেবে, বিপ্লব আনবে। ধনিকরা স্বার্থপর বটে তবে নির্বোধ নয়। তারা বোঝে শ্রমিকরা চায় ভাতকাপড়, বিপ্লব নয়। তারা স্বভাবত শান্তিপ্রিয়, সংস্কারবাদী। মুনাফার ছিটেফোটা দিয়ে তাদের তুষ্ট রাখা কিছু কঠিন নয়। তার ওপর সার্বজনীন ভোটাধিকার দিয়ে, কল্যাণকর আইন করে তারা বিপ্লবের ধার ভোঁতা করে দিল, শ্রমিক বেছে নিল নির্বাচন ও আইনরচনার পথ।

সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌-এর গঠনমূলক পরিকল্পনার পথে সবচেয়ে বড় বাধা যান্ত্রিক শিক্ষার অভাব। ভবিষ্যতের দায়িত্বের কথা চিন্তা করে সিণ্ডিক্যালিস্টরা কারিগরদের সমবায় সমিতি গড়ে উৎপাদন চালাবার চেষ্টা করেছে। এগুলো টেকে নি। হয় তারা ব্যবসা গুটিয়েছে নয়ত মালিক-মজুর সম্পর্কে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সে চশমাওলাদের একটা সমবায় সমিতি তৈরী হয়েছিল। কয়েক বছরের মধ্যে দেখা গেল তাদের মধ্যে ৬৫ জন সভ্য মালিক আর ১৩০০ জন মজুর।[১৭] সমবায় সমিতির না আছে পুঁজি ও যন্ত্র, না আছে যান্ত্রিক শিক্ষা। প্রথম দুটি না হয় বিপ্লব করে হস্তগত হল, তৃতীয়টি বিপ্লবে

[১৭] ওয়েই : ইস্তোয়ার দু মুভমাঁ সোসিয়াল আঁ ফ্রাঁস, ৪৪৩ পৃষ্ঠা, পাদটিকা।

আসবে না। সরেল তাঁর লাভেনির সোসিয়ালিসৎ দে স্যাঁদিকা (ইউনিয়নগুলির সমাজ-তান্ত্রিক ভবিষ্যৎ, ১৮৮৭) পুস্তিকায় বার বার এই শিক্ষালাভের জন্যে তাগিদ দিয়েছেন। কিন্তু ইস্পাত, রসায়ন ইত্যাদি বড় বড় শিল্পের যান্ত্রিক বিদ্যা বুর্সেগুলি পাবে কোথা থেকে যে শ্রমিকদের শেখাবে? অবশ্য এ কাজ যে অসাধ্য নয় স্পেনের সিণ্ডিকেটগুলি তা দেখিয়েছে।

সরেলের সকল মিথের সেরা সর্বহারার নৈতিক ভূমিকা। অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত, বিনাশনে, বিষোদ্‌গারে অভ্যস্ত, চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাহীন বিবেকমুক্ত "সমাজযুদ্ধের এই বীর সৈনিকেরা" জয়লাভের পর এক অনুপম মহানুভবতা নিয়ে সংগঠন ও উৎপাদনের বিপুল দায়িত্ব গ্রহণ করবে, একদিকে তারা আনবে সাম্য ও মুক্তি আবার পরিচালনার জন্যে উচ্চতর প্রতিভাও বজায় রাখবে, প্রতিভার সঙ্গে সমতার, পরিচালনার সঙ্গে মুক্তির সামঞ্জস্য ঘটাবে "সর্বহারা বীরপুরুষ", সমাজবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে আনবে নৈতিক বিপ্লব! বিশ্বাসে কৃষ্ণ মিলতে পারে কিন্তু বিপ্লব মেলে না। চরম আদর্শবাদীদের অদৃষ্টে যা থাকে সরেলের কপালেও জুটেছিল সেই হতাশা। ১৯১০ সালের ডিসেম্বর মাসে বোলোনায় ইটালীয় সিণ্ডিকেটগুলির এক সম্মিলন হয়—সেখানে সরেল মত বর্জন করে এক চিঠি পাঠান ও চিঠিটা পড়া হয়।[১৮] রুশ ও ইটালীয় বিপ্লবের পর আবার তাঁর আশা উজ্জীবিত হয়ে উঠল। লেনিন ও মুসোলিনিকে তিনি সম্বর্ধনা করলেন। তাঁরা নিজ নিজ দেশে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের যে পরিকল্পনা নিচ্ছেন তাতে শ্রমিক গণতন্ত্রের ভিত তৈরী হচ্ছে এতে তাঁর সন্দেহ রইল না।

বিস্ময় লাগতে পারে এতরকমের আজব কথার ভেলকি দিয়ে সরেল একটা আন্দোলনের মন্ত্রদান করলেন কেমন করে? করলেন এই জোরে যে শ্রমিকদের শ্রেণীচেতনায় তিনি শুড়শুড়ি দিতে পেরেছিলেন, তাদের যুক্তিহীন অবচেতন মনকে তিনি ছুঁতে পেরেছিলেন। জবরদস্তি ও অন্ধ বিশ্বাসের প্রশস্তি গেয়ে তিনি শক্তিপূজারী নীট্‌শে ও ফাসিস্ত নায়ক মুসোলিনির মধ্যে সেতু বাঁধলেন আর তাঁর গুরু মার্কস্‌ ও প্রুদ'র আদ্যশ্রাদ্ধ করলেন। তিনি লেনিনকে প্রলিতারিয় রোমের স্থাপয়িতা বলে বন্দনা করেছিলেন, লেনিন এই বাক্য-বিলাসের জবাবও দেননি। মুসোলিনি তাঁর স্তুতির প্রতিদান দিয়েছিলেন সিণ্ডিক্যালিস্ট গুরুটিকে ফাসিজ্‌ম্‌-এর সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রদাতা বলে সার্টিফিকেট দিয়ে!

সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌-এর কিছু অদলবদল করে ইংল্যাণ্ডে গিল্ড সোস্যালিজ্‌ম্‌ নামে একটি মতবাদ গড়ে ওঠে। এর প্রচারক কোল, হবসন প্রভৃতি, এরও লক্ষ্য "মালিকমজুর সম্পর্ক তুলে দিয়ে শিল্পে শ্রমিকের স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা।" রাষ্ট্রে এখন সকল দায় সকল ক্ষমতা কেন্দ্রায়িত। এর জায়গায় চাই এক বৃত্তিমূলক গণতন্ত্র যেখানে এক এক বৃত্তি ও সমস্বার্থ অবলম্বন করে এক একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠবে, স্বাতন্ত্র্য রেখে নিজ নিজ কাজ চালাবে। এভাবে দায়িত্ব ও ক্ষমতা হবে বিকেন্দ্রিত। উদ্যোক্তাদের গোষ্ঠীর পাশাপাশি থাকবে ভোক্তাদের গোষ্ঠী, বৃত্তিমূলক গোষ্ঠীর পাশাপাশি আঞ্চলিক গোষ্ঠী। এরা পরস্পর চুক্তি করে স্থির করবে কাজের সময়, দক্ষিণা, দাম, উৎপাদনের পরিমাণ ইত্যাদি। সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌-এর বৈপ্লবিক প্রণালীর বদলে গিল্ড সোস্যালিজ্‌ম্‌ ধীরগতির পক্ষপাতী। ইউনিয়ন জোরদার হলে সাধারণ ধর্মঘটের ঝুঁকি না নিয়েও কাজ আদায় হতে পারে। যেমন এনক্রোচিং কনট্রোল ও কলেক্‌টিভ কনট্র্যাক্ট। প্রথমটিতে শ্রমিকরা

[১৮] এসটে : রিভলিউশনারী সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌, ২০১ পৃষ্ঠা।

একটু একটু করে চাপ দিয়ে কারখানা চালাবার দায়িত্বে ভাগ বসাবে। দ্বিতীয়টিতে ইউনিয়ন শ্রমিকদের হয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের ভার এবং তাদের মজুরি একসঙ্গে গ্রহণ করবে। গিল্ড সোস্যালিস্টরা রাষ্ট্রকে একেবারে খারিজ করে না। অন্যান্য বৃত্তিমূলক গোষ্ঠীর মধ্যে রাষ্ট্র হবে একটি—দেশরক্ষা, বৈদেশিক সম্বন্ধ, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন, রাজস্ব ইত্যাদি সমাজকৃত্য নিয়ে সে থাকবে। রাষ্ট্রের স্থান সম্বন্ধে এরা সকলে একমত নয়। কারও কারও মতে শ্রমিক বা উদ্যোক্তাদের নিয়ে বৃত্তি-অবলম্বী যে গোষ্ঠী-সমন্বয় গড়ে উঠবে, ভোক্তাদের নিয়ে আঞ্চলিক গোষ্ঠীসমন্বয় হবে তার পাল্টা, সমপর্যায়-ভুক্ত ও সমক্ষমতাপন্ন, যার শীর্ষদেশে থাকবে সরকার। গিল্ড সোস্যালিস্টরা তাদের পরিকল্পনাটিকে শ্রমিকশ্রেণীর সমাজবাদ বলে বিজ্ঞাপন দেওয়ায় সিণ্ডিক্যালিস্টদের এক-চোটেয়া ব্যবসায় ঘা পড়ল, তারা নাক সিঁটকিয়ে বলল, এতে মধ্যবিত্তশ্রেণীর ধোঁয়াটে গন্ধ—এ মাল খাঁটি নয়। রাষ্ট্রাণ্ড রাসেল কিন্তু এদের এই বলে সনদ দিলেন যে, "এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব আর হয়নি। অবিরাম হিংসায় আবেদনের যে ভয় খাঁটি নৈরাজ্যবাদী বিধানে রয়ে গেছে তাকে এড়িয়ে স্বাধীনতায় পৌঁছবার সবচেয়ে সম্ভবপর রাস্তা এইটেই।"[১১]

এঁদের কাছে দুটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি। প্রথমত, যে রাষ্ট্রের হাতে থাকবে সেনা, পুলিস ও রাজস্ব সে কি অন্যান্য বৃত্তিমূলক গোষ্ঠীর সমপর্যায়ে কারও স্বাধীনতায় হাত না দিয়ে বিড়াল তপস্বীর মত বসে থাকবে? দ্বিতীয়ত জাতীয় ক্ষেত্রে সর্বব্যাপী গিল্ডসমাজ গড়ে তোলবার সম্বল শ্রমিকশ্রেণীর কোথায়?

সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌ ও গিল্ড সোস্যালিজ্‌ম্‌ উভয়ের ধ্যানজ্ঞান এক শ্রেণীসর্বস্ব সমাজবাদ। এর জন্যে দরকার শ্রেণীর পূর্ণ বিকাশ, অর্থাৎ সমস্ববার্থে আবদ্ধ ঐকাসচেতন জনগণ। এই ঐক্যবদ্ধ জনগণের বিস্তৃতি এতদূর হতে হবে যাতে শাসন ও প্রভুত্ব বাদ দিয়ে সরকারী কাজ ও ধনতান্ত্রিক উৎপাদনের বিপুল দায়িত্ব তারা হাতে নিতে পারে। এমন ঐক্যবদ্ধ গণশ্রেণী কোথায়? তথাকথিত শ্রমিকশ্রেণী স্বল্পে ভরপুর। দক্ষ মোটা-বেতনের মজুর আর আনাড়ি দিনমজুর, জোতওলা চাষী আর ভূমিহীন ক্ষেতমজুর, কারখানার শ্রমিক আর স্বাধীন হাতের কাজের কারিগর এদের মধ্যে স্বার্থ ও চেতনার কোন মিল নেই। এদের মধ্যে কিছু কিছু হতভাগ্যদের ক্ষেপিয়ে শিল্পসঙ্কট সৃষ্টি করা কিংবা সরকারী ক্ষমতা করায়ত্ত করা অসম্ভব নয়; কিন্তু এদের একসঙ্গে করে এক সমদর্শী মুক্ত সমাজ তৈরী করার কল্পনা প্লেটো ও টমাস মুরের স্বপ্নরাজ্যের মতই অবাস্তব।

স্বাধীনতার তপস্যায় সিণ্ডিক্যালিজ্‌ম্‌-এর অবশ্যই অবদান আছে। তবে তা সাধারণ ধর্মঘটের স্তোত্রপাঠে নয়, বিপ্লবের মনোহারী চিত্রাঙ্কনে নয়, শ্রমিকদের মধ্যে যে সাহস, স্বাধিকার বোধ ও আত্মবিশ্বাস এ জাগিয়ে তুলেছিল সেই এর অক্ষয় কীর্তি। এরা শ্রমিকদের যুযুৎসাকে বাঁচিয়ে না রাখলে ভোটের লড়াই ও আইনসভার চিৎকারে সমাজবাদ ডুবে যেত। আইনের মারফত শ্রমিকরা যাকিছু পেয়েছে তাও সংগ্রামী শ্রমিকদের দৌলতে। আধুনিক সমাজচিন্তায় এদের সবচেয়ে বড় নিবেদন বহুভিত্তিক বিকেন্দ্রিত সমাজের কল্পনা। শ্রমজীবী সমাজে বিভিন্ন বৃত্তি আত্মশাসনশীল সমিতি গড়ে উঠবে, এগুলি হবে মুক্ত সমাজের কোষ। এ ধারণা আজকাল বহুজনস্বীকৃত, যার বিকৃত অনুকরণের চেষ্টা ফাসিস্ত ইটালী ও কমিউনিস্ট রাশিয়াতেও হয়েছে।

---

[১১] রোডস্‌ টু ফ্রীডম, লণ্ডন, ১৯৩৪, ৯২ পৃষ্ঠা।

বিশ্বজনীন ঐক্য

আর্ণল্ড টোয়েনবি

আঞ্চলিক ভাষার ভিত্তিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের মানচিত্র পুনরংকনের যে প্রচেষ্টা হয়েছে তাও অনেকটা পূর্ব ইউরোপীয় পদ্ধতিরই অনুরূপ। পূর্ব ইউরোপে ভাষাগত জাতীয়তা নামে যে মতবাদ প্রচলিত আছে ভারতবর্ষে তারই প্রয়োগ ঘটছে। আর, পূর্ব ইউরোপে ভাষাগত জাতীয়তার দাবীকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে রাজনৈতিক মানচিত্র পুনরঙ্কনে, যে ক্ষোভ এবং সংঘর্ষের উৎপত্তি হয়েছিল ভারতবর্ষেও ঠিক তাই দেখা দিয়েছে। এই শোচনীয় পরিণতি অবশ্য অনিবার্য। যতই নিখুঁতভাবে এবং যত্নসহকারে বিভিন্ন রাজ্যের সীমানা অঙ্কন করা হোক না কেন, সেই সীমারেখার এদিকে এদিকে কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থেকে যেতে বাধ্য। তার ফলে বোম্বাইয়ের মত বৃহৎ বাণিজ্য ও শিল্প নগরীতে যে কঠিন সমস্যা দেখা দেয় তাও অনিবার্য। কারণ ঐ ধরনের নগরীতে ভাষার আঞ্চলিক সীমানা বহির্ভূত দূর দূর অঞ্চল থেকে নানাভাষী কর্মপ্রার্থী লোকেরা ভিড় করবেই। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, ভারতবর্ষের এই বিরোধমূলক সীমানা পুনর্বণ্টন অনিবার্য ছিল। সমস্ত পৃথিবী জুড়েই এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ব্রহ্মদেশে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে হলেও একই ঘটনা ঘটছে। এটা অনিবার্য এই জন্য যে, তা নাহলে গণতন্ত্রকে কার্যোপযোগী রাখা যায় না। তাছাড়া, আমাদের কালে পৃথিবীর দেশে দেশে ক্রমাগত গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রযুক্তও হচ্ছে। গণতন্ত্রের যথার্থ সার্থকতা যদি লাভ করতে হয় তাহলে রাষ্ট্রকে যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে ভাষাগত অঞ্চলে ভাগ করে নিতেই হবে। কারণ পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ কেবলমাত্র তার মাতৃভাষাই জানে, পৃথিবীতে দ্বিভাষী ও বহুভাষী মানুষের সংখ্যা এখনও নগণ্য।

অতএব মনে হয়, রাজনৈতিক খণ্ডীভবনের দিকে এই যে গতি চলেছে এরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু প্রয়োজন আছে বলেই এটা যে বিভেদমূলক নয় এ কথা বলা যায় না। তাছাড়া খণ্ডীভবন অনিবার্য হোক আর নাই হোক, এর মধ্যে বিভেদের চিহ্ন সুস্পষ্ট। কাজেই এ কথা কি যথার্থ নয় যে, আজকের দিনে মানুষ ঐক্যবদ্ধ বিশ্বজনীনতার উপলব্ধির পরিবর্তে বরং ক্রমশঃ পারস্পরিক ভেদবুদ্ধির দিকেই অগ্রসর হচ্ছে? তাছাড়া এ শুধু চেতনার কথা নয়, এই ভেদবুদ্ধির চেতনা এক শ্রেণীর জাতীয়তার আবেগ সঞ্চার করছে। লক্ষণীয় যে, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, ব্রহ্মদেশ এবং সিংহলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরিণামস্বরূপ এক শ্রেণীর ভাষাগোষ্ঠীগত আবেগ জন্মলাভ করেছে। এশিয়ায় যদিও এ উপদ্রব নূতন, কিন্তু ইউরোপে এ উপদ্রব অনেক দিনের পুরাতন। ভারতবর্ষে বোম্বাইয়ে এই নিয়ে মারাঠা এবং গুজরাটীদের মধ্যে উত্তেজনা যথেষ্ট দেখা দিয়েছিল।

যদি আমরা বিশ্বজনীন ঐক্য স্থাপনের জন্য কৃতসঙ্কল্পই হই—ঐক্য স্থাপিত না হলে বিশ্বব্যাপী যে মহাপ্রলয় ঘটবে সে বিষয়েও যদি নিশ্চিত হই তাহলে বৃথা সুখকর কল্পনাবিলাসে নিমজ্জিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বরং এ বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন যে, বর্তমান মুহূর্তে ঐক্যের বিপরীত দিকেই ঘটনার গতি অগ্রসর হচ্ছে। এই ঐক্যবিরোধী শক্তিগুলির প্রভাব বা ক্ষমতাকে যেন কেউ তুচ্ছ জ্ঞান না করেন।

বর্তমান কেন্দ্রাভিগ এবং কেন্দ্রাতিগ শক্তিগুলির কোন্‌টার কতখানি ক্ষমতা সে সম্বন্ধে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা রাখতেই হবে।

ভেদমূলক শক্তিগুলি কি কি হতে পারে? আমরা ইতিমধ্যেই একটির পরিচয় নির্ণয় করেছি। ভাষাগত জাতীয়তা গণতন্ত্রের উপজাতক। বর্তমান মুহূর্তে এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার দিগন্তে যে জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি ঘটেছে, তাও লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে,—কিছুদিন পূর্বে অতলান্তিক সমুদ্রোপকূলবর্তী ইউরোপীয় উপদ্বীপের আধ ডজন রাষ্ট্র মিলে পৃথিবীর বৃহৎ এক অংশজুড়ে, বৃহৎ জনসংখ্যার উপরে যে শাসনাধিপত্য চালিয়ে গেছে এ তারই পরিণাম। ইউরোপের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলি বিশ্বগোলার্ধের চতুর্দিকে যে শাসন-জাল বিস্তার করেছিল সে একটা অস্বাভাবিক রাজনৈতিক উপসর্গ। এখন প্রমাণিত হল যে, এ উপসর্গ শুধু অস্বাভাবিক নয় অস্থায়ীও।

আমাদের জীবদ্দশায়ই দেখছি, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলির বিলুপ্তি আরম্ভ হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই বিলুপ্তির পর্ব দ্রুতবেগে অগ্রসর হ'চ্ছে। বস্তুত পৃথিবীর রাজনৈতিক মানচিত্র স্বাভাবিকতায় ফিরে আসছে।

এই ঘটনাকে স্বাভাবিক বলছি এইজন্য যে, পশ্চিম ইউরোপের ঔপনিবেশিক যুগের বহুদেশের মানুষকে যে পরাধীন অবস্থায় বাস করতে হয়েছে সেটা স্বাভাবিক ছিল না। আবার, এই স্বাভাবিকতায় ফিরে আসার মানে অবশ্য এই নয় যে, পৃথিবী ঔপনিবেশিক যুগের পূর্বেকার অবস্থায়ই প্রত্যাবর্তন করছে। সাম্রাজ্যগুলি মনুষ্য জাতিকে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ঐক্যের সন্ধান দিতে পারেনি। এদের ভিত্তি ছিল রাজনৈতিক অসাম্যের উপরে, কাজেই এগুলি নিতান্তই বালির বাঁধের মতো দাঁড়িয়ে ছিল। অতএব ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য-গুলির রাজনৈতিক কাঠামো যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু এগুলি কেবলমাত্র রাজনৈতিক কাঠামো ছিল না, এদের ভিতর দিয়ে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, সহযোগ এবং সম্মিলনের একটা ধারা প্রবাহিত হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্বল্পস্থায়ী সাম্রাজ্য শাসনের ঊর্ধ্বে স্থায়িত্ব ও গুরুত্ব দুইই লাভ করবে।

বর্তমান জাতীয়তাবাদের বৈনাশিক দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে যদি এর সৃজনশীল অংশের দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে একথা আরও সুস্পষ্টরূপে লক্ষণীয় হয়। বৈনাশিক দিক থেকে দেখলে, এ একটা বিদ্রোহ, পরাধীনতার এবং রাজনৈতিক অস্বাভাবিকতার বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ স্বাভাবিক এবং শ্রেয়। আবার, অপরপক্ষে এর সৃজনশীলতার দিক থেকে দেখলে, জাতীয়তাবাদের এই আন্দোলন বিশ্বজনীন নবাসমাজ এবং নব্য সভ্যতায় প্রবেশের আগ্রহকে নিঃসন্দেহে প্রতিফলিত করছে। এই নূতন বিশ্বসভ্যতা যখন গড়ে উঠবে তখন, সন্দেহ নেই, পৃথিবীর পুরাতন সভ্যতার সমস্ত প্রাতীয় সংস্কৃতির প্রধান দানগুলি গ্রহণ করে সে ক্রমশঃ সমৃদ্ধতর হবে, কিন্তু এই নূতন বিশ্বসভ্যতা প্রথম দিকে যে আদায়ীকৃত মূলধন (Paid-up Capital) নিয়ে যাত্রারম্ভ করল, সেই মূলধন প্রধানত একটি অঞ্চলেরই অবদান। পশ্চিমের সভ্যতার মূলধন নিয়ে এই যাত্রা শুরু হয়েছে, এর ঐতিহাসিক কারণ সুস্পষ্ট। আধুনিক কালের বিশ্বের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ পশ্চিমই আরম্ভ করেছে। কাজেই একথা স্বাভাবিক যে, নূতন বিশ্বসভ্যতারও প্রারম্ভিক কাঠামো মূলত পশ্চিমের দ্বারাই গঠিত হ'বে। কিন্তু একথা আরো তাৎপর্যপূর্ণ এবং আরো কৌতূহলোদ্দীপক যে, বিশ্বসভ্যতার এই পশ্চিমী উপকরণ সত্ত্বেও পাশ্চাত্য-বহির্ভূত

জগতের মানুষ একে গ্রহণ করতে অসম্মত হয়নি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নবীন-স্বাধীনতালব্ধ মানুষেরা তাদের ভাগ্য নির্ণয়ের অধিকার যখন পেল, তার সঙ্গে সঙ্গেই তারা স্বেচ্ছায় এবং সুপরিকল্পিতভাবেই এই লক্ষ্যের দিকেও অগ্রসর হল। রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত লোকেদের জাতীয়তাবাদ পশ্চিমের রাজনৈতিক আধিপত্যের বিরোধী সন্দেহ নেই, কিন্তু এই বিরোধিতার পশ্চাতে পশ্চিমের রাজনৈতিক মতাদর্শই অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে। পশ্চিমের এই রাজনৈতিক মতাদর্শ এমন কতকগুলি ন্যায় নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত, যেগুলি সর্বজনীন। পাশ্চাত্য-বহির্ভূত জগতের লোকেরা যে জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, তার মধ্যে এই পশ্চিমী মতাদর্শের এবং ন্যায়নীতির অনুপ্রেরণা ছিল। অপরপক্ষে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিন্তু সেই আন্দোলনই তাদের স্ব স্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিসদৃশ উপকরণগুলির বিরুদ্ধতায় অবতীর্ণ হয়েছিল।

অ-পাশ্চাত্যদেশগুলিতে আজকের দিনে যুগপৎ দুইটি বিপ্লব অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এর মধ্যে পশ্চিমের শাসনাধিপত্যের বিরুদ্ধে যে বিপ্লব সে অপেক্ষাকৃত বাহ্য এবং মৃদু। কিন্তু ঐসব দেশেরই অনাধুনিক যুগের পুরাতন সংস্কারের বিরুদ্ধে বর্তমানের পাশ্চাত্য-অনুপ্রাণিত ন্যায়াদর্শের যে বিপ্লব আরম্ভ হয়েছে, সে আরও প্রবলতর। সৈদিক থেকে নবস্বাধীনতাপ্রাপ্তেরা তাদের জীবনাচরণের ক্ষেত্রে এমন সমস্ত আমূল সংস্কার প্রবর্তন করতে আরম্ভ করেছে, যা অতীতে বিদেশী শাসকেরা প্রবর্তনের কথা কল্পনায়ও আনতে সাহস পেত না। স্থানীয়, বা আঞ্চলিক ন্যায়াদর্শ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বন্ধন যে আজ ছিঁড়তে আরম্ভ করেছে, একে আমাদের এই যুগের একটি বৃহৎ অভ্যুত্থানরূপে গণ্য করা যায়। এই শেষোক্ত বিপ্লবের গতিমুখ রাজনৈতিক বিপ্লবের একেবারে বিপরীত দিকে। এই গতি আন্তর্জাতিক ঐক্যের বিরোধী নয়, বরং বিশ্বজনীন ঐক্যের দিকেই আমাদের চালিত করছে। সভ্যতার নির্মাণকর্মে রাজনীতির চেয়েও মানবিক ব্যাপারগুলি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্য আমার মনে হয় বর্তমানে রাজনীতির স্রোত যে বিভেদের সৃষ্টি করছে—তার চেয়ে অধিকতর স্থায়ী এবং ফলপ্রসূ হবে এই ঐক্যমুখী ন্যায়াদর্শ এবং সাংস্কৃতিক প্রবাহ।

এমনকি স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর রাজনীতির ক্ষেত্রেও ঐক্যমুখী আন্দোলন দেখা দিয়েছে। কেন্দ্রাতিগ রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা দিয়েছিল বিদেশী শাসন এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহরূপে। কিন্তু স্বাধীনতা আর পারস্পরিক নির্ভরতার মধ্যে কোনো মৌলিক বিরোধ নেই। বস্তুত এই জন্যই স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর পারস্পরিক নির্ভরতার প্রশ্ন শুধু প্রয়োজনরূপে নয়, একটা বাস্তব ঘটনারূপে দেখা দিয়েছে। বর্তমান পৃথিবীর দুরূহ পরিস্থিতির মধ্যে যে নবীন রাষ্ট্র নিজের পরিচালনা নিজেই স্বাধীনভাবে শুরু করেছে, তার পক্ষে বাইরের বিশেষজ্ঞের পরামর্শ এবং নানাবিধ ব্যবহারিক সহায়তা প্রয়োজন। নিজেকে নিজে কিভাবে সাহায্য করা যায় সেই স্বাবলম্বনের শিক্ষায় সাহায্য লাভ করাই বোধহয় তার পক্ষে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলি প্রথমদিকে স্বভাবতই নিজেদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে স্পর্শকাতর থাকে। পাছে তাদের স্বাধীনতায় কোথাও কোনো বিঘ্ন কিংবা হস্তক্ষেপ ঘটে সেইজন্য তাদের দৃষ্টি সর্বদাই সন্দিগ্ধ। তথাপি এই স্বাভাবিক আশংকার মনোভাব সত্ত্বেও তারা রাষ্ট্রসংঘের কাছে নানাবিধ সাহায্য ও পরামর্শ প্রার্থনা করেছে। পশ্চিম ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলির অবলুপ্তির পর পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক সংগঠনের যে অভাব দেখা দিয়েছে, সে অভাব বা শূন্যতা ঐ সব সাম্রাজ্যের

স্থলাভিষিক্ত স্বাধীন জাতীয় গভর্ণমেণ্টগুলি পূর্ণ করতে পারেনি। নূতন আন্তর্জাতিক সংস্থার কাজ হ'চ্ছে ঐ শূন্যতা পূর্ণ করা। নূতন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি এবং এই আন্তর্জাতিক সংস্থা নিজেদের মধ্যে একত্র কাজ করে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী গভর্ণমেণ্টের গঠনমূলক কার্যাবলীর অভাব দূর করতে পারেন। এমনকি এক্ষেত্রে অতীতের ন্যায় শাসক এবং শাসিতের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষের কোনো কারণ না থাকায় তাঁদের পক্ষে বরং পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা এই কাজ অধিকতর পরিমাণে এবং আরো সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করা সম্ভব।

নবগঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থার মূল্য এই নবীন রাষ্ট্রগুলিই সর্বাগ্রে উপলব্ধি করেছে। কিন্তু এ ভবিষ্যৎবাণীও করা যায় যে, যেসব দেশ অপেক্ষাকৃত শক্তিমান এবং ঐশ্বর্যশালী এবং যেখানে অভিজ্ঞ এবং জনচেতা নাগরিকেরও অভাব নেই, সেই সব দেশকেও ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তা ক্রমশঃ অধিকতর পরিমাণেই গ্রহণ করতে হবে। এই ভবিষ্যৎবাণী করা যায় এই জন্য যে, বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং ঐশ্বর্যশালী যে রাষ্ট্র সেও সমগ্র মনুষ্যজাতির তুলনায় এবং গোটা দুনিয়ার সম্পদের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। তাছাড়া, যে যুগে আমরা বলতে পারি যন্ত্রবিজ্ঞান দূরত্বকে নিশ্চিহ্ন করেছে, সে যুগে মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ডই আঞ্চলিকতার এবং জাতীয়তার সীমাবদ্ধ গণ্ডী পেরিয়ে বিশ্ব-ব্যাপকতায় পরিণতি লাভ করতে চাইছে। যে যুগে মানুষের কর্মকাণ্ডের জন্য গোটা বিশ্বের বৃহৎ প্রয়োগক্ষেত্র প্রয়োজন হচ্ছে, সে যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা সোভিয়েট ইউনিয়নের মতো বিরাটাকার রাষ্ট্রের পক্ষেও পারস্পরিক নির্ভরতার প্রশ্ন জীবনধারণের অন্যতম প্রয়োজনরূপে দেখা দেবে।

অবশ্য যে বিশ্বে যন্ত্রবিজ্ঞান দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে সেখানেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বকীয় ভূমিকা থাকবে তো বটেই, গুরুত্বপূর্ণরূপেই থাকবে। কতকগুলি পৌর কার্যাবলী স্বভাবতই স্থানীয় কর্তৃপক্ষের পালনীয় কর্তব্য। পয়ঃপ্রণালী রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষুদ্র হলেও গুরুতর কাজ। তা ছাড়া বিশ্বজনীন সমাজে অংশীদার প্রান্তীয় রাষ্ট্রগুলিকে সাংস্কৃতিকক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা অতীতের মনুষ্যগ্রাসী দৈত্যাকার রাষ্ট্রগুলির তুলনায় নূতন যুগের এই রাষ্ট্রগুলিতে সাংস্কৃতিক বিষয়ের উপরে বহুগুণ বেশী গুরুত্ব আরোপিত হবে। মনুষ্যজাতির প্রাণরক্ষার খাতিরেই এই দৈত্যরাষ্ট্রগুলির দন্তপংক্তি উৎপাটন করা দরকার। অর্থাৎ আঞ্চলিক রাষ্ট্র-গুলির যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার যে চিরাচরিত স্বাধিকার ছিল তা কেড়ে নিতে হবে। কিন্তু হিংস্রনখদন্তবর্জিত হলেই তার চেহারায় যে আর কোনো জৌলুস থাকবে না এমন কোনো কথা নেই। ঐক্যবদ্ধ বিশ্বরাষ্ট্রে তাদের ভূমিকা আরো আকর্ষণীয় হবে, কারণ লাবণ্যময় এবং সুস্থ জীবন লাভের জন্য ঐক্যের-মধ্যে-বৈচিত্র্যমূলক যে সংস্কৃতির প্রয়োজন, তা এই রাষ্ট্রগুলিই সৃষ্টি করবে।

কিন্তু সাংগঠনিক ঐক্য লাভ করতে হলে কতকগুলি ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, তার মধ্যে সমীকরণ এবং সামঞ্জস্যবিধান অন্যতম। এই ত্যাগ স্বীকার শুধু যে প্রাণান্তক মারণান্তের ভয়ে বাধ্য হয়ে আমাদের করতে হবে, তা নয়। বিশ্বব্যাপকতার অভিমুখে

মানুষের সকল প্রকার কর্মকাণ্ডের যে গতি দেখা যাচ্ছে, তার জন্যও এই ত্যাগ স্বীকার প্রয়োজন। কিন্তু যন্ত্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই বিশ্বব্যাপী ঐক্য যতটা হত্যাশাব্যঞ্জক, ন্যায়াদর্শের বেলায় তা হবে না বরং সেখানে এই ঐক্য উদ্দীপনার সঞ্চার করবে। সমস্ত মনুষ্য জাতিকে নিয়ে যে বিশ্বব্যাপী সৌভ্রাত্রবোধ জন্মলাভ করবে তার ফলে আন্তরিক উদ্দীপনা দেখা দিতে বাধ্য।

যাই হোক, ন্যায়াদর্শের ক্ষেত্রে এবং যন্ত্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একদিকে এই যে বাঞ্ছনীয় এবং অনিবার্য ঐক্য সাধিত হবে, তার অন্যদিকে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যগুলিকে বাঁচিয়ে রেখে। এই বিষয়গুলিতে আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলি তাদের যথোচিত কর্তব্য খুঁজে পাবে।

যেমন ধরুন ভাষার ক্ষেত্রে। আমরা বিশ্বসংগঠনের এমন একটা স্তরে ইতিমধ্যেই উপনীত হয়েছি যে, এখন কোনো আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কেউ যদি কোনো অংশ গ্রহণ করেন, অথবা কেউ যদি পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে কোনো একটি গ্রন্থ রচনা করেন তাহলে দুই-তিনটি আন্তর্জাতিক ভাষার মধ্যে কোনো একটির বা দুইটির সাহায্য তাঁকে নিতে হয়। এক্ষেত্রে যে ভাষার প্রচলন সবচেয়ে বেশী তারই মারফৎ তাঁকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছুতে হ'বে, সেইজন্য সর্বাধিক প্রচলিত ভাষার কোন একটি গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে প্রায় বাধ্যতামূলক। কিন্তু এই ধরনের কোনো *lingua franca* বা সর্বজনীন ভাষা ব্যবহারের কল্পনাও কোনো কবির পক্ষে সম্ভব নয়, যদি দৈবক্রমে সেই সর্বজনীন ভাষা তাঁর মাতৃভাষা না হয়। ক্লাসিক্যাল ভাষায় মহৎ কাব্য যে রচিত হয়নি তা নয়, কিন্তু তেমন কাব্যের সংখ্যা বিরল। ফরাসী-ভাষী কিংবা জার্মান-ভাষী পশ্চিমের কোনো কোনো কবি হয়ত ত্রয়োদশ শতাব্দীর খৃষ্টীয় যুগে ল্যাতিন ভাষায় কবিতা লিখে থাকবেন, হয়ত এই ধরনের সংস্কৃত কাব্যও থাকতে পারে। তথাপি একথা সত্য যে, কবির পক্ষে তাঁর মাতৃভাষাই একমাত্র স্বাভাবিক ভাষা।

এর থেকে বোঝা যায় যে, বিশ্বজনীন সমাজে ক্রমশই অধিকতর সংখ্যায় শিক্ষিত মানুষদের দ্বিভাষী কিংবা ত্রিভাষী হতে হবে। তাছাড়া নেদারল্যাণ্ড এবং সুইজারল্যাণ্ডের অধিকাংশ মানুষই তো আজকের দিনে ত্রিভাষী হয়ে পড়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করার জন্য সর্বজনীন ভাষা তো নয়ই, এমনকি আঞ্চলিক ভাষাও নয়, মাতৃভাষারূপে আরও ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীর, যেমন ওলন্দাজ কিংবা মালয়ালম ভাষার ব্যবহার থাকা প্রয়োজন। যে ভাষা অন্য লোকেরা শিখবার জন্য আগ্রহী নন, সেই রকম কোন ভাষা যদি কারো মাতৃভাষা হয় তাহলে নিজের স্বদেশীয় ভাষা ছাড়াও নিজের তাগিদেই সে অন্য কোনো একটি ভাষায়ও পড়া, লেখা এবং কথা বলার ক্ষমতা অর্জন করা প্রয়োজন বোধ করে। অপরপক্ষে একথাও সত্য যে হিন্দীভাষী বা ইংরেজিভাষীদের ন্যায় যাঁদের মাতৃভাষাই একটি সর্বজনীন ভাষা বা *lingua franca* তাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে স্বাভাবিক একটা প্রতিবন্ধক দেখা দেয়। ভাষাশিক্ষার ব্যাপারে বর্তমান পৃথিবীতে ইংরেজ ও ফরাসীরা রীতিমত কুখ্যাতি অর্জন করেছে। তারা আশাকরি স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে অন্য কোনো জাতের চেয়ে কোনো অংশেই খাটো নয়, কিন্তু যেহেতু দুনিয়ায় মাতৃভাষা দিয়েই তাদের কাজ চলে যায়, সেজন্য তারা স্বাভাবিক মনুষ্যোচিত আলস্যবোধের দাস হয়েছে। যতই হিন্দী ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করতে থাকবে ততই হিন্দীভাষীরাও এই আলস্যেরই দাস হয়ে পড়বে।

অবশ্য ইংরেজী ভাষীদের মত হিন্দীভাষীদের ভবিষ্যত অতটা অন্ধকার নয়, কারণ আন্তর্জাতিক প্রয়োজনের জন্য ইংরেজী, ফরাসী, অথবা রুশভাষার একটি তাদের শিখতেই হবে। কিন্তু হিন্দীভাষীরা যেন এর জন্য প্রস্তুত থাকেন যে ভবিষ্যতে দ্রাবিড় ভাষীরা বুদ্ধিবৃত্তির প্রখরতায় তাঁদের পিছনে ফেলে যাবেন। কারণ নয়াদিল্লীতে কর্মোপলক্ষে তাঁদেরকে হিন্দী শিখতেই হ'বে, নিউইয়র্ক কিংবা টোকিওর জন্য ইংরেজী এবং সায়গণ অথবা লিওপোল্ডভিলে কর্মোপলক্ষে তাঁরা ফরাসীও শিখবেন।

মানুষ যদি আত্মঘাতী সংগ্রাম থেকে রক্ষা পায় তাহলে আমার বিশ্বাস জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে আমাদের চিন্তাধারার পুনর্গঠন প্রয়োজন হবে। বর্তমান বিশ্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা আজকের দিনে যেটা যুগলক্ষণ, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছি। কারণ আত্মঘাতী ভবিষ্যৎ আমাদের সম্মুখে। পৃথিবীর ইতিহাসে বর্তমান অধ্যায়ে মনুষ্য-জাতির সবচেয়ে বড় শত্রু এই জাতীয়তাবাদ, কারণ বিশ্বসংহতির পথে জাতীয়তাবাদই প্রধান প্রতিবন্ধক। কাজেই বর্তমানকালে এই জাতীয়তাবাদের হিংস্র নখদন্তগুলি উৎপাটিত করা আমাদের প্রধানতম কর্তব্য। যদি অবশ্য আমরা এই বিশ্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় একবার সার্থকতা লাভ করি তাহলে ক্রমে অধীনস্থ আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে এই বিশ্বসংস্থার ক্ষমতাই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। হয়ত এমন একদিনও আসতে পারে যে, জাতীয়তাবাদের প্রভাবকে আর লঘু করে না দেখিয়ে বরং এর গুরুত্ব বৃদ্ধি করার দিকে চেষ্টা শুরু করতে হবে, যাতে এই আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলি একেবারে হৃতশক্তি এবং অসমর্থ হয়ে না পড়ে। এই সমস্ত আঞ্চলিক রাষ্ট্রের নাগরিকেরা যদি নিজেদের রাষ্ট্র সম্বন্ধে একেবারেই নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন এবং এদের সম্বন্ধে অযত্ন দেখা দেয় তাহলে আঞ্চলিক জীবন ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য তো ধ্বংস হবেই, এমনকি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনেরও পরিসমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রীকরণ এবং সম্পূর্ণ সমীকরণের এই পর্ব যদি চলতে দেওয়া হয় তাহলে মানুষের জীবনে বৈচিত্র্যহীনতার দৈন্য যে দেখা দেবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাছাড়া এর ফলে সমস্ত ব্যাপারে মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন ক্ষমতার অধিকারী এবং উদ্যোগের কর্তা হবেন।

এই বিপদেরই একটি দৃষ্টান্ত আছে রোমান সাম্রাজ্যে 'অগষ্টান শান্তির' আমলে। গ্রীকো-রোমান সাম্রাজ্য যখন ধ্বংসের মুখে উপনীত হয়েছিল তখন এই সংগঠনমূলক রাষ্ট্রনীতি তাকে রক্ষা করে। বর্তমান দুনিয়ায় যেমন nation-state তেমনি গ্রীকো-রোমান সভ্যতায় নগররাষ্ট্র বা city stateগুলি ক্রমাগত অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা সভ্যতাকে প্রায় ধ্বংসের কিনারায় এনে দিয়েছিল। এই সময় তাদের মধ্যে আভ্যন্তরীন যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়, কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণার এই বহু-অপব্যবহৃত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা ছাড়া তাদের ব্যাপকতম ক্ষমতার আর কোনো খর্বতা সাধন এর উদ্দেশ্য ছিল না। ব্যাপকতম স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন এবং ন্যূনতম কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্য তখনও সম্মুখে ছিল। এই রাজনৈতিক কাঠামোর পরীক্ষায় একটা সম্ভাবনীয়তা ছিল। কিন্তু এর সার্থকতার জন্য দরকার দুইটি ভিন্ন প্রকৃতির আনুগত্য বোধের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান। প্রথমত রোমান বিশ্বরাষ্ট্রের প্রতি মুখ্য আনুগত্য রাখতে হবে এবং দ্বিতীয়ত রোমান সাম্রাজ্যের রাজনীতিক দেহে নগররাষ্ট্রগুলি পৌরশাসনের যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ সৃষ্টি করেছে, তার প্রতি রাখতে হবে দ্বিতীয় স্তরের আনুগত্য—'রোমান শান্তির' প্রথম পর্বে এই দুই শ্রেণীর আনুগত্যবোধের মধ্যে সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয়েছিল। যেমন সেণ্ট পল,

তিনি রোমান বিশ্বরাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করতেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর জন্মস্থল, টার্সাস নগর রাষ্ট্রের নাগরিক রূপেও তাঁর গর্ববোধ ছিল। কিন্তু কালক্রমে রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা পৌরশাসন সম্বন্ধে নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে এবং পৌর-গভর্ণমেণ্টগুলি ধ্বংস হয়, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে তাদের পরিচালন ক্ষমতা নিতে হয়, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট তার ফলে মাথা-ভারী হয়ে উঠে এবং প্রধানত এরই জন্য অবশেষে রোমান সাম্রাজ্যেরও পতন এবং বিনাশ ঘটে। অবশ্য আমাদের বিশ্বরাষ্ট্রের এখনো পত্তনই ঘটেনি, কাজেই আপাততঃ এই ইতিহাসের নজীর স্মরণ না করলেও চলতে পারে। কিন্তু আগামীদিনে যখন সার্থকভাবে বিশ্বরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটবে সেদিন আমরা যেন রোমান ইতিহাসের এই অধ্যায়টি স্মরণে রাখি।

ইতিমধ্যে আমাদের সবচেয়ে জরুরী এবং সমূহ কর্তব্য হচ্ছে জাতীয়তাবাদের বিভেদ-মূলক শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা এবং মানবিক ক্রিয়াকর্মের যে সকল স্রোত বিশ্বের ঐক্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে সেগুলিকে বলীয়ান করা। এই কর্তব্য নিঃসন্দেহে দুরূহ, হয়ত এক এক সময় নৈরাশ্যজনকও হতে পারে। যখন মন এই প্রকার নৈরাশ্যে আচ্ছন্ন হতে চাইবে তখন আমরা উৎসাহ ফিরে পাব যদি পৃথিবীর ইতিহাসে বর্তমান অধ্যায়কে অতীতের পটভূমিতে রেখে দেখি। সেই পটভূমিতে দেখা যায় যে, মানুষের এই ঐক্যকামী প্রচেষ্টা মানুষের সভ্যতার মতই পুরাতন এবং দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে যেদিন সভ্যতার প্রভাত সূর্য উদিত হয়েছিল সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত এই ঐক্য কামনা কেবলি অধিকতর বলে বলীয়ান হয়ে চলেছে। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, মানবজাতির মধ্যে ঐক্য বিধানের জন্য এই প্রচেষ্টা আমরা বর্তমান প্রজন্মেই প্রথম আরম্ভ করিনি। উচ্চস্তরের ধর্মগুলির সন্ন্যাসী-প্রচারকেরা সর্বদাই এই লক্ষ্য অনুসরণ করেছেন। এই শ্রেণীর ধর্মের মধ্যে অন্ততঃ তিনটি—বৌদ্ধ, খৃষ্ট এবং ইসলাম ধর্ম মনুষ্যজাতিকে অভিন্ন ঐক্য বন্ধনে আবদ্ধ করার লক্ষ্যের প্রতি অচঞ্চল দৃষ্টি রেখেছিল। আজ পর্যন্ত এদের কেউই শেষ উদ্দেশ্য সার্থক করতে পারেনি। এখনও যে এই তিনটি ধর্ম পাশাপাশি প্রচলিত আছে তা থেকেই প্রমাণ হয় যে, নিজেদের লক্ষ্য সাধনের কার্যক্রমে এরা কে কতখানি ব্যর্থ হয়েছে। তথাপি, গোটা পৃথিবী না হোক, এক মহাদেশ ছাপিয়ে অন্য মহাদেশ পর্যন্ত এই ধর্মগুলি বিস্তৃতি লাভ করেছিল এবং করেছিল সেই যুগে যে যুগে নব্য যন্ত্রবিজ্ঞান 'দূরত্বকে নিশ্চিহ্ন করেনি'। আজকের দিনে জড়প্রকৃতিকে আয়ত্ত করার ফলে আমরা তো শুধু অশুভ শক্তিই লাভ করিনি, জড়জগত থেকে আমরা শুভ শক্তিও লাভ করেছি। এবং পৃথিবীকে ঐক্যবদ্ধ করার এই বর্তমান প্রচেষ্টায় সেই শক্তি আমাদের সহায়ক আছে। অতীতকালে সন্ন্যাসী প্রচারকদের আমলে জড় বিজ্ঞানের কোনো শক্তিই তাঁদের করায়ত্ত ছিল না, একমাত্র হাওয়া-কল বা উইণ্ড মিল ছাড়া। সেকালে স্থলপথে তাঁদের একমাত্র অবলম্বন ছিল নিজের শারীরিক শক্তি, অথবা গৃহপালিত জন্তুর সাহায্য। তবু, যোগা-যোগের এই যৎসামান্য উপায়টুকু অবলম্বন করেই তাঁরা চলে গেছেন নিজেদের বাণী নিয়ে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে।

যোগাযোগের নব্য উপকরণ তাঁদের ছিল না, কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর মানুষের মধ্যে নিজের ধর্মকে প্রচার করার যে দুঃসাহসিক ব্রত তাঁরা নিয়েছিলেন, তাতে একটি সহায়ক শক্তি তাঁদের স্বপক্ষে ছিল। তাঁদের প্রচার অভিযান আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তার আরম্ভ হয়েছিল। অবশ্য 'বিশ্বব্যাপী' কথাটা তৎকালের কোনো সাম্রাজ্যের

ক্ষেত্রেই পুরোপুরি প্রযোজ্য হতে পারে না, কিন্তু সৌদিক থেকে দেখলে ধর্মবিস্তারের অভিযানও ষোলআনা অর্থে কখনোই 'বিশ্বব্যাপী' হতে পারেনি। আক্ষরিক অর্থে এই সাম্রাজ্যগুলি বিশ্বব্যাপী ছিল না, কিন্তু সুবিশাল অঞ্চল জুড়ে কয়েক শতাব্দীব্যাপী তাদের শাসনাধিপত্য বিস্তৃত ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শতাব্দীর পর শতাব্দী একই শাসন চলেছে, কিন্তু তার মধ্যে অনৈক্য অথবা নৈরাজ্য দেখা দেয়নি। এই সব সাম্রাজ্য-শক্তিগুলি শুধু যে নিজেদের রাজত্বের মধ্যে সমুদ্রপথ বা স্থলপথ পাহারা দিয়েছে এবং নিরাপদ রেখেছে তা নয়, তারা সেতু নির্মাণ, পান্থশালা স্থাপন এবং অশ্বারোহী ডাক-হরকরার প্রবর্তন করে এইসব স্থলপথকে এবং পোতাশ্রয় নির্মাণ করে জলপথগুলিকে নানা-ভাবে সুগম করেছিল।

ইতিহাসে সর্বত্র যে সাম্রাজ্যশক্তি ধর্মপ্রচারে স্বেচ্ছায় সহায়ক হয়েছে তা নয়। কিন্তু তাদের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সাহায্য ধর্মপ্রচারকেরা লাভ করেছেন সন্দেহ নেই। পৃথিবীতে তিনজন সম্রাটের আমরা নাম করতে পারি—অশোক, কণিষ্ক এবং কনস্ট্যানটাইন, এঁরা কোনো একটি বিশ্বধর্মের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং সেই ধর্মপ্রচারের জন্য আপন সাম্রাজ্যের যাবতীয় শক্তি ও সম্পদ নিয়োগ করেছিলেন। অশোক থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য মৌর্য সাম্রাজ্যকে, কণিষ্ক মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য কুশান সাম্রাজ্যকে এবং কনস্ট্যানটাইন খৃস্টধর্ম প্রচারের জন্য রোমান সাম্রাজ্যকে কাজে লাগিয়েছিলেন।

অতএব বিশ্বধর্মগুলির প্রচার ও বিস্তারে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যগুলি যে সহায়তা দান করেছে তা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত-ভাবেও ঘটেছে। কিন্তু বিশ্বসাম্রাজ্য এবং বিশ্বধর্ম স্বভাবতই একে অপরের সঙ্গী, কারণ এদের মধ্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। উভয়েই, যতই ভিন্ন দিক থেকে হোক না কেন, সমগ্র মনুষ্য জাতিকে একটি ঐক্যবন্ধ সমাজবন্ধনে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এদের মধ্যে আরো একটা সাদৃশ্যের বিষয় এই যে, উভয়েরই উপর্যুপরি ধ্বংসের প্রতিক্রিয়া থেকে এবং উভয়েরই উদ্দেশ্য রচনাত্মক প্রচেষ্টার দ্বারা সেই ধ্বংসের ক্ষতিপূরণ করা।

অতীত কালে প্রান্তীয় সভ্যতাগুলির বিকৃত সন্তানরূপে এই ধ্বংসলীলা বার বার দেখা দিয়েছে। এই বিকৃতির মূল কারণ ছিল আভ্যন্তর কলহ, সে কলহের উৎপত্তি অনৈক্য থেকে। আমাদের আজকের দিনের সভ্যতার ন্যায় অতীত কালের সভ্যতাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন সার্বভৌম প্রান্তীয় রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পূর্ণ স্বাধিকার এদের ছিল এবং স্থানীয় স্বার্থের অনিবার্য সংঘর্ষের পরিণতি রূপে তাদের মধ্যে এই যে যুদ্ধ দেখা দিত, তা ক্রমশঃ অধিকতর বৈনাশিক চেহারা নিতে আরম্ভ করে। বৈষয়িক ক্ষতির চেয়েও নৈতিক বিনাশ আরো ব্যাপকতর হত। তাছাড়া এই নৈতিক ধ্বংসলীলার ক্ষতিপূরণও দুঃসাধ্য ছিল। স্থানীয় রাষ্ট্রগুলিকে শান্তিস্থাপনে বাধ্য করল এই সাম্রাজ্য-গুলি, তাদের অধীনে হয় স্থানীয় রাজ্যগুলির অবলোপ ঘটানো হল অথবা কোনো একটি স্থানীয় রাজ্যের তাঁবে অন্যগুলিকে অধীনস্থ করে রেখে এই আন্তঃরাজ্য সংঘর্ষ থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বসাম্রাজ্যগুলি মাথা তুলে দাঁড়াল। কিন্তু সমাধান চেষ্টায় বিশ্বধর্মগুলি আরো গভীরভাবে এই সমস্যার কেন্দ্রমূলের কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছে। এই সব ধর্মের স্রষ্টা ও প্রচারকর্তারা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, যে বৈনাশিক রাজনীতি থেকে এই অন্তঃরাজ্য সংঘর্ষ-গুলির উৎপত্তি, তার গোড়ায় একটা ন্যায়াদর্শের প্রশ্ন জড়িত আছে। কাজেই ন্যায়াদর্শের ভিত্তিতেই একমাত্র এর সমাধান ঘটতে পারে। সমাধান হিসাবে তারা প্রত্যেকটি নরনারীকে

স্বতন্ত্রভাবে এবং সরাসরি আধ্যাত্মিক বাস্তবের সঙ্গে সাম্নিধ্যযুক্ত এবং সাযুজ্যময় করার পথে অগ্রসর হলেন। এই অধ্যাত্মতৃষ্ণা বোধ হয় সমস্ত উচ্চমার্গের ধর্মেই রয়েছে। অবশ্য একথাও সুবিদিত যে, ধার্মিক জীবন যাপন সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মের অনুশাসন এবং আধ্যাত্মিক বাস্তব সম্বন্ধে তাদের ধারণায় প্রচুর পার্থক্য এবং বিরোধ রয়েছে।

পূর্বেই আমি একথা বলেছি যে, না বিশ্ব-সাম্রাজ্য, না বিশ্ব-ধর্ম, কোনোটাই ষোলো-আনা অর্থে গোটা মনুষ্য জাতিকে এক সমাজবন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেনি। ষোলো-আনা অর্থে দেখলে, আজই সর্বপ্রথম যেহেতু যন্ত্রবিজ্ঞান দূরত্বকে নিশ্চিহ্ন করতে সমর্থ হয়েছে সেই হেতু বিশ্বজনীন সমাজ সম্ভবপর প্রস্তাবরূপে এবং সেই সঙ্গে সমূহ প্রয়োজনরূপেও দেখা দিয়েছে। বর্তমান অবস্থায় বিশ্বব্যাপী ঐক্যবন্ধতা ছাড়া আর কোনো উপায়েই মনুষ্যজাতি আত্মবিনাশ থেকে রক্ষা পেতে পারবে না। একালে আমাদের এই যে কর্তব্য, সে যেমনি দুরূহ তেমনি সমুহও। কাজেই আমাদের পূর্বপুরুষদের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং তাঁদের দেওয়া শিক্ষায় আমাদের চৈতন্য লাভ করতে হবে।

তাঁদের দেওয়া একটি শিক্ষা অতিশয় স্পষ্ট। অতীত কালের সাম্রাজ্যস্রষ্টারা যে সামরিক অস্ত্রের দ্বারা, বিশ্বব্যাপী ঐক্যস্থাপনের চেষ্টায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, আজকের পারমাণবিক যুগে সে পন্থতি অচল। এমনকি, যে কালে মানুষ তাঁরধনুকে দিয়ে লড়াই করত সে কালেও লড়াইয়ের পথে এবং রাজ্যবিস্তারের দ্বারা বিশ্বজনীন রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করতে গেলে চরম নৈতিক ও বৈষয়িক ক্ষতি সাধিত হত। বিশ্বব্যাপী ঐক্য দূরে থাকুক, যত বার ঐ পন্থতিতে অতিকায় সাম্রাজ্যের ঐক্য স্থাপিত হয়েছে, ততবারই সমাজকে এই হীন এবং বর্বর পন্থতি গ্রহণের জন্য নিজের অপূরণীয় ক্ষতিও ঘটাতে হয়েছে। অপর পক্ষে আজ পারমাণবিক যুগে যদি এমনি বলপ্রয়োগের পন্থায় বিশ্বব্যাপী ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা ঘটে তাহলে মনুষ্যজাতির ঐক্য নয়, ধ্বংসই অনিবার্য। অতএব রাজনীতির স্তরে এই ঐক্য যদি স্থাপন করতে হয় তার একমাত্র সার্থক পথ হচ্ছে অতীত কালের ধর্মপ্রচারকদের পন্থতি গ্রহণ করা। সেকালে তাঁরা উপদেশ, আলোচনা ও বাণীপ্রচারের দ্বারা বিপক্ষের হৃদয়-পরিবর্তনের যে-চেষ্টা করেছেন, অদ্যকার দিনে গণতান্ত্রিক যুগে আমাদের অতিকায় সমাজ-সংগঠনগুলিতে সেই পন্থতিকে প্রয়োগ করতে হবে গণ-আবেদনরূপে—এককথায়, প্রচারকলার সাহায্যে। অবশ্য এই প্রচারকলার অপব্যবহারের সুযোগ যেখানে প্রশস্ত সেখানে আমাদের এবিষয়েও সতর্ক হতে হবে যাতে এর অন্যায় ব্যবহার না ঘটতে পারে। যাই হোক, পারমাণবিক যুদ্ধে বিপদের তুলনায় প্রচারবিদ্যার অপব্যবহারের বিপদ অতি নগণ্য।

বিশ্ব-ধর্ম এবং বিশ্ব-সাম্রাজ্যগুলি ষোলো-আনা অর্থে বিশ্বব্যাপী ছিল সত্য, কিন্তু এই সব ধর্মাবলম্বীদের কিংবা সাম্রাজ্যের প্রজাপুঞ্জের মানসিক জগতে এই প্রতীতি ছিল যে, তাদের ধর্ম কিংবা সাম্রাজ্য যথার্থই বিশ্বব্যাপী। যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান এবং খৃস্টানদের কাছে তাদের স্ব স্ব ধর্মগুলি বিশ্ব-ধর্ম ছিল, অথচ কার্যত এই চারটি ধর্মমত পাশাপাশি সহাবস্থান করে এসেছে। অনুরূপভাবে দেখা যায় যে, চীন-সাম্রাজ্যের প্রজাবৃন্দ তাদের রাজত্বকেই 'ত্রিভুবনব্যাপী' বলে জ্ঞান করেছেন, অথচ একই সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের অধিবাসীরাও নিজেদের রাজত্বকেই 'তাবৎ মনুষ্যবাসিত জগৎ' মনে করতেন। এই দুইটি সাম্রাজ্যই মানবিক প্রত্যয়ের দিক থেকে বিশ্বরাষ্ট্রের আকার গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু এই ভূপৃষ্ঠে উভয়েই সমসাময়িক। যাই হোক, বিশ্ব-সাম্রাজ্য অথবা বিশ্ব-ধর্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যাঁরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেই প্রত্যয়ের দিক থেকে যাঁরা বিশ্বজনীন

সমাজের অঙ্গীভূত হয়েছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন আছে। ভবিষ্যতে ঐক্যবদ্ধ মানবপরিবারের অঙ্গীভূত হতে কেমন লাগবে তার খানিকটা পূর্বাভাস এই মনস্তত্ত্বের মধ্যেই পাওয়া যাবে। ব্যবহারিক দিক থেকেও ভবিষ্যতের এই পূর্বাভাস অবগত হওয়া প্রয়োজন। সম্পূর্ণ বিশ্বজনীন ঐক্য যদি আমরা লাভ করি কিংবা যখন আমরা লাভ করব তখন একদিকে যেমন আমাদের বহু সমস্যার নিষ্পত্তি হবে তেমনি অন্যদিকে আবার আমাদের জন্য কিছু সমস্যাও উপস্থিত হবে। এই ব্যাপারে আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব।

প্রাচীন কালের আঞ্চলিক সভ্যতা যে বিকারগ্রস্ত বৈনাশিক মূর্তি গ্রহণ করেছিল তার থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যই বিশ্বধর্ম এবং বিশ্বসাম্রাজ্য পত্তনের চেষ্টা। এবং মানবজাতির ঐক্যবিধানের পথে এই দুইটি প্রচেষ্টা পথচিহ্নিকার ন্যায় রয়েছে। কিন্তু সভ্যতার পতন ঘটার ফলেই মানুষ ঐক্যের দিকে ধাবমান হয়নি। প্রাক্তন সভ্যতার সূচনার সঙ্গে সঙ্গে এবং সেই সূচনারই ফলস্বরূপ মানবজাতির ঐক্যসাধনের আন্দোলনও জন্মলাভ করেছিল, কিন্তু তৎপরবর্তী কালে এই সভ্যতাগুলির বিনাশ আবার উক্ত ঐক্যসাধনের আন্দোলনকে নূতন গতিবেগও দিয়ে গেছে।

সভ্যতার সূচনা থেকেই মনুষ্যজাতি নিজের যে সর্বনাশ নিজে ডেকে এনেছে তার মধ্যে, আমার মনে হয়, সবচেয়ে বড় সর্বনাশ এই অনৈক্য। স্থানীয় স্বার্থের প্রতি আমাদের অবিমিশ্র আসক্তি কিংবা প্রান্তীয় সমাজের প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্য এই অনৈক্যের মূল। আজ ঐক্য-সাধনের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা গুরুতররূপে দেখা দিয়েছে সত্য, তথাপি এখনও ঐক্যের পথে উক্ত কারণগুলি প্রধান প্রতিবন্ধক। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে সভ্যতার যখন প্রথম বিকাশ ঘটেছিল তার অব্যবহিত প্রাক্কালে মনুষ্যজাতি এই প্রান্তীয় স্বার্থের স্নেহাসক্তি অর্জন করে, কিন্তু এই আসক্তির আতিশয্য এখনও অজর হয়ে রয়েছে। মানুষের অর্থনৈতিক এবং সমাজ-নৈতিক জীবনে সবচেয়ে বড় বিপ্লব সাধিত হয়েছিল কৃষিপন্থতির আবিষ্কারের দ্বারা। প্রাচীন কালে প্রাক্-কৃষি-যুগের যে-মানুষেরা স্থান থেকে স্থানান্তরে অন্নের অন্বেষণে এবং আহার্য শিকারে ঘুরে বেড়াত, তাদেরও নবাযুদ্ধের শিল্পপ্রমিকের মত কোনো প্রান্তীয় আসক্তি ছিল না। এই উভয়ের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে লক্ষণীয় যে, কৃষকের বৃত্তিই এমন যে, সে স্থাবর হতে বাধ্য। তার কাছে তার গ্রামীণ সমাজটুকুই বিশ্বভুবন। ঐ সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে তার মনের দিগন্ত চিহ্নিত হয়েছে। সভ্যতার যুগে সমস্ত প্রান্তীয় সমাজের মধ্যেই এই গ্রামীণ সমাজের মনোবৃত্তি বিস্তৃতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। যদিও বর্তমানে প্রান্তীয় সমাজগুলি ভারত, চীন, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আকার আজকের দিনে লাভ করেছে তথাপি এদের নাগরিকেরা সেই গ্রাম্য মনোবৃত্তি থেকে মুক্তি পায়নি।

সভ্যতা যুগে যুগে মানুষের প্রান্তীয় আসক্তির এই শিকড়গুলির মূল উৎপাটন করে মানুষকে ঐক্যবন্ধতার সার্থকতায় পৌঁছোনোর জন্য মুক্তি দিতে চেয়েছে। যদি কোনো সর্বনাশ না ঘটে তাহলে সমস্ত মানবজাতিকে ঐক্যপাশে আবদ্ধ করার দিন অবশ্যম্ভাবী। প্রখ্যাত মার্কিন নৃতত্ত্ববিদ্ রবার্ট রেড্‌ফিল্ড্ বলেছেন যে, সভ্যতা আসলে বি-কৌমীকরণের প্রক্রিয়া মাত্র। নিঃসন্দেহে এ-কথা সত্য। কৃষকসমাজকে কৌমীকতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার যে প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত জানা যায় তা ঘটেছিল সবচেয়ে প্রাচীন নগরীর পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে—জর্ডন উপত্যকায় জেরিকো নগরীর পত্তনের দৃষ্টান্ত আমি দিতে চাইছি। তার পর থেকে ক্রমশঃ নগরীকরণের প্রক্রিয়ায় প্রান্তীয় আসক্তির মূলচ্ছেদ অব্যাহতভাবে চলেছে, যার

ফলে আজ ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ স্থান জুড়ে বলতে গেলে একটিই অভিন্ন নগরী পরিব্যাপ্ত। যদিও পেশাগত ভিত্তিতে মনুষ্যজনসংখ্যাকে ভাগ করলে এখনও কৃষকদের সংখ্যাই সর্বাধিক, তথাপি কার্যত শ্রমিকের প্রতিমূর্তিরূপে কৃষকের স্থান আর নেই। তার স্থান নিয়েছে যন্ত্রচালকরূপী শিল্পশ্রমিক, কিন্তু এক্ষেত্রেও সেই শ্রমিক নারী বা পুরুষ কারখানার স্থাবর যন্ত্র পরিচালনা করছে না—শ্রমিকের মূর্তির প্রতীকরূপে দেখানো হচ্ছে তাদেরকেই যারা জলগম, জলে স্থলে, অথবা আকাশে যারা চলমান যন্ত্রের সারথি। অর্থাৎ কৃষির পত্তনের ফলে সাময়িকভাবে মনুষ্যসমাজের যে স্থবিরতা ঘটেছিল তার থেকে মুক্তিলাভ করে মানুষ পুনরায় চলমান হয়েছে। তার এই যাত্রা বিশ্বের ঐক্য বিধানের আন্দোলনে প্রতিফলিত হচ্ছে। গত পাঁচ হাজার বৎসর যাবৎ এ যাত্রা চলেছে, তথাপি প্রস্তর যুগের (Neolithic) সমাজ-মানসকে এখনও আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আমাদের আচরণ এমন যাতে মনে হয় যে, আমরা এখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজেরই অন্তর্গত।

॥ তিন ॥

সর্বশেষে আমি যে বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করতে যাচ্ছি, তা আমার মূল বিষয়বস্তুর অপরিহার্য অংশ। কিন্তু এই আলোচনায় আমার সঙ্কোচ এই যে, প্রসঙ্গটি ভারতবর্ষের মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত, আমি একে দেখছি বাইরে থেকে, তাঁরা দেখছেন ভিতর থেকে।

আমার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় তিনটি। তার মধ্যে প্রথম কথা এই যে, আজ যেখানে ইরাক অবস্থিত সেখান থেকে পৃথিবীর আদি সভ্যতার বিস্তার প্রথম যেদিন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দিকে যাত্রা আরম্ভ করেছিল, সেইদিন থেকে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষ এই পৃথিবীর ভারকেন্দ্রের স্থান অধিকার করে রয়েছে। দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষের মধ্যে সমগ্র বিশ্বের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। আজকের দিনে মানবজাতির সবচেয়ে যেগুলি বড় সমস্যা তারও অধিকাংশই ভারতবর্ষে স্পষ্টরূপে বিদ্যমান। তৃতীয়ত, এই মানবিক সমস্যাগুলির সমাধান প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষ একটি দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছে, তাতে বর্তমান জগতের সমস্যারও প্রতিকার ঘটতে পারে। এই বিষয়গুলিই এক-একটি করে আমি আলোচনা করব।

ভারতবর্ষ যে পৃথিবীর কেন্দ্রাভিষিক্ত সেকথা সুবিদিত। উত্তর-পূর্ব প্রান্তে জাপান থেকে শুরু করে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে আয়ল্যাণ্ড পর্যন্ত প্রান্তীয় সভ্যতার যে মেখলা বিস্তৃত, ভারতবর্ষ তার কেন্দ্রবন্ধনীর মতো। দুই প্রান্তের মাঝখানে কণ্ঠহার যেমন নীচের দিকে নেমে আসে তেমনি সভ্যতার এই মেখলাও মাঝখানে বিষুবরেখা অতিক্রম করে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত নেমে গেছে। ইতিহাসে বহু অনাবিষ্কৃত দেশ একে একে এই মেখলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, ক্রমে ক্রমে রাশিয়া, উত্তর ইউরোপ, বিষুব আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড সভ্যতার বেষ্টনীর অন্তর্গত হয়েছে। কিন্তু এত সব পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্যেও ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় অবস্থিতি যেমন ছিল আদি যুগে, তেমনি আছে আজও।

কিন্তু ভারতবর্ষের এই কেন্দ্রীয় অবস্থিতি শুধু ভৌগোলিক নয়। বর্তমান মুহূর্তে একথা সুবিদিত যে, বিশ্বব্যাপী মতাদর্শের লড়াইয়ে ভারতবর্ষ ভারকেন্দ্রের স্থান অধিকার করে রয়েছে। আজকের দিনে এশিয়ায় পরিষদীয় গণতন্ত্রের প্রভাব সুবিদিত, কিন্তু তার

প্রধান কারণ ভারতবর্ষ এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। যদি ভারতবর্ষ অন্য কোনো মত অবলম্বন করে তাহলে ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী প্রত্যেকটি দেশে তার ঢেউ গিয়ে পৌঁছবে। মধ্য এশিয়া এবং আফ্রিকাও তার আঘাত এড়াতে পারবেন। কিন্তু রাজনীতির চেয়েও মানুষের জীবনে ধর্মের প্রভাব আরও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে যতগুলি মহান ধর্মমত প্রচলিত আছে তার অর্ধেক জন্মলাভ করেছে এই ভারতবর্ষেই। কেবল হিন্দু ও বৌদ্ধদের সংখ্যাই আজকের পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক দাঁড়ায়। অর্থনৈতিক দিক থেকেও পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। প্রথম দারিয়ুসের আমল থেকে পারস্য সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ইতিহাস যদি লক্ষ্য করা যায়, যদি সিন্ধুনদের অববাহিকার সঙ্গে এবং মিশরের সঙ্গে জলপথে গ্রীকো-রোমান জগতের সংযোগ স্থাপিত হওয়ার পরবর্তী ইতিহাসে অর্থনৈতিক সূত্রগুলি লক্ষ্য করা হয়, যদি ভিনিস নগরীর প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালে খৃষ্টধর্মের মধ্যযুগীয় প্রসারের পরের দিকে আমরা তাকাই এবং কালিকটে ভাস্কো ডি গামার পদার্পণের পরবর্তীকালের আধুনিক পশ্চিমী জগতে অর্থনীতির দিকে যদি লক্ষ্য করি তাহলে বিশ্বের অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অবস্থিতির গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করা যাবে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও দেখা যায়, ভারতবর্ষে অন্তত চারটি সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল, যেগুলি বিশ্বরাষ্ট্র স্থাপনের প্রারম্ভিক পরীক্ষামূলক প্রয়াসরূপে অনায়াসে গণ্য হতে পারে।

অতঃপর আমার দ্বিতীয় প্রস্তাবনা সেইসব সমস্যা সম্বন্ধে যেগুলি বিশ্বেরও সমস্যা ভারতবর্ষেরও সমস্যা। ভারতবর্ষ স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তার কি কি সমাধান দেখছে সেবিষয়েও আমি আলোচনা করতে চাই। ইতিপূর্বে আমার বর্তমান আলোচনার দ্বিতীয় পর্বে প্রস্তরযুগের কৃষি সভ্যতা সম্বন্ধে আমি কিছু বলেছি। কোনো একটি সভ্যতা যখন বিস্তার লাভ করে তখন সে তার প্রান্তনকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলেনা। সেই প্রান্তনের উপরে নবাগত সভ্যতা আর একটি স্তর নির্মিত হয় এবং সেই স্তরের নীচে অবলুপ্ত, কিন্তু অন্তঃশীল প্রান্তন সভ্যতা থেকেই যায়। তেমনি গত পাঁচ হাজার বৎসর যাবৎ যত সভ্যতার জন্ম হয়েছে সমস্তই ঐ প্রস্তরযুগের কৃষিসভ্যতার ভিত্তির উপরে। গত পাঁচ হাজার বৎসরে কৃষকেরা দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, তাদের শ্রমের প্রসাদ ও সম্পদ শোষণ করে নিয়ে নগরসভ্যতার সংখ্যালঘু নাগরিকেরা সভ্যতার নব নব উপকরণ তৈরী করছে, কিন্তু সেই সভ্যতার উপকরণে এই উৎপাদনকারী কৃষক সমাজের কোনো ফলভোগের অধিকার থাকছে না। কোনোক্রমে ক্ষুন্নিবৃত্তি করার জন্য যৎসামান্য যা দিতে হয় পৃথিবীর কৃষক সমাজকে সেইটুকু দিয়ে বাকি সমস্ত সম্পদ যুগে যুগে শোষণ করে নেওয়া হয়েছে এক-একটি সভ্যতা নির্মাণ করা এবং ভাঙবার জন্য। দীর্ঘকাল যাবৎ কৃষকেরা জীবনের এই বাস্তবেই অভ্যস্ত হয়েছে—তারা নিজের জীবনের এবং ভাগ্যের উন্নতিতে আর কোন আশা রাখেনি।

কিছুকাল পূর্বেও কৃষকসমাজের এই বিশ্বাস ও মনোভাবের সঙ্গে বাস্তব অবস্থার পূর্ণ সংগতি ছিল। দুইশত বৎসর পূর্বে শিল্প বিপ্লবের আমল থেকে সংখ্যালঘু নগর সভ্যতার লোকেরাও উৎপাদনক্ষম হতে আরম্ভ করে এবং তখন থেকে এই কৃষকসমাজের সম্মুখেও ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু তার পূর্বে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর সেই উন্নতির কোনো চিহ্ন ছিল না। সেই সময় সুবিধাভোগী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দৈনন্দিন জীবনে খাদ্য উৎপাদন এবং অন্য কোন পণ্য প্রস্তুতি কিংবা বাণিজ্য ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ করতে হত না। এই সুবিধাভোগী সমাজের জন্য অফুরন্ত অবসর ছিল, যে অবসর থেকে সভ্যতার

নব নব আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনশীলতার জন্ম হয়েছে একদিকে, অন্যদিকে সভ্যতার পাপ এবং মূঢ়তাও দেখা দিয়েছে। যাই হোক্ আসল কথা এই যে, যে ক্ষুদ্র মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী সম্প্রদায় সৃজনশীলতা ও রচনাত্মক উদ্ভাবন ক্ষমতার সুযোগ লাভ করেছিল তারা গত পাঁচ হাজার বৎসরে যন্ত্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৃহৎ কোন উন্নতি ঘটাতে পারেনি। তাদের হৃদয় এবং মন নিবিষ্ট ছিল অন্য রচনাকর্মে—ভাস্কর্য, স্থাপত্য, শিল্প, কবিতা, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রণবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের চর্চা এবং সমুখে জীবন যাপনের স্বপ্নে। এই সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক কীর্তির নিদর্শন হিসাবে গিজার পিরামিড, আগ্রা পিকিং এবং ভার্সাই-এর প্রাসাদগুলি বিরাজমান। অন্যদিকে ধর্মের ক্ষেত্রে তাদের কীর্তি স্তম্ভস্বরূপ আংকরভাট, বড়ুদুধর, পিকিংএর স্বর্গমন্দির ও বেদী, ডারহ্যামএর গির্জা ইত্যাদি এখনও বিদ্যমান রয়েছে। এই সম্প্রদায় যন্ত্রবিজ্ঞানের দিকে মনোনিবেশ করেছে মাত্র দুইশত বৎসর পূর্বে। এতাবৎ-কালের মধ্যে আমাদের জীবদ্দশায়ই প্রথম দেখা গেল যে যন্ত্রবিজ্ঞান তথখানি উন্নতি লাভ করেছে যাতে এখন সভ্যতার প্রসাদ সমগ্র মানব জাতিকে সমান ন্যায়সংগত ভাগে বণ্টন করে দেওয়া যায়।

মোটের উপর পৃথিবীর এই চিত্র ভারতবর্ষের চিত্রেরই সমতুল। পৃথিবীর কৃষক সমাজের একটা বৃহৎ অংশ ভারতের সাঁমানার অন্তর্গত। এই সম্প্রদায়কে তাদের ন্যায়সংগত অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট এবং ভারতীয় জনসাধারণ একটি মহৎ প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এর আগেরবার ভারত সফরের সময় আমি বিভিন্ন রাজ্যে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার কিছু কিছু কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করেছি। এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য আমার মনে হয় কৃষক সমাজের মধ্যে আশা, বিশ্বাস, দৃঢ়তা ও উৎসাহ ফিরিয়ে আনা। এই প্রচেষ্টা যে কত বড় তা আমাদের অজানা নয়। এত বড় একটা বিপ্লব এত বড় এক ব্যাপক আকারে সাধন করতে গেলে তার মধ্যে কিছু কিছু নৈরাশ্য এবং বিঘ্ন দেখা দেবে একথাও সুনিশ্চিত। কিন্তু এই পরিকল্পনার স্বার্থকতার দিকে সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে, কারণ ভারতবর্ষ কৃষক সমাজকে অগ্রগতির পথে ডাক দিয়েছে। এ প্রচেষ্টা যদি সার্থক হয় সমস্ত দুনিয়ায় এর পরীক্ষা ও প্রয়োগ আরম্ভ হবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি আজকের বিশ্বে আর একটি সমস্যা, যাতে ভারতবর্ষ প্রতিকারের পথ দেখাচ্ছে। এবিষয়ে অধিক বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু এইটুকু বলা দরকার যে, ভারত সরকার এ বিষয়ে শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আরো একটি সমস্যা বিগত তিন হাজার বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষে বিদ্যমান। গত তিন শতাব্দীর মধ্যে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের কতকগুলি দেশ সমুদ্র পার হয়ে দূর দূর অঞ্চলে উপনিবেশ বিস্তার আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যাটি পৃথিবী জুড়েই বিস্তার লাভ করেছে। অবশ্য এ সমস্যাটা সামাজিক এবং ন্যায়াদর্শগত—ওলন্দাজ ভাষায় একে বলে এপার্থেড, এর পর্তুগীজ শব্দান্তর কাস্ট এবং সংস্কৃত প্রতিশব্দ বর্ণ। এই জাতিভেদ বা বর্ণাশ্রম পদ্ধতির উদ্ভব সুবিদিত। যাদের শারীরিক এবং সাংস্কৃতিক বৈসাদৃশ্য প্রথর তেমন দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে সহসা যদি কোন সাক্ষাৎ-সংযোগ ঘটে তাহলে এই জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তি হয়। দুইটি ভিন্ন এবং বৈসাদৃশ্য যুক্ত জনসমষ্টির মধ্যে এই মিশ্রণ কোথাও বা ঘটেছে পররাজ্য জয়ের অভিযানের ফলে, কোথাও বা ঘটেছে বিদেশ থেকে বলপূর্বক ক্রীতদাস সংগ্রহের ফলে। বিজয় অভিযানের দরুন যে মিশ্রণ, তার একটি মুখ্য দৃষ্টান্ত এই ভারতবর্ষে আর্যভাষী বর্বরদের প্রবেশ ও বিস্তার। ক্রীতদাস আনয়নের ফলে জাতিভেদ প্রথার উৎপত্তির দৃষ্টান্ত

বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাওয়া যাবে। সব ক্ষেত্রেই মিশ্র জনসমষ্টির মধ্যে যারা অধিকতর প্রভাবশালী তারা অন্য অংশকে নিম্নবর্ণের জাতিরূপে পশ্চাৎপদ করে রেখেছে। ভারতবর্ষেও জনসংখ্যার অধিকাংশই অনার্যসম্ভূত এবং আর্যের দ্বারা প্রপীড়িত। এদের শরীরে আর্যরক্ত যদি থাকেও তাহলেও দুইএক বিন্দুর বেশী নয়। ইন্দো-ইউরোপীয়ভাষী জনসমষ্টির মধ্যে এক কোটীতে আর্যভাষীরা অন্য কোটীতে টিউটনিকভাষীরা গত তিন চার হাজার বৎসর যাবৎ পৃথিবীর মনুষ্যবাসিত অঞ্চলগুলিকে বিজয়াভিযানের দ্বারা আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। এই দুইটি ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত লোকেরা এমন তীক্ষ্ণভাবে জাতিসচেতন কেন? নিজের দেশের প্রতিবেশী মানুষের প্রতিও তারা সংকীর্ণতা মুক্ত হতে পারেনি এবং জাতিভেদের প্রাচীর নির্মাণ না করে থাকতে পারেনি কেন? এই বর্ণাভিজাত্যের মনোবৃত্তির সঙ্গে ভাষার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। কারণ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীতে অন্যান্য জাতির নিদর্শন আছে যেমন লাতিনভাষী, স্পেনিয়ার্ড এবং পর্তুগীজেরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ মুক্তমনা। স্পেনিশভাষী এবং পর্তুগীজভাষী লোকেরা এই বর্ণাভিজাত্যের মনোভাব থেকে কিভাবে মুক্তি পেল? একটা কারণ এই হতে পারে যে, স্পেন এবং পর্তুগাল উভয় দেশেই অতীতে মুসলমান শাসন প্রবর্তিত ছিল। মুসলমানেরা জাতিভেদের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত এবং শাসিতদের মধ্যে তারা কোন জাতিভেদের ফারাক রাখেনি। হিন্দুধর্মের সামাজিক ফল এবং অন্যদিকে ইসলাম ও রোমান ক্যাথলিক ধর্মের সামাজিক ফলকে কি নিম্নলিখিত-রূপে বর্ণনা করলে ভুল করা হবে? ভিন্ন ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোক ইসলাম বা ক্যাথলিক ধর্মপাশে আবদ্ধ হলে তাদের জাতিভেদের গণ্ডী আর বজায় থাকে না, ইসলাম এবং ক্যাথলিসিজম সেই প্রভেদচিহ্ন দূর করে দেয়। অপরদিকে হিন্দুধর্ম অন্য ধর্মাবলম্বীর সঙ্গে ইসলাম কিংবা খৃষ্ট ধর্মের মত বিরোধ বাধাতে যায় না এবং দুই ধর্ম-মতের মধ্যে সংঘর্ষেরও কারণ ঘটায় না। কিন্তু ইসলাম খৃষ্টান কিংবা শিখ ধর্ম যেমন নিজের অন্তর্ভুক্তদের মধ্যে জাতিভেদের কোন পার্থক্য রাখে না, হিন্দুধর্ম কিন্তু তেমন ভাবে ভারতবর্ষে বর্ণভেদের প্রাচীর ভেঙে দিতে পারেনি।

পৃথিবীতে আজকের দিনে দুইটি অঞ্চলেই জাতিভেদ প্রথা প্রখর সমস্যারূপে উপস্থিত। একটি অঞ্চল আফ্রিকা, সেখানে ক্ষমতাবান সংখ্যালঘুরা ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের লোক এবং প্রধানত টিউটনিক ভাষী। আর একটি অঞ্চল হচ্ছে ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষেও বৃটিশ শাসনকালে আর্যসম্ভূতদের প্রভাব এবং জাত্যাভিমান বজায় ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত এই বৃহৎ সমস্যার প্রতিকারে অগ্রণী হয়েছে। তার জন্য অবশ্য ভারতবর্ষকে বাইরে থেকে কোন পরামর্শ বা প্রেরণা নিতে হয়নি। আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধদেব এই বর্ণভেদ প্রথাকে অবলুপ্ত করতে চেয়েছিলেন এবং আড়াই হাজার বছর পরে মহাত্মা গান্ধীও সেই একই বাণী প্রচার করেছেন। উভয়ের মধ্যে যখন দেখি এক সুর ধ্বনিত হচ্ছে তখন একথা বুঝি যে, এই সুর শুধু এই দুই মহৎ সন্তানের নয়। এ সুর ভারতবর্ষেরই অন্তরের সুর। হাজার হাজার বৎসর যাবৎ যে প্রথা দৈনন্দিন জীবনে গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছে তাকে উৎপাটন করা সহজসাধ্য নয়। এর জন্য যেমন আইনের প্রতিষেধ তেমনি মানুষের অন্তরের পরিবর্তনও প্রয়োজন। ১৯৫৬ সালে National War Academyতে শিবাজীর মূর্তি স্থাপন উৎসব উপলক্ষে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানে দেখলাম সৈন্যাধ্যক্ষ একজন মুসলমান। অর্থাৎ সুপরিকল্পিতভাবেই জাতিভেদের প্রাচীরগুলিকে ভাঙবার বলিষ্ঠ প্রয়াস আরম্ভ হয়েছে। যদি এই প্রয়াস ভারতবর্ষে সার্থক

হয় তাহলে আফ্রিকায় এবং উত্তর আমেরিকায় তার প্রভাব নিশ্চয় পৌঁছুবে।

চতুর্থ যে সমস্যাটি বিশ্বেরও ভারতবর্ষেরও, সেই ভাষা সমস্যা সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই আমি আলোচনা করেছি। কাজেই এর বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শুধু একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, এই ভাষাগত বিভেদের ফলে ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্যের পথে গুরুতর অন্তরায় দেখা দিয়েছে, অথচ এ বিষয়ে ভারতবর্ষের চেয়ে চীন স্পষ্টতই ভাগ্যবান। চীনের সুবিস্তৃত অঞ্চলে বহু উপভাষা আছে, কিন্তু এত অসংখ্য ভাষার বিভেদ সেখানে নেই এবং উপভাষাগুলির মধ্যে একটি, মান্দারিন চীনের প্রায় সর্বত্র কথিত এবং সুবিদিত। তাছাড়া মান্দারিন যাদের মাতৃভাষা চীনে তাদেরই সংখ্যাধিক্য। কিন্তু ভারতবর্ষে হিন্দীর ক্ষেত্রে যেমন একথা প্রযোজ্য নয় তেমনি একথাও লক্ষণীয় যে, দক্ষিণের দ্রাবিড় ভাষা এবং উত্তরের হিন্দীর মধ্যে পার্থক্য দুরতিক্রম্য—প্রায় দ্রাবিড় ও ইংরেজীর পার্থক্যের সমতুল।

এবার আমার তৃতীয় প্রস্তাবনায় প্রবেশ করছি। স্মরণ থাকতে পারে যে, আমার তৃতীয় আলোচ্য বিষয়ঃ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ভারতবর্ষের পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। একথাও আমি পূর্বেই লিখেছি যে, এই বৈশিষ্ট্য থেকে পৃথিবীর অন্যদের শিখবার অনেক আছে। ভারতীয়েরা যেভাবে নিজদের ঘৃণাবিমুক্ত রাখতে পারে তা দেখে আমি গভীরভাবে অভিভূত হয়েছি। ভারতীয়েরা অন্যদের সঙ্গে যখন সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হতে বাধ্যও হয় তখনও তারা আশ্চর্যভাবে নিজেদের মনকে অপরপক্ষ সম্বন্ধে ঘৃণার উর্ধ্বে রাখতে পারে। গান্ধিজীর সমাধিক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে আমার একদিন মনে হয়েছিল, পৃথিবীতে আর কি কোন একজনও মুক্তিযোদ্ধার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যিনি একাধারে স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধা অন্যদিকে তাঁরই শত্রুপক্ষেরও মহৎ কল্যাণকামী? গান্ধিজী আমার দেশের লোকদের পক্ষে ভারত শাসন অসম্ভব করে তুলেছিলেন, আবার অন্যদিকে অসম্মান ও গ্লানি ব্যতিরেকেই ইংরেজ যাতে এদেশ থেকে মর্যাদা সহকারে পশ্চাদপসরণ করতে পারে তার পথও গান্ধিজীই প্রস্তুত করে দিয়েছেন। আমার দেশের প্রতি তাঁর মহান দান স্বদেশের প্রতি তাঁর দানের চেয়ে বোধহয় খুব কম নয়।

কিন্তু একথা অস্বীকার করবার নয় যে, অহিংস অসহযোগ পদ্ধতির বিজয় শুধু একা গান্ধিজীর মনের জোরেই সম্ভব হয়নি, ভারতবর্ষের মানুষের মনের জোরও এই পদ্ধতিকে সার্থকতা দিয়েছে। আসলে এই দুই মনোবলের মধ্যে সম্মিলন ঘটেছিল। গান্ধিজী ভাষা দিয়েছিলেন দীর্ঘকালের পুরাতন ভারতবর্ষের মানসসম্পদকে। এই মনোবল খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতেও বুদ্ধকে এবং মহাবীরকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং সমসাময়িক হিন্দু সন্ন্যাসী ও গুরুদেরও উদ্বুদ্ধ করেছে। কাজেই আমি বলতে চাই যে, অহিংস বিপ্লব ভারতবর্ষের ঐতিহ্যগত ধারণার এবং বৈশিষ্ট্যেরই অন্তর্ভুক্ত। এই পদ্ধতির দ্বারা ইংরেজ ও ভারতবাসীর মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির পরেই আবার ভারতবর্ষের আভ্যন্তর ব্যাপারে ভূদান আন্দোলনের মধ্যেও এরই নূতন প্রয়োগ আরম্ভ হয়েছে।

পূর্বেই বলেছি পারমাণবিক যুগের প্রয়োজনীয়তা বোধ অশোককে অনুপ্রেরণা দেয়নি। গান্ধিজীও সেই প্রয়োজনবোধের দ্বারা তাড়িত হননি। কারণ হিরোশিমা এবং নাগাসাকির উপর ১৯৪৫ সালে পারমাণবিক বোমা বর্ষিত হওয়ার বহু বছর পূর্ব হতেই তিনি অহিংসা মন্ত্রের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু আমরা বর্তমান পারমাণবিক যুগের পূর্ণঝটিকার মধ্যে বাস করছি। যদি আজকের দিনের মানুষ পরস্পরের প্রতি এই অহিংসার মনোভাব অবলম্বন করতে না পারে তাহলে পারমাণবিক যুগের বিধ্বংসী

বাত্যাবিক্ষোভ থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকবে না। অহিংসার মনোভাব অবলম্বন করা দুরূহ সন্দেহ নেই, কিন্তু এছাড়া উপায়ান্তরও নেই। এ যে কত দুরূহ পন্থা তা বর্তমান মুহূর্তে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষায় ভারতবর্ষ অনুভব করছে। কিন্তু পৃথিবীর সম্মুখে অহিংসার দৃষ্টান্ত স্থাপন করার মহান দায়িত্ব ভারতবর্ষের উপরে অর্পিত হয়েছে। ভারতবর্ষ কোন্ পথে অগ্রসর হবে এবং এই দায়িত্ব কতখানি সার্থকভাবে পালন করতে পারবে তার উপরে সমস্ত বিশ্বের ভবিষ্যত নির্ভর করছে—বিশ্ব ধ্বংসের পথে যাবে অথবা ঐক্যের পথে, তার নিয়ামক ভারতবর্ষের মানুষ।

উদার সত্যোপলব্ধি ভারতবর্ষের চরিত্র বৈশিষ্ট্য। এদেশে কোন ধর্মগোষ্ঠীর লোক মনে করেন না যে, তাঁর নিজের ধর্মই একমাত্র সত্যের সন্ধান দিতে পারে। এমন কি তিনি একথাও কখন দাবী করেন না যে, তাঁর অনুসৃত ধর্মমতের বিকাশ একই সময়ে এক স্থানেই ঘটেছিল। যদি কোন শৈব মতাবলম্বী ব্রাহ্মণকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায় যে, শিবের কল্পনা মহেন্‌জোদারো এবং হরাপ্পার সভ্যতায় অনার্য যুগেই জন্মলাভ করেছিল তাহলেও তিনি যে খুব ক্রুদ্ধ অথবা বিচলিত হবেন তা নয়। অথচ যদি কোন উদারমনা খাঁটি খৃষ্টান পুরোহিতকে বলা হয় যে, প্রত্নতাত্ত্বিক মতে দেখা গেছে যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার বহু পূর্বেই দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া এবং মিশরে এবং কালক্রমে স্ক্যানাডিনেভিয় অঞ্চলে যীশুর কল্পনাই ভিন্ন ভিন্ন বহু নামে নানাযুগে কোথাও তামুজ, কোথাও আদোনিস্, ওসিরিস, আত্তিস, কোথাও বল্ডাররূপে দেখা দিয়েছিল।

ভারতীয়দের এই উদার মানসিকতা হিন্দু বৌদ্ধ দুই ধর্মেই বিদ্যমান বৌদ্ধধর্মও বিভিন্ন দেশে যেভাবে আচরিত হয়েছে তাতে যথেষ্ট পরমতসহিষ্ণুতা লক্ষণীয়। জাপানে বহুলোকই একাধারে বৌদ্ধ ও সিন্‌টো ধর্মাবলম্বী। চীন কমিউনিস্ট শাসনে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বে সেখানে অনেকেই একই সঙ্গে বৌদ্ধ, তাও এবং কনফুসীয় ধর্মের অনুসরণ করতেন। খৃষ্টধর্মের মধ্যেও এক সময় এই গ্রহীতৃ মনোভাব ছিল, যা হিন্দুমানসিকতার অনুরূপ। কিন্তু পরবর্তীকালে খৃষ্টধর্ম ভারতীয় ধর্মগুলির তুলনায় অগ্রহীতৃ এবং অসহিষ্ণু মনোভাবের পরিচয় দেয়। অনেক খৃষ্টান মনে করেন যে, সত্য ও ত্রাণলাভের একচেটিয়া অধিকার কেবল খৃষ্টানদেরই আছে, কারো বা ধারণা যে অখৃষ্টান বিশ্বাস পৃথিবী থেকে নির্মূল করতে হবে। এই ধরনের আগ্রাসী যোদ্ধৃ মনোভাব একমাত্র খৃষ্টানদেরই বিশেষত্ব নয়। ভারতবর্ষের পশ্চিমে অবস্থিত *Oikoumene* বা মনুষ্যবসতি অঞ্চলে যে সমস্ত ধর্মমতের উৎপত্তি হয়েছে তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই এই মনোভাব বিদ্যমান। এমন কি রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। খৃষ্টান মুসলমান জুডা এবং জরথুস্ত্র ধর্মের প্রত্যেকের মধ্যেই এই অসহিষ্ণুতার মনোভাব রয়েছে। খৃষ্টোত্তর যুগের রাজনৈতিক মতবাদ ফ্যাসিজম, নাৎসী-ইজম এবং কম্যুনিজমের মধ্যেও এই মনোভাব লক্ষণীয়।

'এর বড় রহস্যের সন্ধান এক পথে হবার নয়'। ভারতবর্ষের কোন ধর্মগুরু এই উক্তিটি করেছেন? তিনি কি শঙ্করাচার্য, রামানুযাচার্য, নাকি গুরু নানক? বাণীটি নিঃসন্দেহে যে কোন ভারতীয় গুরুর মুখে বসান যায়। কিন্তু আসলে এই বাণী চতুর্থ শতাব্দীর রোমান সিনেটর কুইণ্টাস অরেলিয়াস্ সাইমেকাসের। তৎকালে রোমান রাজশক্তি খৃষ্টধর্মকে রাজধর্মরূপে গ্রহণ করেছে এবং সমস্ত অখৃষ্টান ধর্মকে রোমান সাম্রাজ্যের গণ্ডী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে। রোমান সিনেট হাউসে জুলিয়াস সিজার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি দেবী মূর্তি ছিল—বিজয়লক্ষ্মীর মূর্তি। মিলানের

খৃষ্টান বিশপ এ্যাম্‌ব্রোজ সেই মূর্তি অপসারণের জন্য দাবী তুললেন, অন্যদিকে সাইমেকাস মূর্তিটি সংরক্ষণের পক্ষে দাঁড়ালেন। এ্যামব্রোজেরই জয় হল, কারণ রাজশক্তির তিনি কর্ণধার। কিন্তু তার পরে বহুযুগ অতীত হয়েছে, ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী জগতে সাইমেকাসের বাণী অখৃষ্টান ধর্মগুলিকে অবলুপ্ত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। কিন্তু যুগ যুগ ধরে তাঁর এই বাণীটি উত্তরকালের মানুষের কাছে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এ বাণীর জবাব রোমান সাম্রাজ্য দিতে পারেনি।

সাইমেকাসের বাণীর মধ্যে খৃষ্টপূর্ব যুগের সহিষ্ণুতার মনোভাব প্রতিফলিত। এই মনোভাবই হিন্দুমানসিকতারও প্রেরণা। আমার গ্রীকো-রোমান যুগের ধর্মমত এবং দর্শন শাস্ত্রের প্রতি একটা স্বভাবগত অনুরাগ আছে। যদিও নিজে আমি খৃষ্টান তথাপি খৃষ্টানেরা যাকে প্যাগানিজম্ বলে থাকেন তার সঙ্গে আমি মানসিক সাদৃশ্য খুঁজে পাই। সেই জন্যই ভারতবর্ষের এবং পূর্বএশিয়ার ধর্মমনোভাব বুঝতে আমার কষ্ট হয় না। বর্তমান চীনে অতীতের তিনটি ধর্মমত ও দর্শনশাস্ত্র আজ অবদমিত হচ্ছে। প্রশস্ত এবং উদার ধর্মীয় মানসিকতা একমাত্র বোধ হয় ভারতবর্ষেই আজও বেঁচে আছে। মনে হয় খৃষ্টপূর্ব যুগের উদার মানসিকতার ঐতিহ্য রক্ষার দায়িত্ব বর্তমান পারমাণবিক যুগে ভারতবর্ষের উপরেই অর্পিত হয়েছে। সাইমেকাসের বাণীকে ভারতবর্ষই সফল করার দায়িত্ব নিয়েছে। তার নূতন সংবিধানেও এই দায়িত্ব প্রতিপালিত হয়েছে। রোমান সম্রাট থিওডোসিয়াস্ চতুর্থ শতাব্দীতে এবং মুঘল সম্রাট ঔরাংগজেব সপ্তদশ শতাব্দীতে যে ভুল করেছিলেন বর্তমান ভারত সে ভুল করেনি। ভারতরাষ্ট্রের রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে হিন্দু-ধর্মকে গ্রহণ করা হয়নি, এখানে ধর্মনিরপেক্ষ শাসন প্রবর্তন করা হয়েছে। স্বেচ্ছায় এই অধিকার ত্যাগ করে হিন্দুধর্ম তার ভারতীয়ত্বকেই রক্ষা করেছে।

১৯১৪-১৯১৫ সালে রাশিয়া যখন পোলাণ্ড অধিকার করেছিল, সেই সময় পোলাণ্ডের রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানদের জব্দ করার জন্যই ওয়ারস নগরীর কেন্দ্রস্থলে রুশেরা তাদের ধর্মীয় মত অনুসারে একটি গীর্জা স্থাপন করেছিলেন। বলাবাহুল্য এর উদ্দেশ্য যতটা ছিল ধর্মীয় তার চেয়ে বেশী ছিল রাজনৈতিক। ১৯১৮ সালে পোলাণ্ড যখন স্বাধীনতা লাভ করে তখন এই গীর্জাটি পোলিশ গভর্ণমেণ্ট ধ্বংস করেন। অপর-পক্ষে আমি একথা প্রশংসনীয় মনে করি যে, ঔরংগজেবের নির্মিত মসজিদগুলিকে ভারত সরকার ধ্বংস করেননি, বিশেষত ঐ তিনটি মসজিদ এখনও আছে—তার মধ্যে দুইটি বারাণসী ঘাটেরই মুখোমুখি অপর পারে এবং তৃতীয়টি মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের গিরিগোবর্ধনেরই উপরে স্থাপিত। ঔরংগজেব ঐ তিনটি মসজিদ নিশ্চয়ই নির্মাণ করেছিলেন হিন্দুদের রাজনৈতিক অবমাননা ঘটাবার জন্য, যে উদ্দেশ্যে রুশেরা ওরারসতে অর্থোডকস্ গীর্জাটি নির্মাণ করেছিলেন। সবচেয়ে আপত্তিকর স্থানগুলি নির্বাচনের ব্যাপারে ঔরংগজেবের একটা প্রতিভা ছিল। এ ব্যাপারে তিনি এবং স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ একটি জুটি। খৃষ্ট-মুসলিম-ইহুদি ধর্মগোষ্ঠীর শিরায় শিরায় যে ধর্মীয় উন্মাদনা প্রবাহিত এঁরা তারই মূর্ত প্রতীক। পরবর্তীকালে বৃটিশেরা তাদের শাসনের চিহ্নও এইভাবেই স্মৃতি স্তম্ভের দ্বারা স্মরণীয় করে রাখতে চেয়েছে। ভারতসরকারের পূর্ত দপ্তরের উপর আমাদের যদি কোন মতামত খাটানর অবকাশ আজও থাকত তাহলে আমার দেশবাসীরা নিশ্চয়ই এই অশিক্ষিত রুচির (Philistine) নিদর্শনগুলিকে অপসারিত করতে বলতেন। কিন্তু ভারতসরকার যে মমতা সহকারে তাজমহলের স্থাপত্যকে যত্ন করছেন প্রায় সেই মমতায়ই

বৃটিশ যুগের কুরুচির এই নিদর্শনগুলিকেও বাঁচিয়ে রেখেছেন। ভারতবর্ষের এই সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত আমার মনে যুগপৎ ভারতীয়দের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং আমাদের নিজেদের জন্য আত্ম ধিক্কারের উদ্রেক করেছে।

যাই হোক, এগুলি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যেরই সাক্ষ্য। এই সাক্ষ্য বর্তমান পৃথিবীর কাছে মূল্যবান। যে কথা আমি ইতিপূর্বে বার বার বলেছি, আর একবার তার পুনরাবৃত্তি করি। বর্তমান বিশ্বে যন্ত্রবিজ্ঞান দূরত্বকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে, বিভিন্ন প্রান্তের ধর্ম, সংস্কৃতি এবং জনগোষ্ঠী মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে, হাতে তাদের আণবিক অস্ত্রের সম্ভার। শারীরিক দিক থেকে এখন আমরা পরস্পরের প্রতিবেশী, কিন্তু মানসিক দিক থেকে আমরা অপরিচিত এবং অনাত্মীয়। আজ যদি পৃথিবীর মানুষ এই নৈকট্যের মধ্যে এসে মানসিক দিক থেকে অনাত্মীয় থেকে যায় তাহলে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও ভীতি অনিবার্য এবং এর থেকে যুদ্ধ ও ধ্বংসও অবশ্যম্ভাবী। অন্যথায় বাঁচবার পথ হচ্ছে পরস্পরের সংস্কৃতির বিশেষত্ব ও গুণগুলি আহরণ করা, পরস্পরকে জানা, অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করা এবং বহুর মধ্যে ঐক্যকে প্রতিষ্ঠা করা। এই জন্যই ভারতের শিক্ষা বিশ্বের কাছে আজ এত মূল্যবান।

উপসংহারে আমার আর একটি কথা বলবার আছে। গান্ধিজীকে প্রতিদিন বিপুল কর্মভারে আত্মনিযুক্ত থাকতে হত। তবু সেই ব্যস্ততা থেকে মাঝে মাঝেই তিনি অবসর নিতেন চিন্তা ও ধ্যানের জন্য, সেজন্য তাঁর সময়ের অভাব ঘটেনি। এ শুধু তাঁর নিজের চরিত্রের সত্যনিষ্ঠতার পরিচয় নয়, এতে তাঁর ঐতিহ্যনিষ্ঠার পরিচয়ও আছে। এই ধ্যান ও আত্মজিজ্ঞাসার অভ্যাস ভারতীয় ঐতিহ্যেরই বৈশিষ্ট্য।

ব্যবহারিক জগতে ভারতবর্ষ বর্তমানে বহু জরুরী এবং সমূহ কর্তব্য সাধনে ব্যাপৃত হয়েছে। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার মারফৎ ব্যবহারিক জগতে তাকে এক বিপুল কর্তব্য সাধন করতে হবে—ভারতীয় কৃষকসমাজের বৈষয়িক জীবনমানের উন্নতিবিধান তার লক্ষ্য। কিন্তু এ কর্তব্য নিছক বৈষয়িক নয়। বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্যের উপরেই অধ্যাত্ম কর্মের প্রশস্ত ভূমিকা তৈরী হবে। গান্ধিজী নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়ে গেছেন যে, ব্যবহারিক জীবনের কঠিন কর্তব্য সাধনের মধ্যে ব্যাপৃত থেকেও, পার্থিব জগতের উদ্বেগের মধ্যেও নিজের আত্মাকে কিভাবে শান্ত ও অবিচল রাখা যায়। আজ বিশ্বকে ভারতবর্ষ সম্ভবত এই মহত্তম শিক্ষাই দিতে পারে। মধ্যযুগের পর থেকে অধ্যাত্মজীবনশিল্প পশ্চিম সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে। সেইজন্যই আজ আমরা ভারতবর্ষের দিকে ফিরে তাকিয়েছি। ভারতবাসীর অন্তরে এখনও সেই সম্পদ আছে যা দিয়ে মানুষ সত্যকার মনুষ্যত্ব লাভ করতে পারে। ভারতবর্ষ সেই সম্পদেরই নিদর্শন বিশ্বের সম্মুখে স্থাপন করতে থাকুক। বিশ্বকে আত্ম-বিনাশের পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য এর চেয়ে বড় দান আর কিছু হতে পারেনা।*

অনুবাদ : অমিতাভ চৌধুরী

* আজাদ-স্মৃতি বক্তৃতা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

And now that thou art lying, my dear old Carian guest,
A handful of grey ashes, long, long ago at rest,
Still are thy pleasant voices, thy nightingles, awake,
For Death, he taketh all away, but them he cannot take.

—Heraclitus: William (Johnson) Cory.

The rest is silence.—Hamlet.

মল্লিকদা বলতেন, ওদের জীবন হ'ল মোমেণ্ট টু মোমেণ্ট—মুহূর্তকে নিয়ে ওরা পাগল, মুহূর্তের পর মুহূর্ত, কিন্তু সমগ্র জীবনের কথা ওরা ভাবে না। মল্লিকদা অর্থাৎ বসন্তকুমার মল্লিক। বারো বছর অক্‌স্‌ফোর্ডে কাটানোর পর দেশে ফিরে নিয়তির অনিবার্য বিধানে তিনি এসে জুটেছিলেন আমাদের "পরিচয়" চক্রে। "পরিচয়"-এর বয়স তখন বেশি নয়, বছর খানেক হবে। মল্লিকদার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সুধীন সুশোভন আমি ছিলাম ত্রিশ বত্রিশ। নীরেন একটু বড়। তার চাইতেও বছর তিন চার বড় ধূর্জটি মুখুজ্যে, গিরিজা ভট্টাচার্য ও সত্যেন বসু। এই চক্রে এসে জে'কে বসলেন মল্লিকদা; বোধ হয় অপূর্ব চন্দ তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন, ঠিক মনে নেই। তবে অপূর্ব চন্দ, সাহেদ সুরাবর্দি ও তুলসী গোঁসাই, "পরিচয়" চক্রের এই ত্রয়ীর সঙ্গে অক্সফোর্ডে থাকতে মল্লিকদার যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা হয়েছিল, যার ফলে তিনি মল্লিকদা নামে পরিচিত হয়েছিলেন। "পরিচয়" চক্রে যোগদানের পর মল্লিকদার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ঘটেছিল সুধীনের ও আমার : তিনি হয়ে উঠলেন একাধারে আমাদের বন্ধু ও নৈতিক অভিভাবক; মল্লিকদার নীতিজ্ঞান ছিল প্রখর, আর অভিভাবকত্ব করার তাগিদ ছিল সহজাত। এই তাগিদেই তিনি সুধীনদের অর্থাৎ সুধীন, সাহেদ সুরাবর্দি ও সম্ভবত অপূর্ব চন্দর—কিন্তু প্রধানত সুধীনের মনোবৃত্তি ও জীবনের হালচাল লক্ষ্য করে প্রচার করতেন ঐ মোমেণ্ট টু মোমেণ্ট থিওরি।

আজ প্রায় ত্রিশ বছর পরে সুধীনের কথা লিখতে গিয়ে মনে পড়ল মল্লিকদার ঐ মত। সুধীনের জীবন পৌঁছে গেল তার চরম মুহূর্তে, তারপর আর একটি মুহূর্ত'ও যে বাকি রইল না। এরপর নিঃসীম নীরবতা, অন্তত আমার তাই বিশ্বাস (যদিও আমি হ্যামলেট নই) আর সুধীনেরও যতদূর জানি ঐ বিশ্বাসই ছিল।

কেন বলতেন মল্লিকদা ঐ কথা? এমন কী তিনি লক্ষ্য করেছিলেন সুধীনের জীবনে যা আমাদের পাঁচজনের ও অবশ্য তাঁর নিজের জীবন থেকে স্বতন্ত্র? মল্লিকদার জীবন তো

ছিল—সে কথা আমাদের দলের কেনা জানে?—ইংরেজিতে যাকে বলে একেবারে হ্যাণ্ড টু মাউথ। কিন্তু তা হ'ল জৈবিক ব্যাপার, দার্শনিক নয়। সুধীনের মোমেণ্ট টু মোমেণ্ট জীবনের কথা তিনি বলতেন দার্শনিক অর্থে; তাঁর দর্শন নয়, সুধীনের দর্শন। ব্রাউনিঙের মোমেণ্ট ইটারন্যালের কথা কী মল্লিকদার মনে ছিল? হয়তো সে কথা তিনি শোনেন-ই নি। ব্রাউনিং-দর্শন সুধীনকে কী স্পর্শ করেছিল? স্যাড্ এ্যাণ্ড ব্যাড্ এ্যাণ্ড ম্যাড্ হওয়ার ঝোঁক সুধীনের তখনকার জীবনে যে একেবারে ছিল না তা নয় কিন্তু ব্রাউনিঙ ও সুধীনের মাঝখানে ছিল যুগযুগব্যাপী মহাসমুদ্রের ব্যবধান।

সুধীনের প্রাক-"পরিচয়" জীবনের কথা আমি বিশেষ জানি না, কেননা দু একবার রবীন্দ্রনাথের কাছে ওকে দেখলেও তখনো ব্যক্তিগত পরিচয় হয় নি। লোকের মুখে শুনেছিলাম ছেলেটি গুণী, সাহিত্যে অগাধ অনুরাগ। এর পর যখন আলাপ হ'ল তখন গুণ যাচাই করার প্রবৃত্তি হয়নি। কী করে হবে? এত অল্পদিনের মধ্যে এত সহজভাবে সুধীনের সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গতা হয়ে গেল যে লোকটি ভালো না মন্দ, গুণী না গুণহীন সে সব কথা ভাববার অবকাশই হয়নি। এর পর দেখেছি এইভাবে সুধীনের মায়াজালে জড়িয়েছে আরো বহু ব্যক্তি, স্বদেশবাসী ও বিদেশী, বিদ্যায় ও মননশীলতায় যাঁরা আমার চাইতে অনেক উঁচু স্তরের। আশ্চর্য লেগেছে এই কথা ভেবে যে এত বিচিত্র ব্যক্তিকে কী বিচিত্র আকর্ষণে সে এত আপন করতে পারল। মুহূর্তের পর মুহূর্তকে আঁকড়ে যে জীবন প্রসারিত হয়েছে দিনের পর দিন, কী এত যাদু ছিল সেই জীবনে!

কেননা এ কথা আজ না মেনে পারছি না যে মল্লিকদার কথার মধ্যে অনেকটা সত্য ছিল। "পরিচয়"-এর আদি যুগের সুধীনের কথা বলছি। একদিকে সমাহিত সাহিত্য সাধনা আর একদিকে অবিরত অস্থিরতা—এই ছিল তার জীবন। কোথাও সে যেন স্থির আশ্রয় পায়নি, আর এই আশ্রয় খোঁজার জন্যে সে যেন নিরন্তর ব্যগ্র। স্বাদেশিক, সামাজিক এমন কি পারিবারিক পরিবেশও যেন তার কণ্টকশয্যা। কিন্তু এ কথা অর্ধ সত্য। কেন না আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধব সকলের প্রতি তার সহৃদয়তাও স্মরণীয়। এই সহৃদয়তা মৌখিক নয়, আন্তরিক। ত্রিশ বছর ধরে দেখেছি যাকে সে একবার কাছে টেনেছে তার প্রতি সে কখনো বিমুখ হয়নি। হয়তো মনোমালিন্য ঘটেছে এমন কি কলহ: সুধীনের অভিমানবোধ ছিল প্রখর আর অনেক সময়ে তা তীব্রভাবে প্রকাশ পেত। কিন্তু এসব সাময়িক ব্যাপার। মোট কথা সুধীন মানুষ ভালোবাসত—সব রকমের মানুষ।

প্রাক্-"পরিচয়" যুগে সুধীনের অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই যে খুব মননশীল তা নয়। কিন্তু এঁদের নিয়ে আড্ডা জমাতে ও মাঝে মাঝে হৈ-হুল্লোড় করতে সুধীনের উৎসাহের অভাব ছিল না। এর পর জমে উঠল "পরিচয়"-এর আড্ডা। সে এক নক্ষত্রসভা। বসন্ত মল্লিক, সাহেদ সুরাবর্দি, সত্যেন বসু, ধূর্জটি মুখার্জি, হুমায়ুন কবির, সুশোভন সরকার, তুলসী গোঁসাই, আবু সইয়দ আয়ুব, নীরেন রায়, হীরেন মুখার্জি—প্রচণ্ড ইনটেলেকচুয়াল বলে এঁরা সকলেই ছিলেন খ্যাত। বিষ্ণু দে তখন ছেলেমানুষ, "পরিচয়"-এর আড্ডায় নিয়মিত এলেও সে প্রায় মুখ বুঁজেই থাকত এমন কি সামনে থাবার ধরলেও। কখনো কখনো আসতেন একদা অক্সফোর্ডের অল্ সোল্স্ কলেজের ফেলো কিরণ মুখুজ্যে—সাহেদ সুরাবর্দি তাঁকে ডাকতেন প্লেটো বলে। মাঝে মাঝে আমরা পেয়েছি সুধীনের মেশোমশায় চারুচন্দ্র দত্তকে। ঐ এক আশ্চর্য লোক। সে কালের আই. সি. এস. অতএব সাহেব। কিন্তু একেবারে খাঁটি ভারতীয় মন। গালগল্পে

তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়, যেমন কথায় তেমনি লেখায়। এই ছিল আমাদের "পরিচয়"চক্র।

মাঝে মাঝে বিদেশী কেউ কেউ আসতেন। অপূর্ব চন্দ বলতেন, সুধীন সাহেবদের আকর্ষণ করে চুম্বকের মত। লোকে সুধীনকেও তো বলত সাহেব। কথায় বার্তায় বাংলার চেয়ে ইংরেজি বলাই ছিল তার বেশি অভ্যাস। আমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করে উত্তর পেয়েছিলাম যে ছেলেবেলায় কাশীতে এনি বেসাণ্টের ইস্কুলে পড়ে তার ইংরেজি বলা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। অথচ এই ইংরেজিদুরস্ত লোকটি যখন বাংলা লিখতে শুরু করল তখন মনে হ'ল সে চিরজীবন শুধু সাধনা করেছে সংস্কৃত ভাষার। সুধীন আমাকে বলেছিল তার প্রথম বই "তন্বী"-তে যেটুকু রবীন্দ্রপ্রভাব ছিল তার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবার চেষ্টায় সে নতুন এক রচনা-রীতি সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু মাইকেলের বেলায় তো এই যুক্তি খাটে না। তিনিও তো ছিলেন ইংরেজিদুরস্ত। এই দু'জনেরই রচনারীতির বিবর্তনে একটু ঐতিহাসিক সাদৃশ্য আছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে সুধীন মাইকেলের বিশেষ সমঝদার ছিল।

কিন্তু কোথায় মাইকেল আর কোথায় "পরিচয়" যুগ! আমরা আজ্ঞস্থ ছিলাম রবীন্দ্র সম্মোহনে। ঠিক হয়েছিল এই সম্মোহন কাটিয়ে দেশ-বিদেশের সাহিত্য ও চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটাবে আমাদের পত্রিকা। তাই নামকরণ হয়েছিল "পরিচয়"। আরো ঠিক হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা লেখা চাইব না। কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হলেন, তারপর তাঁকে ঠেকায় কার সাধ্য? কিন্তু দেশবিদেশের সাহিত্য ও চিন্তাধারা যে প্রতিফলিত হয়েছিল "পরিচয়"-এর সংখ্যার পর সংখ্যায় তাতো আজ অবিসংবাদিত ইতিহাস। আর এই প্রতিফলনের উজ্জ্বলতম অংশ ছিল সুধীনের নিজের রচনা। টি. এস. এলিয়ট বা ইয়েটস্-এর সঙ্গে বাঙালী পাঠকের পরিচয় থাকলেও কজন রাখত ভালেরি বা মালরোর খবর? আর মার্কিন ঔপন্যাসিক ফক্নার তো তখন ইওরোপ আমেরিকাতেও ছিলেন প্রায় অজ্ঞাতকুলশীল। পরবর্তী কালে ফক্নারের বিপুল প্রতিষ্ঠা সুধীনের যুগান্তপ্রসারী সাহিত্যবীক্ষার পরিচায়ক।

এই সময় সুধীনকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছিল বিজ্ঞান ও দর্শন। "পরিচয়"সভায় বহুদিন দেখেছি আয়ুব বা কবিরের কাছে সুধীন ইয়োরোপীয় দার্শনিক তত্ত্বের সন্ধান নিচ্ছে। বিজ্ঞান চর্চা সুধীন করে নি কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানিকদের চিন্তাধারা তাকে স্পর্শ করেছিল, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিকরা যাকে বলেন এনট্রোপি তারই ধারণা। এনট্রোপির বাংলা কী করব? বোধ হয় জাগতিক বিশৃঙ্খলা যার একটি বৈজ্ঞানিক মাপ আছে। সম্প্রতি অধ্যাপক হলডেনের একটি রচনায় পড়লাম এই এনট্রোপির ধারণা নাকি প্রথম পাওয়া যায় রোমক কবি সেনেকার কবিতায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি এই লাইনটির উল্লেখ করেছেন : Tempus nos auidum denorat et chaos (Greedy time and chaos devour us)। পাঠকেরা মিলিয়ে দেখবেন সেনেকার সংকেত সুধীনের কাব্যে কতটা পাওয়া যায়।

"পরিচয়"মণ্ডলীতে সুধীন রস পেয়েছিল আর প্রভূত রস সঞ্চারিত করেছিল। মননশীলতায় ও ব্যক্তিত্বের সম্মোহনে সুধীন ছিল এই মণ্ডলীর উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। দশ বছর ধরে এই মণ্ডলীর আলো বিকীর্ণ হয়েছিল বাংলাদেশে। তারপর মহাযুদ্ধের ধাক্কায় আমরা হলাম ছত্রভঙ্গ। বিচিত্র মতের ভার বহন করে "পরিচয়"-এর মঞ্চ দশ বছর অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু যখন ভিন্ন পথের তাগিদ প্রবল হয়ে উঠল তখন পুরোনো মঞ্চের আশ্রয় হ'ল

নিরর্থক। এর পর সুধীনের সাহিত্য সাধনায় কিছুদিন বাধা পড়ল। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সুধীন একসময়ে আত্মনিয়োগ করেছিল সাহিত্য সাধনায় ও সুহৃদ সাহচর্যে। আর একবার সে ধরা দিল চাকরির জালে। বেশি দিন নয়।

চোরবাগানের দত্ত পরিবার নতুন করে শিকড় গজিয়েছিল হাতীবাগানে। সুধীনের বাবা মারা যাওয়ার পর এই আস্তানাও আস্তে আস্তে ভাঙল। কিন্তু সুধীন তখন বাংলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে স্বসমুখ শক্তিতে, ব্যাপকভাবে না হ'লেও দৃঢ়ভাবে। দত্ত বংশের আলো সে নিবতে দেয় নি। নব নব সুহৃদসমাগমে সুধীনের নতুন আড্ডা গমগম করত।

নতুন বুধমণ্ডলী গড়ে উঠল তাকে ঘিরে : সুশীল দে, বুদ্ধদেব বসু, এরিক্ ডাকস্টা : ধূর্জটি মুখুজ্যে, মৃণালিণী ও লিণ্ডসে এমার্সন—এ'রা তো ছিলেন "পরিচয়"যুগ থেকেই। অপূর্ব চন্দ তো ঘরের লোক। আরো ছিল তরুণ সাহিত্যিকদের দল। প্রৌঢ় সুধীন যে এদের ওপর কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল তার সাক্ষ্য পেলাম "উত্তরসূরীর" সুধীন্দ্রস্মরণ সংখ্যায়। সম্পাদক অরুণ ভট্টাচার্য সুধীনকে বলেছেন নিঃসঙ্গ নায়ক। এ কথা হয়তো সত্য। নিঃসঙ্গ বলেই কি সে পারত এমনভাবে প্রৌঢ় ও তরুণ সকলকে নিয়ে আড্ডা জমাতে?

চিরকালের মতন সেই আড্ডা ভাঙল। কিন্তু বাংলার সাহিত্য প্রাঙ্গনে দত্ত পরিবারের আলো কি কখনো ম্লান হবে?

হিরণকুমার সান্যাল

সমালোচনা

সিন্ধুর স্বাদ—প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত। সুরভি প্রকাশনী। ১ কলেজ রো, কলিকাতা। মূল্য সাত টাকা।

'কোনো বিশেষ কাল ও দেশকে চিনতে বুঝতে উপন্যাসকে যদি কতকটা মানচিত্র ভাবা যায়, কবিতাকে ধরা যায় তার আকাশপ্রদীপ, তাহলে ছোটগল্পকে বোধ হয়, জানলা বলা যায়,—যে উন্মুক্ত জানলায় এক ঝলকের দেখায় একেবারে ভেতরের আসল প্রাণস্পন্দনটুকু আশ্চর্য-ভাবে আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়।'

উপন্যাস, কবিতা এবং ছোটগল্প সম্বন্ধে,—সাহিত্যের এই তিন শাখাতেই অভিজ্ঞ প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই ইশারা দিয়েই "সিন্ধুর স্বাদ" গল্পসংগ্রহের 'কৈফিয়ৎ' শুরু হয়েছে। অতঃপর তিনি এই গল্পসংগ্রহের লেখকদের সম্বন্ধে এবং এই সংকলনের আদর্শ সম্বন্ধে যা বলেছেন, সে অংশটুকু এই : 'বর্তমান সংকলনে সবসুদ্ধ যে ২৮ জন বাংলা গল্পকারের বাছাই করা আটাশটি গল্প সংগৃহীত, তাঁদের সর্বজ্যেষ্ঠ শ্রীসুবোধ ঘোষের জন্ম ১৯০১ ও সর্বকনিষ্ঠ দিব্যেন্দু পালিতের ১৯৩৯-এ। এই ত্রিশ বছরের মধ্যে যাঁরা জন্মেছেন, গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৫৯-এর মধ্যে প্রকাশিত তাঁদের রচনাই এই সংগ্রহের উপকরণ। গল্পগুলি অবশ্য সব ক্ষেত্রে জন্মকাল অনুযায়ী সাজান হয়নি, বরং লেখক হিসাবে আত্মপ্রকাশের পারম্পর্যই রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।'

উনিশ শ' নয় থেকে উনচল্লিশ পর্যন্ত মোট তিরিশ বছরের এই সময়সীমার মধ্যে যেসব লেখক এসেছেন, তাঁরা তাঁদের চোখ খোলবার সঙ্গে সঙ্গেই জগতের 'বহ্নিবলয়-বেষ্টিত, বিক্ষুব্ধ দিগন্ত দেখেছেন' বলেও সম্পাদক মন্তব্য করেছেন।

কিন্তু কেবল এই বিশেষ সময়সীমার ছায়া পড়লেই কোনো বিশেষ রচনা শিল্পগুণে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে না। তাইত সেকথাও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। 'কাল ও দেশাশ্রয়ী হয়েও দেশকালাতীত গহন কোন 'শিল্পসত্য' স্পর্শ করা চাই। এই লক্ষ্য মনে রেখে আটাশটি আধুনিক বাংলা গল্প সংকলিত করা শক্ত কাজ। কারণ একালে গল্পলেখকদের সংখ্যা যে-পরিমাণে বেড়েছে, 'শিল্পসত্য' স্পর্শ করবার সামর্থ্য তাঁদের ঠিক সম-পরিমাণে বেড়েছে মনে করা সমীচীন নয়। কোনো কালে, কোনো দেশেই তা হয়না। এটা নিন্দার কথা নয়। যথা কথা মাত্র। এবং 'দেশকালাতীত গহন কোন শিল্পসত্য' মন্তব্যটির মধ্যে চিরন্তন মূল্যের কথাই যে সূচিত হয়েছে, সে-ধারণাও অলীক নয়। সুবোধ ঘোষের 'সুন্দরম্' সন্তোষকুমার ঘোষের 'শোক', বিমল করের 'অশ্বত্থ', সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'সঙ', রমাপদ চৌধুরীর 'ঈর্ষা', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'কন্যা', লীলা মজুমদারের 'পাশের বাড়ির মেয়ে' অথবা প্রতিভা বসুর 'দাম্পত্য লীলা',—এই সব গল্পের প্রত্যেকটিই প্রসিদ্ধ, অথচ কোনো দিক থেকেই এরা কেউ কারও পুনরাবৃত্তি নয়। দু'একটি ক্ষেত্রে লেখার মধ্যে স্বাদ যতো তীব্র মনে হয়, হয়তো অন্যান্য ক্ষেত্রে ততো তীব্র নয়। 'সুন্দরম্'-এর মধ্যে ময়নাঘরের থম্‌থমে হাওয়ায় কৈলাস ডাক্তারের চোখে মৃত রমণীদেহের অন্তরঙ্গ রূপ যেভাবে উদ্ভাসিত

হয়ে উঠেছে,—এবং সেই লাসের পাকস্থলীর মধ্যে ক্লোমরসে মাখা সন্দেশ-পাউরুটি-বেলেডোনার অজীর্ণ পিণ্ড দেখে তিনি 'মার্ডার' বলে চীৎকার করে,—মূর্ছিতপ্রায় হয়ে,—আবার ফিরে এসে, অস্ত্রচালনা করে, যখন 'পরিশঙ্কে ঢাকা সুডোল সুকোমল একটি পেটিকা' তুলে ধরেন,—সুবোধ ঘোষ সেক্ষেত্রে যেভাবে বলতে পেরেছেন—'মাতৃত্বের রসে উর্বর মানবজাতির মাংসল ধরিত্রী। সর্পিল নাড়ির আলিঙ্গনে ক্লিষ্ট, কুণ্ঠিত, বিষিয়ে নীল হয়ে আছে শিশু এসিয়া।'—'বৈয়াকরণ' গল্পে সতীনাথ ভাদুড়ীর সে-রীতিও নয়, সে বিষয়ও নয়। কিন্তু তাঁর লেখাতেও স্বকীয়তা আছে, কৌতুকরসের বিশিষ্টতা আছে। সে আর-একরকম স্বাদ।

বিমল মিত্রের 'নীলনেশা' কিংবা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'চোর' কিংবা সমরেশ বসুর 'ছেঁড়া তমসুক' গল্পগুলির মধ্যেও একালের বাংলা গল্পশিল্পের শিল্পকর্ম এবং আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থার ছায়া, দুই-ই বিদ্যমান। গৌরকিশোর ঘোষের 'জবানবন্দী'তে এই সমাজপ্রসঙ্গই আর-একভাবে দেখা দিয়েছে। 'সুন্দরম্'-এর তীব্রতা, গৌরকিশোরবাবু তাঁর এই গল্পের মেনকার জীবনাভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেন কিঞ্চিৎ ভিন্ন ভাবে পুনরুচ্চারিত হতে দিয়েছেন। মেনকা বলেছে : 'প্রেমে সুখ আছে। একথা মিথ্যে। সুখের জন্যে কেউ প্রেম করে না। ওটা নিদারুণ ভবিতব্য। মৃত্যু যদি যম-যন্ত্রণা হয়, প্রেম তবে জীবন-যন্ত্রণা।'

বলা বাহুল্য, প্রেম মানবজীবনের চিরন্তন আশ্রয়। আমাদের একালে, সে-আশ্রয় ভেঙে পড়ছে বলে যদি কারও ধারণা হয়ে থাকে, তাহলে সেই সূত্রে এও স্বীকার্য যে, প্রেম সম্বন্ধে এ-কালের সেই ধারণাটা গল্পে প্রতিফলিত হতে দেওয়াও একালের গল্পলেখকদেরই বিশেষ দায়িত্ব। যেমন প্রেম সম্বন্ধে, তেমনি অন্যান্য আশ্রয় সম্বন্ধেও সমাজের উদ্বাস্তু-ভাবটি আমাদের অন্যতম 'আধুনিক' অভিজ্ঞতা! "সিন্ধুর স্বাদ" সেদিক থেকে অবশ্যই আধুনিকতা দাবি করতে পারে।

হরপ্রসাদ মিত্র

হরিণ চিতা চিল— প্রেমেন্দ্র মিত্র। ত্রিবেণী প্রকাশন। কলিকাতা ১২। মূল্য তিন টাকা।

আজকাল আধুনিক কবিতার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং এ সম্পর্কে গবেষণাগ্রন্থও দেখা দিচ্ছে। যদিও এতে কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করি, তবু এ ধরনের উপাধিলিপ্সু রচনায় সমালোচক কোনো কোনো পূর্বনির্ধারিত অনুমানের স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ হাজির করতে ব্যস্ত থাকেন ব'লে একটু একপেশেমী দেখা দেয়, এটাও অস্বীকার করতে পারি নে।

আধুনিক কবিতার সংজ্ঞা কী, এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া কঠিন। অনেক চেষ্টায় একটা সংজ্ঞা খাড়া করা গেলেও, সকল আধুনিক কবির ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হয় না। কবিতায় আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তু সংস্কৃত আলংকারিকের ভাষায় 'পার্বতীপরমেশ্বরে'র মতো একাত্ম হ'লেও, অনেক কবির কাব্যপ্রকরণ যেমন আধুনিক, বক্তব্য তেমন নয়; অনেকের বক্তব্য আধুনিক, কাব্যপ্রকরণ আধুনিক নয়; আবার এমন কবিও আছেন যাঁর আধুনিকতা হয়তো আপাতদৃষ্টিতে রচনার ভিতর-বাহির দুদিকেই পরিব্যাপ্ত, তবু তাঁকে আধুনিক কবি বলে চিহ্নিত করতে দ্বিধা হয়। এইসব জটিলতা থেকে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র পথ

বোধ হয়, দুটি প্রাথমিক পরীক্ষাতে কবিকে যাচাই করে নেওয়া। প্রথম হচ্ছে, কবি যে কবিতা রচনা করেছেন তা কবিতা হিসেবে সার্থক হ'য়েছে কিনা। আর দ্বিতীয়ত, সেই উত্তীর্ণ কবিতা জীবন সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা দিতে পারে কিনা। এ দুটি প্রশ্ন অবশ্য একই জিজ্ঞাসার এপিঠ-ওপিঠ। অর্থাৎ সেই কবিতাকেই আধুনিক বলব, যার দ্বারা আধুনিক পাঠকের চেতনার দিগন্ত আরো একটু প্রসারিত হয়; যে কবিতা তাদের ভালোবাসা পায়।

এই বিচার সামনে রাখলে, আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, এবং বিশেষ করে বুদ্ধদেব বসু যদি আধুনিক কবি বলে বিবেচিত হন তাহলে প্রেমেন্দ্র মিত্র কেন আধুনিক নন, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। পূর্বোক্ত কবিদের কেউ হয়ত রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ ক'রে উক্ত মহাকবির কাছ থেকে সরে যেতে প্রয়াসী হয়েছেন, কেউ রবীন্দ্রনাথকেই আধুনিক পটভূমিকায় পুনর্বসতি দিচ্ছেন, আবার কেউবা নিজেই রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে পুনর্বসতি চাইছেন; কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র মোটামুটি এ সব দুর্ভাবনার দ্বারা পীড়িত না হ'য়ে আমাদের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরব্যাপী আধুনিক জীবনের যন্ত্রণা ও আনন্দকে কাব্যরূপ দিতে প্রয়াসী হ'য়েছেন। এটা বিশেষ ক'রে আজ জানা দরকার, তিনিই আমাদের ভাষায় প্রথম আধুনিক কবি। আধুনিক জীবনের গণতান্ত্রিক বোধ এবং সেই সঙ্গেই স্বসমাজে তার খণ্ডিত উপলব্ধি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় যুগপৎ হাসি-অশ্রুর মতো অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠেছে। এবং সেই জন্যেই তিনি সর্বজনবোধ্য ও সর্বজনপ্রিয় কবি।

আধুনিক জীবনের নিশ্ছিদ্র হতাশা, তার বহুতল চেতনালোকের আলোকবিচ্ছুরণ, সংগ্রামী মানবতার রক্তাক্ত আশাবাদ, কিম্বা স্বপ্নময় অবসাদের চিত্রল প্রতিলিপি বাংলা কবিতায় অন্য কবিদের কীর্তি; এবং এর কোনো-কোনো ক্ষেত্রে প্রেমেন্দ্র মিত্রও তাঁদের সহযোগী। কিন্তু যেখানে আলোচ্য কবির নিজ-বাসভূমি, সে হ'ল এক শান্ত দৃঢ়তার মিতভাষণ, যাতে ঘনীভূত আবেগের সরলতায় ভাষা পায় আমাদের অত্যন্ত পরিচিত এই বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত জীবন, যেখানে—

এক জানালারই মাপে গড়া চোখ কান ও চেতনা।

(ট্রেনের জানলা)

তবু সে জানে—

পায়ে পায়ে এই জড়ানো শহর
ভয়ে ভয়ে চোখ-তোলা,
খুঁজে পেতে পারে হয়ত দুয়ার
আরেক আকাশে খোলা।

(তেরো নদী)

কারণ—

শুধু তার দুঃসাহস কিছুতেই মানবে না'ক হার।
সে জানে এ বর্তমানই দুঃস্বপ্নের মিথ্যা রূপকথা।

(কাগজের নৌকো)

তাই বলে প্রেমেন্দ্র মিত্র যে নিতান্তই স্থানিক কবি, তা মোটেই নয়। ইতিহাস ও ভৌগোলিক উল্লেখে বাংলা কবিতায় একটা নতুন চেতনা স্পন্দিত করার পথিকৃৎ বোধ হয় তিনিই, যদিও পরে অন্যত্র তার প্রয়োগ ঘটেছে ব্যাপকভাবে। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু

যে, প্রেমেন্দ্র মিত্র ঐ ভৌগোলিক বা ইতিহাস-আশ্রিত ব্যঞ্জনাকে রচনায় স্বপ্নাবেশের দূরত্ব আনার জন্যেই ব্যবহার করেন না, তাঁর লক্ষ্য থাকে বর্তমান জীবনকে প্রত্যক্ষতর ক'রে তোলার দিকে। এ বইয়ের 'দাম' নামক কবিতায় তিনি নিজেই তাঁর এই মানসিকতার হদিস দিয়ে বলেছেন, কোনো ইতিহাসবিখ্যাত স্থানে অতীতের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কোনো পর্যটক—

দৈবাৎ পেতেও পারে
ভাঙা এক টুকরো শিলালিপি,
শিলীভূত কামনার মত
উরসের অংশ কোনো মূর্ত অপ্সরার।

কিন্তু সেই অতীতপ্রিয় রহস্যমদির মুহূর্তেও সে—

অকস্মাৎ চোখ তুলে চায় যদি তবু,
শস্যের তরঙ্গে ঘেরা দূরে গ্রাম
পড়বে নাকি চোখে?
সরোবরে ঘট নিয়ে চলেছে যে জনপদ বধূ
আকাশ মুখর করে উড়ে যায় যে কটা শালিখ,
যে-মুহূর্তে আদিগন্ত প্রসারিত জীবনের মেলা—
সমস্ত অতীত তার ভস্মাংশেরও দিতে পারে দাম?

এই 'প্রসারিত জীবনের মেলা' তাঁকে এমন টানে যে, স্বপ্নপ্রয়াণ তাঁর কাছে 'ক্লান্ত মনে মরীচিকার কারসাজি' ব'লেই মনে হয়। অথচ তিনিও স্বপ্ন ভালোবাসেন, অভিজ্ঞতার পুনর্গঠনে বিশ্বাস করেন। পার্থক্য শুধু এইখানে যে, পলায়নে মুক্তি না খুঁজে বাস্তবের মুখোমুখী নেমে এসে তিনি ঘোষণা করতে পারেন,—

আছেই তবু আছে কোথায় ঘুম-পাহাড়।
জুড়ন-দ্বীপও নয়ক অলীক স্বপ্নসার।
এই শহরের রাস্তা সারাও,
বাড়াও ত।
পায়ে পায়ে-ই জুড়ন-দ্বীপ আর ঘুম-পাহাড়।
(ঘুম-পাহাড় জুড়ন-দ্বীপ)

এবং অন্যত্র আমাদের এই নানা অসম্পূর্ণতায় ঠাসা জীবনের প্রতি পরম মমতায় উচ্চারণ করেন,—

কিছুটা ভেজাল কিছু খাদ দিয়ে
সব মধুরের খেলা।
মর্তের মাটি ময়লা বলেই
এখানে প্রাণের মেলা।
(খুত)

অবশ্য এ-সব কথার মানে এ নয় যে, প্রেমেন্দ্র মিত্র নিছক বস্তুগ্রাহ্য কবিতা রচনাতেই সিদ্ধহস্ত। চেতনালোকের রহস্যও তাঁকে প্রবলভাবেই আকর্ষণ করে। এ বইয়ের সীমান্ত, অধ্যাহার, বন্দিনী, শঙ্কাশুদ্ধি এবং দ্বিজ ইত্যাদি কবিতায় আত্ম-অতিক্রমণের বাসনায় এই পৃথিবীর জল মাটি রৌদ্র-কে তিনি ফুলের মতো সুষমার অন্তরঙ্গতায় নবজন্ম দিতে চেয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মেনে নিয়েছেন,

হাওয়ায় পর্দা দুলবে
কেবলই দুলবে।
দেখা যাবে, কিছু যাবে না।
জানা—অজানায় মনে যত ঢেউ
তুলবে,
অর্থ সবার পাবে না।
(পর্দা)

এবং স্বীকার করেছেন,

শুধু নির্যাস চায় না হৃদয়
পুষ্পতরুর বৃন্তে।
(খুত)

তিনি চান ভালোবাসা এবং ভালোবাসার মতো হৃদয়। এই স্পর্শগ্রাহ্য, স্নিগ্ধ সমবেদনাই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার স্থায়ী ভাব। কিম্বা এ এক পরিণত ভালোবাসা, যা সব কিছুকেই তার যোগ্য পটভূমিতে দেখতে পায় এবং সাগরের 'লোনা তরঙ্গ' ও আকাশের 'চন্দ্র সূর্য' ইত্যাদির বিষয়ে সচেতন থেকেও পাশাপাশি বসে অন্তরঙ্গ মমতার সুরে বলে,—

সজল নয়ন দুটি যদি থাকে
তারি জাদু-ছোঁওয়া বুলিয়ে
পারি এই ধুলো সবুজ স্বপ্নে ভরাতে।
(ভেলকি)

আর এই জন্যেই তিনি আমাদের এত প্রিয়।

মণীন্দ্র রায়

A Street in Rome. *By* Ugo Moretti. Frederick Muller Limited, London. 13/6*s*.

সাম্প্রতিক ইতালিয়ান সাহিত্যের পাঠকদের কাছে য়ুগো মোরেত্তি বোধ করি অপরিচিত নাম নয়। ট্রেন কনডাক্টারের, নাইট-ক্লাব ম্যানেজারের কাজ থেকে শুরু করে এমন কোন কাজ নেই যা মোরেত্তিকে না করতে হয়েছে। পুরোপুরি লেখক হবার আগে তাঁকে জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্তর পেরিয়ে আসতে হয়েছে বলে স্বভাবতই তাঁর লেখা কৌতূহলী আকর্ষণের অন্তর্ভুক্ত হয়। ছোট গল্প ও প্রবন্ধ ছাড়া, মোরেত্তির উপন্যাসের সংখ্যা তিন এবং এই তিনটির মধ্যে দুটি বিভিন্ন সাহিত্য-পুরস্কার অর্জন করেছে। আলোচ্য গ্রন্থ তাঁর সাম্প্রতিকতম উপন্যাস।

উপন্যাসের কেন্দ্রপট Via del Bubuino সংক্ষেপে Babuino. রোমের মমার্থে রূপে পরিচিত এই অঞ্চল চিত্রকর, ভাস্কর, লেখক প্রভৃতির প্রধান মিলন-ভূমি, বলা যায় তাঁদের যাবতীয় সৃষ্টিকর্মের মূর্ত অনুপ্রেরণা। শুধু সময় কাটাবার বা আড্ডা মারার

জন্যই যে শিল্পীর দল এখানে একত্র হন, তা নয়, তাঁদের অনেকেই এখানে ডেরা বাঁধেন। শহরের অংশ হলেও বাবুইনো কর্মপ্রবাহ বা জীবনচাঞ্চল্যের দিক থেকে নিজেই একটি ছোটখাট শহর। আর্ট গ্যালারী, অ্যান্টিক শপ, তামাকের দোকান, রং তুলির দোকান, কাফেটেরিয়া এক কথায় শিল্পী সাহিত্যিকদের যা প্রয়োজন সবই বর্তমান বাবুইনোতে। এখানে এমন রেস্তোরাঁও আছে যেখানে those who eat don't pay and those who can pay don't eat, because the waiters never serve them.

এ হেন অঞ্চলে যাঁরা থাকেন, এবং যাঁদের একটি বড় অংশ শিল্পী ও সাহিত্যিকরা, সাংসারিক দৃষ্টিতে তাঁরা ছন্নছাড়া, বোহেমিয়ান। ছিমছাম তকতকে জীবনযাত্রা-সঙ্গত সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করা যাঁদের স্বভাব, নিয়মিতভাবে অনিয়ম করাতে যাঁদের আনন্দ, সেই ধরনের এক দল বোহেমিয়ান শিল্পী ও সাহিত্যিক বাবুইনোকে সতত প্রাণ-চঞ্চল করে রাখেন। এঁরা যে সবাই সাধুপুরুষ কিংবা অত্যন্ত মহৎ চরিত্রের ব্যক্তি তা' নন, প্রয়োজন হলে মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চনার আশ্রয় এঁরা নেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিপন্নের সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়া, গৃহহীনকে ঘরে ঠাঁই দেওয়া, পরকে মুহূর্তের মধ্যে আপন করে নেওয়ার মতো নিখাদ মনুষ্যত্বের পরিচয়ও দিয়ে থাকেন। এবং এই জন্যেই এঁরা একান্তভাবে মর্ত্যবাসী মানুষ হিসাবে আমাদের প্রিয় হয়ে ওঠেন। এই জন্যই পাওলো, দার্শনিক সের্জে, রহস্যময়ী ইনজে, আলফ্রেদো আন্তিকো, লীলা, নোরা প্রভৃতি প্রধান-অপ্রধান প্রায় সব চরিত্র-ই আমাদের মনে ছাপ রেখে যান।

মোরোত্তির কৃতিত্ব এইখানেই। লেখায় তিনি হৃদয়ের উত্তাপ সঞ্চার করতে পারেন কারণ, তিনি মানুষকে দেখতে জানেন, এবং গুণ এবং দোষত্রুটি নিয়ে মানুষকে আঁকতে জানেন। তিনি নিজেও এই উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র। কিন্তু তা বলে তিনি নিজেকে কোথাও উজ্জ্বল রঙে আঁকার চেষ্টা করেন নি। কুণ্ঠাবোধ করেন নি স্বীয় অপরাধের স্বীকারোক্তি-করণে :

প্রমাণ :

I 've wronged people who trusted me—friend, women. (p. 176)

Our sins come up like the chain of an anchor, but the anchor stays on the bottom, the ship never sails, and I 've been sitting in this harbour of guilt for a long time. (p. 179)

এর একটা কারণ বোধ হয় তাঁর দেখার ভঙ্গী, নির্বিকল্পতা যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অপর কারণ বোধ হয়, যথমনোভঙ্গী। বাবুইনোর বাসিন্দা হিসাবে তাঁর জীবন অন্যান্য তথাকথিত বোহেমিয়ান শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে, অনেকটা জৈব সম্বন্ধে আবদ্ধ, সেখানকার শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সহজ বৈশিষ্ট্যগুলির তিনিও একজন প্রধান অংশীদার; এবং এইজন্য তাঁর সহ-বাসিন্দা বন্ধুদের সঙ্গে তিনি নিজেকেও বিশিষ্ট ও বিশ্বাস্যভাবে উপস্থিত করতে পেরেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই বইয়ে বিভিন্ন জায়গায় ইতস্ততঃ-ভাবে জীবন সম্পর্কে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় ছড়িয়ে আছে। এই ধরনের একটি অংশ :

Each of us has a burden of memory that he carries with him: dreams, emotions, ambitions to raise himself, as if on wings, above the happy throng, to reach a higher point, somewhere. A man is strong then, proud, alive; he feels that everything belongs to him, his blood runs warmer; he is filled with hatred and love. He's like an animal let out of a cage, and nothing can stop him: not the fear of dying, nor shame, nor grief. His soul is marked with deep wounds; but the sun shines through them. (p. 154)

আলোচিত উপন্যাসেই এর যাথার্থ্য সপ্রমাণ। দেশান্তরের পটভূমিতে প্রত্যক্ষ ও হার্দ্যস্বরে উপস্থিত কয়েকটি মানুষের বিচিত্র বর্ণিল জীবনের পৌষ-ফাগুনের পালাতে পুনর্বার উচ্চারিত হল, ভূমধ্যসাগরীয় আকাশ আসলে গাঙেয় আকাশের-ই নামান্তরিত বিস্তার।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

চর্যাপদের হরিণী—দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্রালয়। ১২, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য তিন টাকা।

মাঝে মাঝে নতুন লেখকদের এমন দু-একটা রচনা নজরে আসে যাতে চমক লাগে, বলতে ইচ্ছে হয়—বাঃ, অনেক দিন এমন লেখা পড়িনি। "চর্যাপদের হরিণী" গল্পগ্রন্থের 'ভাসান' গল্পটি পড়ে তাই মনে হল। এতে অবশ্য 'ভাসান', 'কয়েকটি পৃথিবী', 'ঘাম', 'নরকের প্রহরী' এবং 'চর্যাপদের হরিণী' নামে মোট পাঁচটি গল্প আছে, এবং অন্য রচনাগুলি সম্পর্কে এতটা উচ্ছ্বসিত হবার কারণ নেই—যদিও ভাষা প্রয়োগে লেখকের অবাধ স্বাধীনতা দুঃসাহসের কাছ ঘেঁসে গিয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'ঘাম' গল্পটির কথা উল্লেখ করা যায়। মানুষ মুখে যার যা ইচ্ছে ভাষায় কথা বলে, 'স্ল্যাঙ্গ' বলবার অভ্যাস ও প্রবণতা এক শ্রেণীর লোকের থাকে—তাই বলে সেই ভাষাই নিরঙ্কুশভাবে সাহিত্যে চালিয়ে দেওয়ায় বিপদ আছে। বেগবান অশ্বের দিকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকাই, সে অশ্ববাহিত দ্রুতগামী শকটে ওঠা সৌভাগ্যের দ্যোতক বলেই মনে করি। কিন্তু বল্গাহীন উদ্দাম অশ্বকে ভয় করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। ঐ বল্গাহীনভাবে 'স্ল্যাঙ্গ'-ভাষার ব্যবহার তাই ভয়ের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু 'ভাসান' একটি আশ্চর্য সুন্দর গল্প। যদিও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মানদীর মাঝি"-র প্রভাব হয়ত এতে খুঁজলে পাওয়া যাবে, হয়ত প্রফুল্ল রায়ের কোন কোন রচনার কথাও মনে আসতে পারে, তবু 'ভাসান' এমন নিটোল সৌন্দর্যের মূর্তি পরিগ্রহ করেছে যে বইখানির নাম "চর্যাপদের হরিণী" না হয়ে 'ভাসান' দিলেই বুঝি গল্পটির উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হত।

দীপেন্দ্রনাথের আরও গ্রন্থ আছে—কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি তা পড়িনি। বর্তমান গ্রন্থখানিতেই লেখকের স্বকীয়তা ও বলিষ্ঠতার প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। তার ভাষা জোরালো এবং বাস্তবনিষ্ঠ। এমনকি সেই বাস্তবনিষ্ঠা ক্ষণে ক্ষণে রূঢ়তার মত মনে হয়। জীবনের অতি নীচুতলা থেকেই তিনি দেখেছেন এবং সেই শিল্পদৃষ্টি তাঁর আছে যাতে চরিত্রগুলিকে তিনি জীবন্ত করে তুলতে পেরেছেন।

"চর্যাপদের হরিণী" রচনাটিতে আধুনিকতার ছাপ পড়েছে যাতে তা ভংগীসর্বস্ব হয়ে দাঁড়াবার মতই মনে হয়। তবে গ্রন্থকার রচনাকুশলতার দাবী করতে পারেন। তাঁর লেখনী প্রচুর প্রতিশ্রুতি বহন করছে। আমরা সাগ্রহে তাঁর পরবর্তী রচনার জন্য প্রতীক্ষা করব।

সন্তোষকুমার দে

পরিকল্পনা ও সমৃদ্ধির সোনার কাঠি

ব্যক্তির কল্যাণ ও জাতীয় সমৃদ্ধি পরস্পর সংশ্লিষ্ট। এই কল্যাণ বা সমৃদ্ধি-সাধন একমাত্র পরিকল্পনানুযায়ী প্রযত্নের দ্বারাই স্বল্পকালে সম্ভবপর। এবং পরিকল্পনার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে জাতীয় তথা ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের উপর।

সুসংগঠিত ব্যাঙ্কের মারফত সঞ্চয় যেমন ব্যক্তিগত দুশ্চিন্তা দূর করে, তেমনি জাতীয় পরিকল্পনারও রসদ যোগায়।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

হেড অফিস : ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ভারতের সর্বত্র ব্রাঞ্চ অফিস এবং পৃথিবীর যাবতীয় প্রধান প্রধান বানিজ্য কেন্দ্রে করেস্পণ্ডেণ্ট মারফত

আপনার ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যভার গ্রহণে প্রস্তুত

UBF-18-60

অব্যাহত গতি

একদা মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত রচনা করিয়া ইহাকে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একজন লেখকের খোঁজ করিতেছিলেন। কিন্তু কেহই এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হইলেন না। অবশেষে পার্বতী-তনয় গণেশ এই শর্তে রাজি হইলেন যে তাঁর লেখনী মুহূর্তের জন্যও থামিবে না।

আধুনিক যুগের লেখকরাও চান যে তাঁদের লেখার গতি কোনক্রমেই ব্যাহত না হয়। আর এই অব্যাহত গতির জন্যই সুলেখা আজ এত জনপ্রিয়

(GENERAL) SOL'S-50'

সুলেখা ওয়ার্কস্ লিঃ, কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ